# নয়নী ও রাজনীতি

জ্বালা খাঁ

বি র চি ত

আনন্দ পাবলিশার্স - কলকাতা ১২

প্র কা শ ক : শি শি র সে ন

আষাঢ় ১৩৬৭ সাল
আনন্দ পাবলিশার্স
১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা—১২
মুদ্রাকর। সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
স্বস্তিক মুদ্রণালয়
২৭।১ বি, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট
কলিকাতা—৬
প্রচ্ছদ রূপায়ন। কাশীনাথ
দাম পাঁচ টাকা

## উৎসর্গ

'যাঁদের নিন্দিত জীবনের
সঞ্চিত কালিমা
দেশের আকাশ
মসীলিপ্ত করেছে'

**NAYANEE—O—RAJNITI**

(Belles—lettres)

*By*

**ZALA KHAN**

*Price Rs 5·00*

... ... ... ... ... ... ... ...কে

দিলুম

ইতি

# শুভান্ন

শাকাতী।

বেরুবাড়ীকে শেষ দেখা দেখতে গিয়েছিলুম। দ্বিচক্রযানে প্রত্যাবর্তন করছি শাকাতীর বনপথ দিয়ে।

সূর্য নেমেছে পাটে। দ্বিচক্রযানটি পথিমধ্যে বায়ুহীন হয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করায় আমি পদাতিক হলুম। কিন্তু গোধূলির পূর্বে লোকালয়ে পৌঁছান অসম্ভব। বনাঞ্চলে রক্তবিলাসীর প্রাদুর্ভাবে জীবন বিপন্ন হওয়াও আশ্চর্য নয়। সুতরাং আশ্রয়ান্বেষণে এগিয়ে চললুম।

সম্মুখেই হঠাৎ এক গৃহে প্রত্যাবর্তনরতা আদিবাসিনীর দর্শন লাভ করলুম। সাহসে ভর করে আশ্রয় চাইলুম। আগ্রহে আমাকে নিয়ে গেলেন তার কুটিরে! একটি কুটিরের দ্বারদেশে গিয়ে আশ্রয়দাত্রী বললেনঃ এই কুটিরে থাকতেন জ্বালা খাঁ। জ্বালা খাঁ! জ্বালা খাঁ কে? জিগগেস করলুম। আশ্রয়দাত্রী বললেনঃ জানি না তো। তিনি কোথায় তা-ও জানি নে। মাত্র কয়েকদিন আগে মুখ দিয়ে রক্ত উঠেছিল। তারপর কাকেও কিছু না বলে তিনি চলে গেছেন। তিনি কি করতেন? শুধু পড়তেন আর লিখতেন। কৌতূহল অত্যন্ত প্রবল হলো! প্রদীপ চাইলুম। প্রদীপ নিয়ে এলেন আদিবাসিনী। কুটিরে প্রবেশ করলুম।

হীরে-মুক্তো-মাণিক্য দেখে আলাউদ্দিন কি রকম আশ্চর্যান্বিত হয়েছিল জানি নে। কুটিরে প্রবেশ করে আমি কিন্তু হতবাক্ হয়েছিলুম।

কুটিরের গাত্রে দুটি পট—রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ। রামকৃষ্ণের পটের নিচে লেখা 'ডাইনামো' আর বিবেকানন্দের পটের নিচে লেখা

'বালব', চতুর্দিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পত্র-পত্রিকা। দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক।

শুধু আমার জন্যে নয়, আরও অনেকের জন্যেই অধিক বিস্ময় লুকিয়েছিল এই স্তূপাকার পুরাতন পত্র-পত্রিকার অন্তরালে। কাগজ-পত্রগুলি নাড়াচাড়া করতে করতে একটি বই-এর পাণ্ডুলিপি হাতে এল। আর তৎসহ একটি চিঠি কোন এক জি, জি, পি-কে লিখিত। মনঃসংযোগ করলুম। প্রথম পাতায় : 'জ্বালা খাঁ বিরচিত'। পাণ্ডুলিপিটি ছাপাবার জন্যে বিশেষ অনুরোধ।

উষা এলো।

মণিরূপী পাণ্ডুলিপিটি চুরি করে আবার যাত্রা করলুম। জানি না জ্বালা খাঁ কে? তিনি জীবিত কি মৃত তা-ও বলতে পারেন একমাত্র বিধাতা। তিনি হিন্দু কি মুসলমান তা-ও জানি নে। তবে তিনি যে জাতিতে মানুষ ছিলেন তা আমি উপলব্ধি করেছি। কারণ একটি মানব-দরদী মন ও নিরপেক্ষ সমালোচকের বৈশিষ্ট্য আছে তাঁর রচনার ছত্রে ছত্রে। অধিকন্তু রচনাশৈলীর 'এক প্রগাঢ় সৌন্দর্যবোধ ব্যাপ্ত রয়েছে' তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণে। তবুও একথা বলে রাখা ভাল যে জ্বালা খাঁ'র পাণ্ডুলিপিগুলি ছিল খসড়া ধরণের। আমার অনুমান সেগুলিকে পরিমার্জনের সময় অথবা ধৈর্য কোনটাই তাঁর ছিল না। এই গ্রন্থ প্রকাশ কালে আমি জ্বালা খাঁ'র লেখনীর উপর নূতন কোন বর্ণারোপ করিনি।

পাণ্ডুলিপিটি চৌর্যবৃত্তির অপরাধে আমি অপরাধী। কিন্তু পুস্তকাকারে রূপান্তরিত হয়ে যদি কোন আশীর্বাদ বর্ষিত হয় তবে সে-আশীর্বাদের অধিকারী হবেন দলনির্বিশেষে পাঠকশ্রেণী।

আর একটি নিবেদন : জ্বালা খাঁর কল্যাণের জন্যে একটু কি প্রার্থনা জানাবেন!

প্র কা শ ক

রণে হলেন জয়ী মহারাজ যুধিষ্ঠির, কিন্তু কোন্ অস্ত্র বলে ?

অস্ত্র ? কৃষ্ণ সহায় ছিলেন।

তুই অতীব মূর্খ। পড়িস্ নি মহাভারত, তাই হয় নি কোন শাস্ত্র জ্ঞান। অতি ক্ষুদ্র দুটি মিথ্যা বাক্য হ'লো অস্ত্র, তা' উচ্চারণ করে রণে হলেন জয়ী ধর্মরাজ।

মিথ্যা কথা ! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ! বলেন কি ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে শ্রবণ কর পুণ্যবান্। 'অশ্বত্থমা হত' দু'টি মাত্র বাক্য কিন্তু স্পুটনিকের চেয়েও মারাত্মক। গুরু দ্রোণাচার্য বধ, সন্তুষ্ট শ্রীকৃষ্ণ, আনন্দিত ভাতৃগণ, উল্লসিত মিত্রগণ, হরষিত সৈনিকগণ।

কিন্তু মৃদুকণ্ঠে বলেছিলেন জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব। '......ইতি গজ।'

'ইতি গজ' বলে তিনি হতে চেয়েছিলেন নিরপেক্ষ, তাতে নিজের বিবেককে ধাপ্পা দেওয়া যায়, কিন্তু জীবিত অবস্থায় হয় নরকভোগ। ছ্যাখ্, তোরা উচ্চ বর্ণের হিন্দু, তোদের জাত ব্যবসা ধর্। কি দরকার অপ্রিয় সত্য কথা লিখে শত্রু বৃদ্ধি করার ?"

আমাদের আবার জাত ব্যবসা কি ?

নারদ মুনির জাত ভাই তোরা। খোসামোদ করা হ'লো তোদের জাত ব্যবসা। তোরা জন্ম থেকে আরম্ভ করিস্ ভগবান নামক একটি জীবকে নানা রকম সুন্দর সুন্দর ভাষায় স্তব স্তুতি দ্বারা সন্তুষ্ট করে নিজেদের আখের গুছোতে। অভ্যাস মত শুধু একটু পাত্র পরিবর্তন করিস্। না-দেখা ভগবানের স্থলে রক্ত মাংসের পিণ্ড বসিয়ে স্তব স্তুতি করে আখের গুছোস্। তুইও স্বধর্মে থেকে আখের গুছিয়ে নে। কি দরকার অপ্রিয় সত্য

কথা লিখে অন্যের উপকার করার, উপদেশ বর্ষণ করলেন দাদা গুহক।

কিন্তু আমি যে বাঙ্গালী।

তবেই সেরেছে! তোর অবস্থা হবে ধীরা সেনের মত।

ধীরা সেনের আবার কি হ'লো?

হীরা সেনের নাম শুনেছিস্? মস্ত বড় গানাদার ছিলেন। কিন্তু তার সব গুণ নষ্ট হয়েছে একটি মাত্র দোষে। সেটি হলো পান দোষ। মদ খেয়ে বুঁদ হয়ে থাকতেন, না-যেতেন কোন আসরে, না-করতেন সঙ্গত।

ধীরা সেন হীরা সেনেরই বন্ধু। সরকারের দু'হাজারী চাকুরীয়া। পণ করলেন হীরাকে পানদোষ মুক্ত করবেন। সর্বদা হীরার সাথে সাথে থাকেন, কণ্ট্রোলড ওয়েতে সোম রস দেন। হীরা বাল্যবন্ধুর কাছে কৃতজ্ঞ।

বছর খানেক বাদে ধীরার সাথে চৌরঙ্গীতে দেখা। নেশায় একদম চুর। আমি তো অবাক! ওর এই পরিণতির কারণ শুধালেম।

ভাই, হীরাকে ভাল করতে গিয়েছিলুম।

আমি জানি নির্ভীক লেখকের প্রাপ্য শুধু বিড়ম্বনা ও লাঞ্ছনা। কিন্তু ভুলি কি করে যে আমি বাঙ্গালী, আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসী।

পুণ্য মহালয়া তিথিতে বিরস বদনে বিষাদিত মনে যখন তর্পণ করি তখন আমাদের দৈন্য দেখে পিতৃপুরুষদের পুণ্য আত্মার নিশ্চয়ই অধোগতি হয়। তাই ক্ষমা ভিক্ষা চাই আমাদের অক্ষমতার জন্যে।

মার্জনা চাই দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যে সব বাঙ্গালী বীর প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, তাঁদের অমর আত্মার কাছে। তাঁদের ত্যাগের মর্যাদা বাঙ্গালী দিতে অক্ষম হয়েছে।

আর মার্জনা চাইছি আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে। তাদের কাছে আমরা রেখে যেতে অক্ষম হলুম কোন উচ্চ আদর্শ ও পার্থিব

সম্পদ। সরকার লিখিত ইতিহাসে তারা যখন পড়বে যে তাদের পিতৃপুরুষগণ অক্ষম, অলস, অকর্মণ্য ছিলেন তখন নিশ্চয়ই লজ্জায় ও অপমানে তাদের মাথা হবে নত, আর আমাদের করবে ঘৃণা। তাঁদের কাছে আমার অনুরোধ থাক্‌বে তারা যেন আমার মত আরও অনেকে বেসরকারী ভাবে বাঙ্গালীর বর্তমান দুর্দশার কথা লিখ্‌বেন, তাদের লেখা পড়ে যেন বর্তমান যুগের বাঙ্গালীদের বিচার করেন।

আমি সাহিত্যিক নই। মেড ইজি পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ঠোক্কর খেয়ে খেয়ে পাশ করেছি, তাই ভাষাজ্ঞান নেই। আমি ঐতিহাসিক নই—দিন, তারিখ, সময়, সব ঠিকঠাক করে মিলিয়ে লিখবার বিদ্যে আমার নেই। আমি পথচারী। পথে যেতে যেতে যাদের সাথে দেখা হয়েছে, যাদের দুঃখ-দুর্দশা দেখে ভেবেছি জাতির দুঃখ, দুর্দশা, আমি তাদের কথাই লিখেছি। আমারই মত যারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার মূল্য দিতে সোনার পূর্ববঙ্গ ছেড়ে এসে আবার বাঙ্গালী হ'তে চেয়েছিলেন, আবার ভারতবাসী হতে চেয়েছিলেন, তারাই আমার নায়ক নায়িকা। কাল্পনিক কেউ নন্।

রামায়ণও কাল্পনিক নয়। মানব জীবনের হাসিকান্না, সুখ দুঃখের ইতিহাস। গান্ধীজী রামরাজত্বের কথা বলতেন। কিন্তু তার মর্ম কেউ বোঝেন নি। আমি তাঁকে বলব জটায়ু।

জটায়ু?

হ্যাঁ জটায়ু। সীতা হরণকারীর নামটি বলে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

রামসীতার গল্পটি বাদ্ দে, দেখ্‌বি কি বিচিত্র লীলা। রাম হলেন রবি, তার কিরণ সর্ব জীব সমভাবে উপভোগ করবে, এই হ'লো প্রকৃতির নিয়ম। এর নাম রামরাজত্ব—যাকে বলে আধুনিক ভাষায় সাম্যবাদ।

রাহু যখন রবিকে গ্রাস করেন তখন মা বসুন্ধরা রবির কিরণ থেকে হন বঞ্চিত। দুঃখ, দুর্দশায় জর্জরিত হন নরগণ। রাহুর

লালসা হলো আত্মসর্বস্ব। রাবণ হলেন রাহু। রাহু আবার সবচেয়ে প্রতাপশালী হন যখন শনি হন্ তার দ্বারী। রাবণের মন্দোদরী, লঙ্কার রক্ষাকর্ত্রী। রাহুর লালসার নেই তৃপ্তি।

ভারতের রাহু হলো তার লোভী বণিককুল। তাদের স্বরূপ দেখে গান্ধী হলেন শংকিত।

লোভ হরণ করে তৃপ্তি। অতৃপ্তি থেকে উদয় হয় পরধন অপহরণের প্রবৃত্তি।

গান্ধী চেয়েছিলেন অ-যোদ্ধা—যেখানে যুদ্ধ নেই, শান্তির রাজ্য। ব্যক্তিগত বাসনা ও রসনা যেখানে সংযত সেখানে বিরাজ করে শান্তি।

কতটুকু দরকার মানুষের জীবনযাত্রা নির্বাহ করবার জন্য!

গান্ধীর এক টুক্‌রো বস্ত্র ও চরকা হলো মানব জীবনের তৃপ্তির ও শান্তির প্রতীক। নিজের চাহিদা যদি হয় পরিমিত তবে মানুষ হয় নির্লোভ, তা থেকে আসে শান্তি। তখন সর্ব জীব সমভাবে, সমাধিকারে উপভোগ করতে পারে রবির আলো। সবল হরণ করে না দুর্বলের সর্বস্ব।

গান্ধী তাই চেয়েছিলেন গ্রামে গ্রামে কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র শিল্প। শান্তির নীড়ে বসে যার যতটুকু চাহিদা ততটুকু উৎপন্ন করবে। তাতে রসনা ও বাসনা থাকবে তৃপ্ত।

গান্ধী শংকিত হয়েছিলেন বণিককুলের আচরণ লক্ষ্য করে ভারত বিভাগের সময়। রক্ষাকর্তা শনি অশান্তি ডেকে এনে চাপ দিল বণিকদের দেশ বিভাগের জন্য। বণিককুল প্রভাবান্বিত করলো রাজনৈতিক নেতাদের। ভারতের হ'লো অঙ্গচ্ছেদ। হিন্দু ও মুসলমান বণিককুল তাদের ব্যবসা অদলবদল করে নিল, দ্বারী ইংরেজের সাহায্যে। গান্ধী হলেন ভীত। ভারতীয় রাহুর দ্বারী হ'লো ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, অধুনা দলে যোগ দিয়েছে রাশিয়া।

গান্ধী ভারতীয় রবির দুর্বলতা জান্‌তেন, তাই তিনি স্বাধীনতার পরেই বিদেশ থেকে যন্ত্র আমদানি করে বৃহৎ শিল্প স্থাপনের বিপক্ষে ছিলেন। যন্ত্র যেমন লোভী, তেমনি লোভী হবে তার চালক। আর যন্ত্রের সাথে রাহু হবেন প্রবল, কারণ তার দ্বারী এসে আবার শেকড় গাড়্‌বে।

গান্ধী সীতাহরণকারীকে আর তার যাওয়ার পথটি দেখ্‌তে পেয়েছিলেন। তাই তিনি চেয়েছিলেন বিলোপ করতে কংগ্রেসকে।

মিলিয়ে ছাখ! স্তব, স্তুতি, আরাধনা করে ভারতীয় বণিককুল ও ভারতে অবস্থিত বিদেশী বণিককুল বৃহৎ শিল্প স্থাপনের অনুমতি নিয়ে ও নানা রকম দ্রব্যসম্ভার আমদানির ছাড়পত্র নিয়ে ভারতের মজুত স্টার্লিং ব্যালান্স মাত্র কয়েক বছরে ফুঁকে দিয়ে ভারতকে আর জনসাধারণকে দেনদার করে দিল।

শান্তি হ'লো হরণ। বনবাসে গেলেন রাজা। সমস্ত জাতি হারিয়েছে মানসিক শান্তি। অর্থ হয়েছে একমাত্র কাম্য এবং মোক্ষ। যে কোন উপায়ে অর্থ অপহরণ করা হলো একমাত্র কাম্য। কৃষকের শান্তির নীড় গেল ভেঙ্গে, গৃহীর গৃহলক্ষ্মী গেলেন পরগৃহে সম্ভোগের লাগি, অধ্যাপক অধ্যাপনা ছেড়ে চোরাকারবার আরম্ভ করলেন, বেনে খাদ্যদ্রব্যে বিষ মিশ্রিত করতে লাগলো, কারণ রাজা নেবে'ছেন মাগনে।

'স্বর্ণমৃগ পাঠালেন রাবণ রামসীতার লালসা জাগাবার জন্য'। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা হলো স্বর্ণমৃগ। বিদেশী বণিকগণ দেশী বণিকের সাথে হাত মিলিয়ে স্বর্ণমৃগরূপী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ধরলেন রামসীতার সম্মুখে। লালসা জাগ্‌লো।

সাধু বেশে এলেন রাবণ ভিক্ষার লাগি। সাধু বেশে এলেন ভারতীয় শ্রেষ্ঠীকুল আর তাদের সাথে বিদেশী বণিককুল পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য ভারতকে সাহায্যের অনুমতি ভিক্ষা করে।

মায়ামৃগ করলো বিভ্রান্ত রামচন্দ্রকে। তা না হলে বিদেশী শিল্পমালিকগণ ভারতে অবস্থিত তাদের শিল্প থেকে প্রতি বছরে যে পরিমাণ অর্থ মুনাফা হিসাবে নিজ নিজ দেশে নিয়ে যায়, তা' যদি বন্ধ করা যেত তবে বৈদেশিক ঋণের দরকার বোধ হয় হতো না। লালসা মানুষকে করে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। তাই জ্ঞানী হয়ে যান অজ্ঞানী। স্বর্ণমৃগের 'হা সীতা, হা লক্ষ্মণ' কাতর ধ্বনি শুনে লক্ষ্মণ হন নি বিভ্রান্ত। তিনি ছলনা বুঝতে পেরেছিলেন, কিন্তু সীতা হলেন বিভ্রান্ত। সন্দেহের বীজ প্রবেশ করল তার ভেতর। ভৎ'সনা করলেন লক্ষ্মণকে। ভৎ'সিত হয়ে সৌমিত্রি গেলেন রামান্বেষণে, কিন্তু যাবার আগে কুটিরের দ্বারদেশে দাগ দিয়ে জানকীকে দাগের বাইরে যেতে নিষেধ করেছিলেন।

চিন্তমন দেশমুখও বোধহয় দেনা করে বৃহৎ শিল্পের পরিকল্পনাকে বাধা দিয়ে ভৎ'সিত হয়ে, একটি দাগ কেটে দিয়ে বলেছিলেন যে, দাগের উপরে যেন ঋণের পরিমাণ না যায়। দুটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী শিল্প স্থাপিত হলো বিদেশীদের দেওয়া ঋণের অর্থে ও দরিদ্র ভারতবাসীর প্রদত্ত রাজস্বে। ভিলাই, রাউড়কেল্লা, দুর্গাপুরের লৌহ শিল্প স্থাপিত হয়েছে বিদেশীদের অর্থে।

বেসরকারী সব বৃহৎ শিল্প স্থাপিত হচ্চে বিদেশীদের সাথে কোলাবোরেসনে। উনবিংশ শতাব্দী বা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাণিজ্য বিস্তারের প্রয়োজনে শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহ পররাজ্য অধিকার করতো। অধিকৃত রাজ্যে বাণিজ্য বিস্তার করে সহস্র পারসেণ্ট লাভ করেছে।

গত মহাযুদ্ধের পর অনেক রাজ্য স্বাধীন হয়েছে, যেমন ভারতবর্ষ। বাণিজ্য বিস্তার করে সহস্র পারসেণ্ট লাভ করার যুগ গত হয়েছে। কিন্তু বাণিজ্যলোভী জাতিগণ ওৎ পেতে বসেছিল। সুযোগ এলো।

কি করে ?

ইংরেজ আমলে 'মেড ইন ইণ্ডিয়া' ছাপ মারা যে কোন জিনিস ভারতবাসী মাথায় কোরে নিতো। জানতো যে জিনিস খারাপ, তবুও বেশী দর দিয়ে দিশি জিনিষ কিনতো। ক্রেতা জানতো যে দেশীয় লোকের প্রচেষ্টা,—ভারতের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রয়াসে আর উৎপন্ন দ্রব্যে নেই কোন ভেজাল। আর আজ? 'মেড ইন ইণ্ডিয়া' ছাপ মারা দ্রব্য দেখলে ক্রেতা নাক সিঁটকিয়ে ভাবে কোন 'ফোর টুয়েন্টি'র মাল। বেশী দর দিয়ে বিদেশী দ্রব্য ক্রয় করবে, তবুও ছোঁবে না 'মেড্ ইন্ ইণ্ডিয়া' মার্কা দ্রব্য। ভারতীয় রাহু শনির আগমনের পূর্ণ সুযোগ করে দিলো।

শনি পঞ্চাশ পারসেণ্ট লাভেই সন্তুষ্ট হয়ে ভারতীয় রাহুর সাথে কোলাবোরেসনে শিল্প স্থাপন করে নিজেদের শেকড় বিস্তার করছে। ভারতীয় দ্রব্যে বিদেশী প্রস্তুতকারকের 'ট্রেড্ মার্ক' থাক্‌বে। 'ট্রেড্‌মার্ক' ব্যবহার, যন্ত্রপাতি সরবরাহ করবার জন্য বিদেশী বণিক আবার কায়েম হয়ে বসে মুনাফার অংশ নিজ দেশে পাঠাবার অধিকার অর্জন করার নাম কোলাবরেসান্‌এ শিল্প স্থাপন।

রাবণের লালসা সীমাহীন। আরাধনা করে শিবকে তুষ্ট করে আরও বলীয়ান হলেন।

আরাধনা করে মডার্ণ শিবকে তুষ্ট করে প্রবেশ করেছে সরকারী শিল্পের পরিচালনা মণ্ডলীতে। শিল্পকে অর্থ লগ্নী দেবার জন্য সরকার স্থাপন করেছেন শিল্প সাহায্য সংস্থা। সেই সব সংস্থার সভাপতি বা সভ্য হয়ে মডার্ণ বারণগণ নিজ নিজ আখের গুছিয়ে নিচ্ছেন। নিয়ম কানুন এমন করে রচিত হয়েছে যাতে জনসাধারণ কোন সাহায্য না পায়।

মিলিয়ে ছাখ! রাবণ পূজা করেছিলেন চণ্ডীকে পারিজাত

দিয়ে। মডার্ণ রাবণগণ পারিজাত দিয়ে চণ্ডীর নামে ট্রাস্ট খুলে গ্রাস করছে জনসাধারণের শক্তির উৎস, রাজনৈতিক দলগুলিকে।

ভারতের এক অংশ বিদেশীদের কবলে, ঋণভারে দেশ জর্জরিত; কিন্তু নেতাগণ আত্মকলহে লিপ্ত।

সীতা হয়েছেন অপহৃতা। সাধু বেশ গেছে ঘুচে। ঋণের সুদ দিন দিন হচ্ছে বর্ধিত। আবার ঋণ করে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আরম্ভ হয়েছে।

'নবাব ধর্, নবাব ধর্' অবস্থা হবে ভারতের। পেন্‌সন্‌ভোগী নবাবগোষ্ঠী থাকেন রাজধানীতে। মাঝে মাঝে দিল্ আবার নবাবী হয়ে যায়। দোকান থেকে চেয়ে মেগে ধার দেনা করে দিল্ শরিফ্ করেন। তারপর পাওনাদার! পাওনাদার আবার নবাবের দেহ ছাড়া কিছুই ক্রোক করতে পারে না, আর আছেই কি যে নেবে? পাওনাদার কোনদিন যদি ক্ষুদে নবাবকে পথে পেল তো "নবাব ধর্, নবাব ধর্" রবে ধাওয়া করে তার পেছনে, আর নবাবের পড়ি কি মরি দৌড়।

যদি কখনও শুনিস্ যে কোন সরকারী বা বেসরকারী শিল্প কোন বিদেশী প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছে তাদের ঋণের টাকা আদায় করবার জন্য তবে আশ্চর্য হোস্‌নে।

সীতা হরণের পর আরম্ভ হলো রামের বিলাপ পর্ব। হারিয়েছিলেন বাক্য সংযম, যেমন হয়েছে মডার্ণ রামচন্দ্রের।

কতদিন চল্‌বে বিলাপ পর্ব?

যতদিন না হবে দেখা হনুমানের সাথে।

বুধ সহায় হলে রবি হন প্রবল, তখন তিনি রাহুকে দমন করতে পারেন। আর রাহুর দ্বার থেকে শনিকে হটিয়ে রাহুকে দুর্বল করতে পারেন বুধ। হনুমান হলেন বুধ। সীতা উদ্ধারের প্রধান নায়ক। মন্দোদরীর কাছ থেকে এনেছিলেন রাবণের মারণাস্ত্র।

ভারতের বুধ কে ?

কেউ কেউ বলেন, তোরা। বৃক্ষে ছিল তার আবাস, ফলমূল ছিল তার আহার। কোন মায়ার বন্ধন তার ছিল না। মায়ার বন্ধন কাটবার জন্য তোরা গৃহহীন হয়েছিস্।

পশ্চিম-পাকিস্তানীদের ক্ষতিপূরণ দিয়ে আবার গৃহী করা হয়েছে, কিন্তু তোদের করা হয় নি।

ছাখ্ তাকিয়ে, তোদের ভয়ে বণিককুল আর পশ্চিমবঙ্গে শিল্প স্থাপন করছেন না। তারা চলে যাচ্ছেন বম্বে। কিন্তু তোদের আরও মাশুল দিতে হবে।

কেন ?

হনুমানের কোন জাত ছিল না, ধর্ম ছিল না। তার জাত বা ধর্ম সবই রামসীতা। তিনি রামের জন্য দেহমনে প্রস্তুত হয়ে ছিলেন।

আর তোদের ? ধর্ম্ম গ্রন্থে যা লেখা তা অতি মহান। কিন্তু তোদের আচার নিয়ম ? কেবল পরস্পরকে ঘৃণা করিস, তাই তোদের প্রতি গৃহ হয়েছে পাকিস্তান।

আর তোদের জাত ? চেহারা দেখ্‌লে মনে হবে হাবসী সন্তান, বলে কিনা ভরদ্বাজ গোত্র। ঘোরতর বর্ণশঙ্কর তোরা, কিন্তু তা স্বীকার করে শুধু বাঙ্গালী হতে পারিস্‌নে, এই তোদের ছুর্বলতা। এই ছুর্বলতা তোদের করেছে অকৃতজ্ঞ, তাই তোরা অনুগত হতে শিখিস্ নি। তোর বিপদে যে তোকে আশ্রয় দেবে, মাটিকে কোনরকমে একটু ঠাঁই করতে পারলেই তোরা প্রথম সর্বনাশ করিস্ আশ্রয়দাতার, তিনি অগ্রজই হোন্ বা সুহৃদই হোন্। তোদের সৎ সাহসটুকু নেই বল্‌বার যে তুই ভাগ্যবান্—তাই তোর অগ্রজ আছে, তাই তোর সুহৃদ্ আছে। তোদের ছুর্বলতা হলো লোকে ভাববে যে তুই অগ্রজ বা সুহৃদের আশ্রিত। এ ছুর্বলতা তোদের ভেতর দানা বেঁধেছে তোদের মিথ্যা জাত্যাভিমান থেকে।

আমার পিতামহী খুব চটে যেতেন যখন তার এক বিধবা বৃদ্ধা আত্মীয়া, যিনি আমাদের বাড়ীতে থাকতেন, শিশুদের বলতেন "ছুঁস্ নে", আর ছুলে স্নান করতেন। পিতামহী বলতেন যে ওর শরীরই অশুচি, তাই শিশুর স্পর্শও সহ্য করতে পারেন না।

সীতা উদ্ধারের প্রথম পর্বে সর্ব প্রথম হনুমান মুখ আর লেজ পোড়ান। তোদের আরও মাশুল দিতে হবে।
তোরা কত ভাগ্যবান্! তোদেরই রামকৃষ্ণ ভগবান দর্শন করে বলে গেছেন তার রূপ। তোরা মুখে 'রামকৃষ্ণ' বল্‌বি কিন্তু তাঁর দেবী-দর্শন সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিস্ না তাই ভগবানের নামেও তোরা একত্রিত হতে পারিস্ না। অথচ, তোদেরই জাতভাই মুসলমানদের ছাখ। হজরত মহম্মদের দেখা আল্লাকে তারা বিশ্বাস করে সবাই মিলে জীবন পর্যন্ত কোরবাণী করে। "আল্লার" নামে ধ্বনি দিলে ওরা সবাই মিলিত হয়, আর তোদের ভোগের প্রসাদের জন্য নিমন্ত্রণ করলেও যাস্‌নে।

তোরা কত আত্মছলনাকারী জানিস্? নিজের গর্ভধারিণী মা অসুস্থ হলে তাকে সেবা করা দূরে থাক্ তার কাছেও যাস্ না। অথচ কালীঘাটে সোয়া পাঁচ আনার পূজো দিয়ে কপালে বড় সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে মূর্তির কাছে দাঁড়িয়ে মা, মা বলে চিৎকার করিস্, কিন্তু ওদিকে লিভিং মাদারের অশ্রুজল।

লিভিং মাদারের অশ্রুজল তো হবেই কারণ সিংহ হয়েছে সিনা।

কি কোরে?

ছুটি রোগী—একজন শহুরে, অন্যটি গ্রাম্য, চিকিৎসকের জন্য অপেক্ষা করছিলেন তাঁর প্রতীক্ষালয়ে। গ্রাম্যরোগী শহুরে রোগীকে জিজ্ঞাসা করলেন, মশায়ের নাম? উত্তর দিলেন ছি, ছি, সিনা—কি বললেন?—ছি, ছি, সিনা, আবার বললেন শহুরে

রোগী। জবাব শুনে চুপ করে গেলেন গ্রাম্য রোগী। শহুরে রোগী জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার নাম?—আমার নাম? হ্যাঁ। পি, পি, পাল্‌সেটিলা, জবাব দিলেন গ্রাম্য রোগী। শহুরে রোগী তো নাম শুনে চটেই লাল। বললেন, ইয়ার্কি পেয়েছেন? পাল্‌সেটিলা কখনও কারও পদবী হয়?" জবাব দিলেন গ্রাম্য রোগী—সিংহ যদি সিনা হ'তে পারে তবে পাল কেন পাল্‌সেটিলা হতে পর্‌বে না?

অথচ ছ্যাখ্! তোদের ভেতর যাঁরাই মহান্ হয়েছেন তাঁরাই তোদের ছুঁস্‌নে-মার্কা সমাজ ছেড়ে গেছেন।

তোদের বিবেকানন্দ একা একা সমুদ্র লঙ্ঘন করে, ঠিক যেন হনুমান, বিশ্বের দরবারে তোদের স্থান করে এলেন। তাঁকে তো তোরা সাহায্য করিস্ নি এবং উল্টো তাঁকে সর্বসমক্ষে হেয় করবার চেষ্টা করেছিস্।

তারপর তোদের নেতাজী? ঠিক হনুমানের মত চলে গেলেন একা একা সমুদ্রের পরপারে। বানর সেনা তৈরি করলেন, যাদের জাত নেই, ধর্ম নেই তাদের। তাদের জাত বা ধর্ম হ'লো ভারত উদ্ধার।

বর্তমানে কংগ্রেসকে মুসলিম লীগের সাথে মিতালী করে কেরেলায় নির্বাচনে জয়ী হ'তে হয়। মুস্‌লিম কন্‌ভেনসন নাম দিয়ে নতুন করে আবার গজিয়ে উঠেছে ভারতীয় মুসলমানদের অভিভাবক। অথচ ছ্যাখ্! কি যাদু মন্ত্রে নেতাজী ঘুচিয়েছিলেন হিন্দু মুসলমানের ধর্মান্ধতা।

বাংলার সাম্যবাদের ভিত্তি ডাঃ রায় স্থাপন করেছেন। আর 'দীন্', 'দীন্' রবে ছুটে আস্‌ছে সুরেন দে তার পঞ্চায়েৎ বাহিনী নিয়ে।

মহাবীরের পাতাল বিজয়, সীতা উদ্ধারের তৃতীয় পর্বের সমাপ্তি। দ্বারী শনি স্থান পরিবর্তন করেছেন।

দ্বা· ১১৭১৫

ডাঃ রায় পাতাল বিজয় করেছেন। আমেরিকা তার সাহায্যে এসেছে।

আবার কি হবে রবি রাহুমুক্ত ?

আমি নিকষা, কহে জ্বালা খাঁ।

মহালয়া, ১৩৬৮

# সঞ্জয় উবাচ

সঞ্জয় উবাচ, বললেন গুহকদা, বলেই জিজ্ঞাসা করলেন, সঞ্জয়কে চিনিস্ ?

এক লেখকের নাম তো সঞ্জয়, জবাব দিলুম।

আরে, না, না, সে সঞ্জয় নয়। মহাভারত পড়িস্ নি ?

ও, সেই সঞ্জয়! তিনি তো কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বর্ণনা করেছিলেন।

কোথা থেকে তিনি যুদ্ধ দেখেছেন ?

বহু দূর থেকে, বললুম।

হ্যাঁ, ঘটনাস্থলের ধারে কাছেও তিনি ছিলেন না। আর কাকে শোনালেন সে কাহিনী ?

ধৃতরাষ্ট্রকে।

হ্যাঁ, ধৃতরাষ্ট্রকে। তিনি আবার ছিলেন অন্ধ। আধুনিক কালের সঞ্জয়গণও আমাদের এতদিন শুনিয়েছেন, যে কুড়ি লক্ষের অধিক উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন হয়েছে। এই বার্তা তাঁরা বছরের পর বছর আমাদের মত ধৃতরাষ্ট্রদের শুনিয়েছেন। আর অন্ধ আমরা তাই বিশ্বাস করে উদ্বাস্তু দেখলেই তাড়া দিয়ে বলেছি যে, তোমরা সবাই তো সাহায্য পেয়েছ এবং পুনর্বাসন হয়ে গিয়েছে তবে কেন আবার সাহায্য চাও, চাকুরীতে অগ্রাধিকার চাও ? কেন ব্যবসার জন্য অর্থ চাও? আর স্থানীয় লোকদের অন্ন মারতে চাও? ধন্যবাদ মাননীয় প্রফুল্ল সেনকে! সম্প্রতি রাজ্য বিধান সভায় বক্তৃতা দিয়ে তিনি আমাদের দৃষ্টি দান করেছেন। আর মডার্ণ সঞ্জয়গণ এতদিন যা প্রচার করেছেন তা মিথ্যা প্রমাণ করে দিয়েছেন।

কুশল রায় আবার আধুনিক সঞ্জয়, অর্থাৎ সাংবাদিক।

গুহকদার আক্রমণে একটু চটে গেলেন। তিনি বললেন, সঞ্জয় ছিলেন সরকারী সাংবাদিক, তাই ভ্রান্তিকর ভাষণ দান তাঁর দ্বারাই সম্ভব। আমরা বেসরকারী সাংবাদিক। বছরের পর বছর সরকারের কর্ণে লৌহ-শলাকা প্রবেশ করিয়ে তাঁর বধিরতা দূর করবার চেষ্টা করেছি, তাই বাধ্য হয়ে শ্রীসেনকে সত্য কথা স্বীকার করতে হয়েছে।

## পুনর্বাসন কেন হলো না

শ্রীপ্রফুল্ল সেনের বিধান সভার ভাষণের পর সুধী মহলের চৈতন্য উদয় হোল। সবারই মনে এক প্রশ্ন.—কেন উদ্বাস্তু বাঙ্গালীর পুনর্বাসন হলো না? তাদের দেশপ্রেম ছিল, ছিল বিদ্যা, বুদ্ধি আর স্বাস্থ্য। এবং সাধ্যমত সবাই কিছু কিছু অর্থ নিয়ে এসেছিলেন। তবুও কেন তাঁদের পুনর্বাসন হলো না? কেন তাঁরা আবার বাঙ্গালী হতে পারলেন না? তার একমাত্র কারণ পলিটিক্স্, বাংলায় যাকে বলে রাজনীতি।

# নয়নী ও রাজনীতি

নয়নীকে আমি দেখেছি। রাজনীতির চক্রে পড়ে নয়নী আজ পরিচারিকা চৌরঙ্গীর একটি রেঁস্তোরাতে।

গ্রাহক বাড়াবার জন্য কোলকাতার নিম্ন শ্রেণীর অবাঙ্গালী পরিচালিত প্রায় সব রেঁস্তোরাতে নিযুক্ত করা হয়েছে বাঙ্গালী মেয়ে পরিচারিকা। এমন একটি রেঁস্তোরাতে আমি দেখেছিলুম নয়নীকে।

যাচ্ছিলুম সুরেন্দ্র ব্যানার্জি রোড দিয়ে কোন এক সন্ধ্যায়। হঠাৎ এলো বৃষ্টি। দৌড়ে উঠলুম এক রেঁস্তোরায়। ঢুকেই অবাক। এযে প্রমিলার রাজত্ব। তায় আবার বাঙ্গালী আর পোশাকও ভাল। চেহারা দেখেই মনে হয় ভদ্রবংশীয়া। বসলুম একটি চেয়ারে। এলেন এক পরিচারিকা। চাইলুম চা। এলো নিয়ে চা।

আর কিছু চাই? জিজ্ঞাসিল।

কথার টান শুনে মনে হ'লো পূর্ববঙ্গীয়া। কৌতূহল হলো। জিজ্ঞাসা করলুম, দেশ ছিল কোথায়?

তা দিয়ে আপনার দরকার? রণরঙ্গিনী মূর্তি।

দরকার কিছু নেই। কথার টানে বুঝলুম আপনার দেশ ছিল পূর্ববঙ্গে। তাই জানতে ইচ্ছা হ'লো। আমার বাড়ীও ছিল ওখানে।

মনে হলো একটু যেন নরম হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলো আমার বাড়ী কোথায় ছিল? বললুম।

ও, ওখানে! ওখানে আমাদের অনেক আত্মীয় ছিলেন। কিন্তু নাম আমি বল্‌বো না।" আবার জিজ্ঞাসা করলো আমার আর কিছু চাই কি না?

চাইলাম একটি কেক্।

কেক নিয়ে এলো। আবার জিজ্ঞাসা করলুম ওর দেশ কোথায় ছিল?

ফরিদপুর, উত্তরিল।

কি করে এখানে কাজ জোটালেন?

সে মস্ত বড় ইতিহাস। তা জেনে আপনার কি লাভ?

বলুন। শুন্‌তে খুব ইচ্ছা করছে।

আপনার ধৈর্য্যচ্যুত হবে।

আমার ধৈর্য অসীম। আপনি বলুন।

শুন্‌বেন তবে সত্যি। শুনুন। ১৯৫০ সালের দাঙ্গার সময় আমার বাবা, মা, দাদা, আমি ও আমার ছোট ভাই দেশ ছেড়ে কলকাতায় আসি। আর আসেন গৃহদেবতা। আমার বয়স তখন দশ। শ্যামবাজারের কাছে একটি ভাড়া বাড়ীতে বাবা আমাদের রাখেন। দেড়'শ টাকা মাসিক ভাড়া। বাবার কাছে তখন কুড়ি হাজার টাকা ছিল। দেশে ছিল আমাদের মস্ত বড় বাড়ী। বাবা ছিলেন গাঁয়ের জমিদার। কি হবে আমার এই বেদনাদায়ক কাহিনী শুনে? অনেক দিন ভুলে ছিলুম।

ব্যথার কথা বলে অনেক সময় শান্তি পাওয়া যায়। আপনি বলুন।

ভুলে গিয়েছিলুম যে, আমি একদিন ছিলুম ব্রাহ্মণ কন্যা। আপনি আমাকে সম্মান দিয়ে কথা বল্‌ছেন। এমন করে সম্মান কেউ আর আমায় দেয় না। তারপর দাদা ভর্তি হলেন কলেজে, আমি আর ছোট ভাই স্কুলে। বাবা সুরু করলেন ব্যবসা। কিন্তু ছিল না কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা। কিন্তু বসে থাকলে তো চল্‌বে না। একটা কিছু তো করতে হবে? শুন্‌লুম, কার সাথে যেন ঠিকাদারী ব্যবসা আরম্ভ করেছেন। বছর দুই পরে শুনি যে বাবার সব টাকা লোকসান হয়েছে। আমি এত বুঝতুম না। দাদা একটু একটু বলতেন, তাই শুন্‌তুম। একদিন রাতারাতি

আমরা সবাই বাড়ী ছেড়ে উঠলুম। এসে বেলেঘাটা অঞ্চলের একটি বস্তীর দু'খানা ঘরে। ভাড়া মাসে বার টাকা। থামলো নয়নী।

তারপর?

তারপর! দারিদ্র্যের মুখোমুখী দাঁড়াল এ পরিবার। অনাহার জানেন? না জান্‌লে বোঝান যায় না। ভিক্ষা করতে পারে না, কারণ সম্মান ও সঙ্কোচ। চুরি করতে পারে না, কারণ সদ্‌বংশ। সম্বলের মধ্যে মার ও আমার সামান্য সোনার গহনাগুলি। বাবা আর দাদা দিবারাত্র কাজের চেষ্টায় ঘোরেন। মা খুপরীর ভেতর গৃহদেবতা বসিয়ে কেবল পূজা করেন, আর পূজোর নামে উপোস করেন। বাবার স্বাস্থ্য গেল ভেঙ্গে। দারিদ্র্য, অনাহার আর চিন্তায় তিনি শয্যা নিলেন। জানেন? আমার বাবা বিনা চিকিৎসায়, অনাহারে মারা গেছেন। কে বল্‌বে যে তিনিই মাত্র কয়েক বছর আগে নিজগৃহে প্রতিদিন পঞ্চাশ জন লোককে অন্ন দিতেন? দাদা মাঝে মাঝে কাজ পায়। কিন্তু সংসার তো আর চলে না। আমার বয়স হ'লো আমার মূলধন।"

বলে কি বাংলার নারী? মুহূর্তে আমার মানসপটে উদয় হ'লো প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের মূর্ত্তি। মাত্র কয়েক বছরে প্রীতিলতা হয়ে গেল নয়নী—অমৃতকন্যা হয়ে গেল বিষকন্যা। একি ভীষণ রাজনীতি! মনে এলো প্রীতিলতার অন্তিম বাণী, যা তিনি লিখেছিলেন সমরে যাবার পূর্বে—

আশৈশব ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস এবং আন্তরিক ভক্তি আমার জীবনের মূল সম্পদ। এই সম্পদকে আমি বরাবর সাগ্রহে রক্ষা করিয়া চলিয়াছি। আজ আমার চিরবাঞ্ছিত সেই ঈশ্বরপদ লাভের জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। আমার ঈশ্বরে ভক্তি ও বিপ্লবের আদর্শের মধ্যে যদি সামঞ্জস্য না থাকিত তাহা হইলে আদৌ বিপ্লবীই হইতে পারিতাম না। তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া আমি আমার গুরুদায়িত্ব পালনে অগ্রসর হইতেছি। তিনি যেন

আমাকে শুদ্ধচিত্ত করিয়া লন, যাহাতে তাহার শ্রীপাদপদ্মে নিজেকে চিরতরে সমর্পন করিতে পারি।

আপনার বোধ হয় ভাল লাগছে না ?

না, না, আপনি বলুন।

ভাবচেন বোধহয় কি মুখরা লজ্জাহীনা হয়েছে এই মেয়েটি ! আমি নিজেই অবাক হয়ে যাই নিজেকে দেখে। লজ্জা নারীর ভূষণ। কোথায় গেল আমার সেই ভূষণ, আর কেনই বা গেল ? একটু থেমে আবার বললে, আপনার কথাই ঠিক। কথা বলে একটু শান্তি পাচ্ছি।

বস্তিগুলিতে বাস করে অনেক খারাপ স্ত্রীলোক। দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে তারা সর্বনাশ করে গৃহস্থের যুবতী মেয়ের ও বৌদের। বাবা মারা যাবার পর এমন একটি স্ত্রীলোকের আনা-গোনা সুরু হয় আমাদের বাড়িতে। প্রথম প্রথম তার কথাবার্ত্তা আমাদের ভাল লাগতো। ডাকৃতুম "মাসি" বলে। মাকে সাহায্য করতে চাইতো। আস্তে আস্তে তার সাহায্য নিতে মা বাধ্য হলেন আমাদের ত্ব'মুঠো খাবার দেওয়ার জন্যে। দাদা কিন্তু খুব গালাগাল করতেন। আর ঐ স্ত্রীলোকটি দাদা বাড়ি থাক্‌লে কখনই আসতো না। এক ত্বপুরে আমি যাই তার সাথে সিনেমা দেখতে। ঐ যাওয়াই হ'লো আমার কাল। অশুচি দেহ নিয়ে ফিরলুম, কিন্তু সাথে প্রচুর অর্থ। ত্ব'দিন পরে মা টের পেলেন। আশ্রয় নিলেন তাঁর ঠাকুর ঘরে। দাদা মার-ধোর করলেন। পারিবারিক কেলেঙ্কারীর ভয়ে কাউকে জানাতে পারেন নি। থামলো নয়নী ক্ষণকালের জন্য।

আমার মা কিন্তু আমাকে কোন অনুযোগ করেন নি। আমার জন্য নিয়ত প্রার্থনা করতেন তাঁর দেবতার কাছে। কৈফিয়ৎ চাইতেন তাঁর কাছে, কেন এমন হলো। দেবতা তো পাথরের, নেই তাঁর প্রাণ। তা না হলে আমার মার প্রশ্নের

জবাব তাঁকে দিতে হতো। কোনদিন মা স্পর্শ করেননি আমার অর্থে কেনা অন্ন। না খেয়ে দেহ রেখেছেন তিন মাস পরে। আমাকে কিন্তু অভিশাপ দেন নি। আশীর্বাদ করেছেন আমার যেন মঙ্গল হয়। দাদা কি করেন জানি না। ছোট ভাইটি বখে গেছে। মাঝে মাঝে দেখা হয়। দাদা কিন্তু বস্তির ঘর দুটো এখনও ভাড়া করে রেখেছেন। কিন্তু তার সাথে দেখা হয় না। অশ্রু এসে গেছে নয়নীর নয়নে।

যে বিগ্রহ দাদা এখনও আঁকড়ে আছেন সেই বিগ্রহ স্থাপন করেছিলেন আমার এক পূর্ব পুরুষ। তিনি সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। আর হবে না আমাদের বংশে কোন সন্ন্যাসীর জন্ম। অশুচি দেহে জন্ম নেন না কোন মহৎ ব্যক্তি।

আপনার ত্যাগও কম নয়। নিজের মা ও ভাইদের অন্ন দেবার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন। মন তো আপনার আজও পবিত্র, বল্লুম আমি।

"কে জানে? আমি চাই মুক্তি, আমি চাই গৃহ। ফিরে যেতে চাই আবার আমাদের দেশের বাড়িতে। আর ফেরা হবে না। আমি জেনেছি মৃত্যু ছাড়া আমার নেই মুক্তি।"

একী শোনালে আমায় নয়নী! সন্ন্যাসীর জন্ম হবে না বাঙ্গালীর গৃহে। কপিল মুনির মত করবে না মায়ামুক্ত, মোহমুক্ত?

স্বাধীন ভারতের রাজনীতি উৎসর্গ করলো নয়নীকে লুব্ধ পুরুষের চরণতলে, আর পরাধীন ভারতের রাজনীতি উৎসর্গ করেছিল প্রাতিলতাকে মায়ের চরনতলে। প্রীতিলতার উদ্দেশ্যে মাস্টারদা তার "Female Organization" প্রবন্ধের উৎসর্গ-পত্রে লিখেছিলেন।

"স্নিগ্ধ সুষমায় ভরা একটি পবিত্র ফুল তার পরিপূর্ণ সৌন্দর্য নিয়ে এই দীন পূজারীর কাছে এসেছিল মায়ের চরণের অর্ঘ হওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। পূজারীকে কত বড়ই সে মনে করেছিল। কত বড় শ্রদ্ধার আসন তাকে দিয়েছিল, মায়ের কাছে উৎসর্গীকৃত

হওয়ার জন্য। পূজারী ফুলটিকে অতি সমাদরে গ্রহণ করেছে। তার নিষ্কলঙ্ক শুভ্রতায়, সৌরভে মুগ্ধ হয়েছে, মায়ের চরণে তার যাওয়ার ব্যাকুলতা দেখে তাকে শ্রদ্ধা করেছে, শেষে মায়েরই চরণে তাকে অঞ্জলি দিয়ে তার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছে। সে আজ মায়ের কাছে চলে গেছে, মা তাকে কত যত্নে, কত আদরে বুকে তুলে নিয়েছেন।

পূজারী আজ ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছে সে যেন আজ ফুলের সঙ্গে তার পরিচয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে ফুলের মহত্বটুকু নষ্ট করে না ফেলে।

জাতির 'মহত্বটুকু' নষ্ট না হলে পরাধীন হয় না। আবার নৈতিক মৃত্যু না ঘটালে পরাধীন জাতিকে শাসনাধীন রাখা যায় না। নৈতিক মৃত্যু ঘটাবার শ্রেষ্ঠ উপায় পরাধীন জাতির গৌরবের ইতিহাস মুছে দেওয়া এবং তার পরিবর্তে বিজেতার গৌরবময় ইতিহাসকে পরাধীন ভারতের কণ্ঠস্থ করান। বাঙ্গালী তার অতীত ভুলে গেছে। তাই একদল করে কেবল চাটুকারী আর বাকী সবাই গৃহে বসে হা-হুতাশ।

ইংরাজ এই দেশের সমস্ত অঙ্গগুলিকে একত্রিত করে দেশের নাম-করণ করলো ইণ্ডিয়া, অঙ্গগুলির সমস্ত অধিবাসীকে একত্রিত করে সৃষ্টি করলো একটি জাতি, নাম তার 'ইণ্ডিয়ান'। পরস্পরের কথা বোঝবার জন্য ভাষা দিল ইংরাজী। কিন্তু শিশুদের দিল না তাহাদের নিজেদের পূর্ব পুরুষের গৌরবের ইতিহাস পাঠ করতে। ভয়, আবার যদি সিংহ-শাবক জন্মায়। পরিবর্তে দিল 'আমাদের রাজা ও রাণী অতীব দয়ালু'। শিশুমনে গেঁথে দিয়েছিল যে জ্ঞানে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, বীরত্বে ইংরাজ শ্রেষ্ঠ। ইংরাজ দেখলেই তাই মাথা নত করতো সমস্ত জাতি।

বাংলার মাটির কেমন যেন একটি শক্তি আছে! একটি ধান মাটিতে পড়লেই মাটি তাকে সযত্নে করে পালন, যেমন শিশুকে করে মাতা। আর বরুণদেবের একটু কৃপা হলেই শির করে উন্নত।

রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ কি বীজ ছড়ালেন, অমনি বিলাসী চিত্তরঞ্জন হলেন দেশবন্ধু, গীতার ব্যাখ্যা গেল বদলে, হাস্‌তে হাস্‌তে ফাঁসির রজ্জু গলায় পরলেন শত শত ক্ষুদিরাম! প্রাণ নিলেন, আবার প্রাণ দিলেন বিনয়, বাদল, দীনেশ। সিভিলিয়ান সুভাষচন্দ্র হলেন নেতাজী।

শত্রুকে সম্মান দেয় না ইংরাজ তাই বাঙ্গালী স্বাধীনতার সৈনিকদের নামকরণ করলো সন্ত্রাসবাদী, চিত্রিত করলো তাদের দেশদ্রোহীরূপে। সমর্থন পেল তথাকথিত অহিংসবাদীদের।

বাঙ্গালীর চরিত্র ব্যাখ্যা করে ইংরাজ আখ্যা দিল যে বাঙ্গালী সৈনিকের জাত নয়। ভীত হ'লো ইংরাজ, বুঝেছিল যে ক্ষুরধার বুদ্ধিজীবীদের হাতে অস্ত্র দিলে তার রাজত্ব ঘুচিয়ে দেবে। অস্ত্র না দিয়েই যথেষ্ট শিক্ষা পেয়েছে বুড়ীবালামের তীরে আর চট্টগ্রামে। তাই ইংরাজ তার ভারতীয় সৈনিক বাহিনী গঠন করলো বাঙ্গালী ভিন্ন অন্যান্য প্রদেশের লোক দিয়ে। তারা আগ্রহে লেহন করতো ইংরাজ পদ। পক্ষ নিলো ইংরাজের, বাধা হান্‌লো বাঙ্গালী স্বাধীনতা সৈনিকদের। কঠিন রাজনীতি!

ইংরাজ বা পাঠান মুঘল নতুন কিছু করে নি। ওরা রামায়ণ অনুকরণ করেছে মাত্র, বললেন গুহকদা—

ভাবালেন গুহকদা। ঠিকই তো। এও তো হতে পারে যে রাজা সগরপুত্রগণসহ নানা দেশ লুটপাট করে সর্ব শেষে এসেছিলেন দক্ষিণ বাংলায়। বাধা পান কপিল মুনির কাছে। অবশ্য শাস্ত্রে বলে যে কপিল মুণির উপদেশে রাজা সগর পুত্রগণসহ সাগর সঙ্গমে জীবন বিসর্জন দিয়ে মায়ামুক্ত, মোহমুক্ত হয়েছিলেন। কে জানে, স্বেচ্ছায় জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন, না কপিল মুণির প্রতাপে বাধ্য হয়েছিলেন জীবন বিসর্জন দিতে?

আরে, তোদের পরশুরামই বা কোন দেবতা? আস্‌ছিলেন সমস্ত ক্ষত্রিয় নিধন করতে করতে, ঠিক যেন

তৈমুর লং। বাধা পান ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে। কুঠারটি তাঁর নামিয়ে দিলেন বাঙ্গালীরা বাসন্তী অষ্টমী তিথিতে। অর্থাৎ ঐ তিথিতে তিনি হন পরাজিত। তাই ঐ তিথিতে বাঙ্গালীরা ব্রহ্মপুত্র নদে স্নান করে বিজয় উৎসব করে, বললেন গুহকদা।

কিন্তু শুনেছি যে মাতৃহত্যার পাপ কার্যের জন্য তাঁর কুঠার গিয়েছিল কাঁধে আটকে। বাসন্তী অষ্টমীতে ব্রহ্মপুত্রে অবগাহন করে পাপ মোচন হয়।

গঙ্গা যমুনা গেল তল্, ব্রহ্মপুত্রের কত তেজ বল্, ছড়া কাটলেন গুহকদা। আবার বললেন, গঙ্গা যমুনা এত মাহাত্ম্য ছেড়ে আসবে নাকি বাঙ্গালদের নদ ব্রহ্মপুত্রে স্নান করে পাপ মোচন করতে। ওদের ইতিহাস আমিও লিখি নি তোরাও লিখিস্ নি।

চিন্তায় ফেললেন গুহকদা।

নানা স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল এ দেশ। বাংলাও ছিল স্বাধীন। বাংলার সভ্যতাও ছিল স্বাধীন ও উজ্জ্বলতর, বললেন গুহকদা। কেন আমার একথা মনে হয় জানিস্?

বাংলাদেশকে বলে পাণ্ডব বর্জিত দেশ। কিন্তু কেন বলে? যে জাতের ভেতর নারীর সংখ্যা কম সে জাত কখনও উন্নত হয় না। নিশ্চয়ই কুরু পাণ্ডবের দেশে নারীর সংখ্যা ছিল কম। নারীর সংখ্যা কম ছিল বলেই নিয়োগ প্রথায় জন্ম হয় ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডব ও বিদুরের। নিয়োগ প্রথায় জন্ম হয় যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের। অন্যায় কিছু হবে না আমি যদি বলি যে নারীর সংখ্যা কম ছিল বলেই দ্রৌপদীর স্বামীত্ব লাভ করেন পঞ্চ পাণ্ডব সমবায় ভিত্তিতে। তারপর ভীম বিয়ে করেন রাক্ষসীকে। আর্য্য কৌলীন্য গেল মুছে।

বাংলার অবস্থা তা হলে কি রকম ছিল?

এলেন তো রাজসূয় যজ্ঞের ঘোড়া নিয়ে পাণ্ডব, কিন্তু

হারিয়ে ফেললেন নিজেদের বাংলার উজ্জ্বলতর সভ্যতার আবর্তে। দেখেন যে নরনারীর সর্ব বিষয়ে সমান অধিকার, অবাধ স্বাধীনতা। দেশে আর ফিরে যাবার নামটি নেই। কি রকম অবস্থা জানিস্? এখনকার অনেক ছেলে যায় যখন ইউরোপে, অবাধ স্বাধীনতার দেশ, নিজেকে ফেলে হারিয়ে। দেশে আর ফিরে আসতে চায় না। পাণ্ডবগণও বোধহয় আর ফিরে যেতে চান নি। ওদিকে রাজকার্য অচল। দুষ্টু ছেলেদের যেমন করে ধরে নিয়ে যায় বাড়িতে, ওঁদেরও বোধহয় সেই-রকম ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ওঁদের ব্রাহ্মণগণ দেখলেন ভারি বিপদ, অন্ন মারা যাবার অবস্থা। তাই বিধান দিলেন যে বাংলা পাণ্ডব বর্জিত দেশ, যেন আর কেউ না যায় বাংলায়।

জ্ঞানচক্ষু উন্মোচন হলো।

মনিপুরে গিয়ে তো অর্জুন ফিরতেই চাইলেন না। দেখিস্ না? এখনও হিন্দুস্থানীগুলি এখান থেকে দেশে যাবার আগে মাথা মুণ্ডন করে প্রায়শ্চিত্ত করে; তবে বাড়িতে ওদের প্রবেশ করতে দেয়।

ফিরলেন না বাংলার ছেলে বিজয় সিংহ। 'হেলায় লঙ্কা করিল জয়'। ইংরাজ বলে যে বাঙ্গালী যোদ্ধার জাত নয়। নদী মাতৃক বঙ্গভূমি। নিশ্চয়ই শক্তিশালী ছিল বিজয় সিংহের নৌবাহিনী। তা না হলে সৈন্য সামন্ত নিয়ে লঙ্কায় যাওয়া যায় না।

১৯৩৮ সালে মাদ্রাজ গিয়েছিলুম। অতিথি হলাম এক অব্রাহ্মণ ভদ্রলোকের। তিনি মাছ মাংস খান। গৃহস্বামীর নাম রামেয়া। তিনি উচ্চ শিক্ষিত। সিনেমা শিল্পের একজন খ্যাতিমান ব্যাক্তি।

আমি অবাক হই গৃহস্বামীর কথা শুনে। তিনি বললেন যে তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন বাঙ্গালী। তাঁরা হলেন কহ্লার সম্প্রদায়ভুক্ত। খৃষ্ট জন্ম পূর্বে তাম্রলিপ্ত থেকে জাহাজ চেপে তার পূর্বপুরুষগণ মালবার উপকূল জয় করে রাজ্য স্থাপন করেন। তাম্রলিপ্ত থেকেই বর্তমানের

'তামিল' শব্দের উৎপত্তি। তার পূর্ব পুরুষগণ বাংলার উপকূল, দক্ষিণ ব্রহ্মদেশ ও সিঙ্গাপুর পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেছিলেন।

আমি শুনে তো অবাক।

আমি আরও বিস্মিত হলুম শুনে যে তাদের পূর্বপুরুষের ইতিহাস তারা প্রথম জ্ঞাত হন্ সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের কাছ থেকে।

আমার সাল বা তারিখ মনে নেই। বোধ হয় ১৯৩১ কি ১৯৩২ সাল। বাংলার মধুদাকে মান্দালয় বন্দীশালা থেকে বদলী করা হয়েছে মাদ্রাজের বোধ হয় ট্রিচী কারাগারে। বাংলায় তখন অগ্নিযুগ, মাদ্রাজে তখন অহিংস সত্যাগ্রহযুগ। সত্যাগ্রহ করে কারাগারে এসেছেন রামেয়ার অগ্রজ শ্যামেয়া। অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত সর্বত্যাগী নেতাকে দেখে শ্রদ্ধায় শ্যামেয়া ও তার সহবন্দীদের মাথা হ'লো নত। শ্যামেয়া বিস্মিত হলেন মধুদার কাছ থেকে তার পূর্বপুরুষের ইতিহাস জেনে—কহ্লার সম্প্রদায়ের ইতিহাস জেনে। তারপর শ্যামেয়া কারাগার থেকে পত্র লিখলেন তার সম্প্রদায়ের অন্যান্য লোকদের কাছে নিজেদের পূর্ব ইতিহাস জানিয়ে এবং মধুদার কথা লিখে। কহ্লার সম্প্রদায়ের হাজার হাজার নারীপুরুষ সত্যাগ্রহ করে কারাবাস বরণ করে মধুদাকে দর্শন করতে এসেছিলেন। সত্যাগ্রহীর ভেতর সত্তর বৎসর বয়সী বৃদ্ধও ছিলেন। আরও জানলুম যে ইণ্ডিয়া গেজেটিয়ারে কহ্লার সম্প্রদায়ের ইতিহাস লিখিত আছে।

আর একটি ঘটনা। ১৯৫০ সালে মে কিম্বা জুন মাসের দুপুরে বসে আছি নতুন দিল্লীর কন্‌স্টিটিউসন্ হাউসের বসবার কক্ষে এক বন্ধু সহ। আমাদের সম্মুখের সোফাদুটি ছিল খালি। দুজন মহিলা অনুমতি নিয়ে বসলেন সোফাদুটিতে।

নারীর ঔৎসুক্য অতি প্রবল। জানতে চাইলেন আমরা দুই বন্ধু কোন্ ভাষায় কথা বলছি। বললুম আমাদের মাতৃভাষায়, বাংলায়।

"বাংলা", বলে দু'মহিলাই যেন আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। বললেন যে তাঁদের পূর্বপুরুষ ছিলেন বাঙ্গালী। বিজয় সিংহের সাথে

গিয়েছিলেন লঙ্কায়। তাঁরা জানালেন যে লঙ্কার বর্তমান অধিবাসীর বেশীর ভাগের পূর্বপুরুষ ছিলেন বাঙ্গালী। খুব তাদের কৌতূহল বাংলাদেশের খবর জানবার।

জিজ্ঞাসা করলেন বাংলাদেশ কেন ভাগ হ'লো? কেন সেখানে মুসলমান? বৌদ্ধ নয় কেন? কত প্রশ্ন। কত তাদের আগ্রহ পূর্ব পুরুষের মাতৃভূমির বর্তমান ইতিহাস জানবার।

সসৈন্যে ফিরলেন না বিজয়, আপন করে নিলেন লঙ্কাবাসীকে। আর ফিরলেন না মহাজ্ঞানী দীপঙ্কর তিব্বত থেকে। বাংলার ছেলে দীপঙ্কর, গৃহ ছিল তার বজ্রযোগিণী গ্রামে, নালন্দা বিশ্ব'বিদ্যালয়ের ছিলেন অধ্যক্ষ। আজ তাঁর নাম মুছে দিয়েছে বিহার সরকার নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, কারণ তিনি ছিলেন বাঙ্গালী। আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন জ্ঞানদান করতে তিব্বতীদের। বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন মহাজ্ঞানী।

কেন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন মহাজ্ঞানী আদি পুরুষগণ? করেছিল কি নিজ সমাজে কনৌজাগত পুরোহিত প্রবেশ? শিথিল হয়েছিল কি আমাদের সমাজ বন্ধন? তাই বোধ হয়। বিদ্রোহের ছিল প্রয়োজন। বেদকে করেছিল বিকৃত, ব্রাহ্মণগণ নিজ স্বার্থ হেতু। তাই বিদ্রোহ করেছিলেন গৌতম। বেদকে দিয়ে এলেন বিবেকানন্দ সাগরের ওপারে যাদের বলে ব্রাহ্মণ্য সমাজ ম্লেচ্ছ। যে বেদের বাণী শুনে ধন্য হবে নরকুল তাকে রেখেছিল কুক্ষিগত করে এক শ্রেণী।

জরা এসেছিল সমাজে। বুদ্ধদেব জড়তা দূর করে সমাজকে
করেন নবীন, বললেন কুশল।

ভাবপ্রবণ বাঙ্গালী জাতি। ভাসিয়ে দিলেন নিজেদের পরিবর্তনের স্রোতে। সঙ্ঘ প্রথার হ'লো প্রচলন। ঠিক যেন আধুনিক কমিউনিজম্।

সাম্যবাদের স্রোতে ভাস্‌ছেন অধুনা শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক যুবতী। কমিউনিজম্ একটি ধর্ম্ম। মার্ক্স, লেলিন, স্ট্যালিন সব দেবতা বা

পয়গম্বর। 'ক্যাপিটেল' হ'লো গীতা। মস্কো হ'লো মক্কা। তাই যান অধুনা কমিউনিষ্ট নেতাগণ তীর্থ করতে। ওদের সমাজও হয়েছে আলাদা। আবার বিয়ে-সাদি হচ্চে নিজেদের ভেতর।

কিন্তু লজ্জা এখনও ভাঙ্গে নি। তাই 'রেজেস্ট্রী' করে বিয়ে করেও আবার ধাড়ীগুলি হিন্দুমতে সাতপাক খায়, বললেন গুহকদা।

যদিও কমিউনিষ্টদের দলগত নীতি আমি পছন্দ করি না, তবুও সমাজের জড়তা দূর করবার জন্য ওদের আবির্ভাব প্রয়োজনীয়। নতুন কিছু নেই ওদের মতবাদে, তাই বৌদ্ধ ধর্ম্মের মতই মিলিয়ে যাবে বাঙ্গালীর নিজস্ব সাম্যবাদের আবর্তে।

বাংলার সাম্যবাদের রাজা ছিলেন শশাঙ্ক। রাজনীতির চক্রান্তে পড়ে বাংলার ছেলেমেয়েদের সাথে তাঁর হয়নি পরিচয়। রাত জেগে তারা মুখস্ত করে হর্ষবর্দ্ধনের গুণগাথা। কিন্তু শশাঙ্ককে চেনে তারা শুধু রাজ্যশ্রীর হরণকারীর সুহৃদ বলে। শশাঙ্কের ইতিহাস জানা হলে ওরা যে জানবে ওদের নিজেদের ইতিহাস। তাই বিজেতা চায় না সোজা হোক ওদের মেরুদণ্ড। ব্রাহ্মণ্য সমাজ যাদের করেছে অস্পৃশ্য কৈবর্ত, তারাই ছিলেন শশাঙ্কের নৌ-বাহিনী। অত্যাচারিত হয়ে ওরা হয়েছে মুসলমান, কিন্তু ঐতিহ্য আজও বজায় রেখেছে। জাহাজ পরিচালনায় ওরা বিখ্যাত।

প্রবেশ করলো কনৌজাগত ব্রাহ্মণ্য শাসন। আনলো ভেদাভেদ। যেমন ভেদাভেদ এনেছিল ইংরাজ। আনলো জাতির নৈতিক অবনতি। এলো হাঁচি, এলো টিকটিকি।

তোর কথাই ঠিক। বাংলাদেশে বোধ হয় পুরোহিত ছিল না। পুরাকালের সব গল্পেই পাই রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, শ্রেষ্ঠীপুত্র, কোটালপুত্র সব বন্ধু ছিলেন। কিন্তু কোথাও পাই না পুরোহিত পুত্র। আর ভেদাভেদও ছিল না কারণ তা' হ'লে ওদের বন্ধুত্ব হতো না, বললেন গুহকদা।

সপ্ত ডিঙ্গা ভাসায়ে যে চাঁদ সদাগর সারা বিশ্বে বাংলার পণ্য ছড়িয়ে দিয়ে আসতেন, আর দিয়ে আসৃতেন বাংলার সভ্যতার ও কৃষ্টির ভাবধারা, বহন করে আনৃতেন পরদেশের যা কিছু ভাল, সেই চাঁদসদাগরের গোষ্ঠীকে হাঁচি, টিকৃটিকি দিয়ে মারলে। শিশু মনে ভয় ঢুকিয়ে দিল সদাগরের বাণিজ্য পোত ডুবির গল্প দিয়ে, ওরা যেন আর সাহস না পায় সাগর পাড়ি দিতে।

বাংলার সভ্যতার উৎস ছিল সামুদ্রিক বাণিজ্য। যেমন ইংলণ্ডের। সামুদ্রিক বাণিজ্য জাতিকে করে উন্নত ও উদার। কনৌজীয় শাসন প্রথম হানৃলো আঘাত বাংলার সভ্যতার উৎস মূলে। বিধান দিল যে "কালাপাণি" পার হ'লে জাত যাবে। তাই চট্টগ্রামের সদাগরকুল আজ মুসলমান, কিন্তু সদাগর পদবীটি আজও রেখেছে বজায়।

পাকিস্থানের সূচনা তা' হ'লে ওখানে ?

রাজা গণেশের পুত্র যদু হ'লো মুসলমান, আনৃলো মক্কা থেকে হজরতের কাষ্ঠ পাদুকা, যা' এখনও আছে গৌড়ে। হিন্দু মুসলমান হ'লে গরু খায় 'ত্নুনা'। যদুও তাই করলেন। গণেশের শুড় দেয়ালে পুতে মাথা দিয়ে করলেন সিঁড়ির ধাপ।

তারপর ?

তারপর ? তোরা হলি সব কুলীন। বল্লালী আমল। মুসলমানের হাঁচি শুনে লক্ষণ সেনের পলায়ন। এলো পাঠান, এলো মুঘল, এলো ইংরাজ। কিন্তু কি শেলই দিয়ে গেছে এই সেন যার জন্য বাংলার কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার শুকায় না অশ্রু, বললেন গুহকন্যা।

চৈতন্য এসেছিলেন ত্রাণকর্তারূপে। ঐক্যের বাণী নিয়ে। ঘুচিয়ে দিলেন জাতিভেদ। বৈষ্ণব ধর্ম্ম হ'লো যোদ্ধ হিন্দু ধর্ম্ম। তিনি করলেন সমাজ সংস্কার। কণ্ঠী বদল বিবাহ প্রথার হ'লো প্রচলন। কি মধুর তার বাণী—দিনান্তে একবার হরিনাম করলে সব পাপ হয় দূর।

চৈতন্যকে বুঝ্‌লো ভুল তাঁর চেলারা। তাই দিনরাত করে,

"বল মন হরি হরি,

রান্না হতে কত দেরী।" ছড়া গুহকদার।

পরিণত হল ন্যাড়া-নেড়ী দল। ব্রহ্মচর্য্য করে না পালন, আহারে হ'লো অহিংস। তার পরিণাম?

"বাবু, ওদের কাশির শব্দ শুন্‌লে আমরা দোর বন্ধ করি,"

মাত্র কয়েকদিন পূর্বে আমাকে বলেছে নদীয়াবাসী এক কৃষক। "ওদের" অর্থে মুসলমানদের।

ন্যাড়ানেড়ী পাল্লায় পরে গীতার শ্রীকৃষ্ণ হয়েছেন নদীয়াতে গোপিণী-মনচোরা। খান তিনি ঘাস পাতা, বিহার করেন সমগ্র গোপিনা মাঝে। ইজ্জৎ বাঁচিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণের ঋষি অরবিন্দ, তাঁ' উত্তরপাড়ার বক্তৃতাতে, আর প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। কৃষ্ণমূর্তি বক্ষে ধারণ করে তিনি জীবন বিসর্জন দেন চট্টগ্রামের সমরে।

সর্বদেশে কৃষককুল হয় সব চেয়ে দৈহিক শক্তি সম্পন্ন। আর পশ্চিমবঙ্গে? ত্রিশ ইঞ্চির উপর হয় না হিন্দু কৃষকের ছাতি। পশ্চিম বাংলার পুলিশ বিভাগে দৈহিক অক্ষমতার জন্য ওরা পান না চাকুরী।

পায়রার মত বুক, ম্যালেরিয়ায় হয়েছে উচ্ছন্ন। তবু খাবে না রসুন।

নিশ্চয়ই বৈষ্ণবদের এই অবৈষ্ণবীয় কার্য্যের জন্য ওদের নেতাগণ তৎকালে উৎসাহ পেয়েছিলেন তৎকালীন বিদেশী শাসক দ্বারা। কেউ বা পেয়েছিলেন খেতাব, কেউ বা জমি জিরাত। কারণ শাসিতের দৈহিক নির্জীবতা ও নৈতিক অবনতি পরদেশী শাসকের শাসনকে করে বিপদমুক্ত।

এই ন্যাড়ানেড়ী দেখেই নিশ্চয় মধুসূদন ও তৎকালীন যুবকগণ প্রকাশ্যে খেতেন সোমরস আর নিষিদ্ধ মাংস। আরে ক্ষত্রিয়ের খাদ্যই হ'লো বন্য বরাহ আর সোমরস। এই খাদ্য বন্ধ করে জাতিকে প্রথম ক্লীবত্বে আনেন বুদ্ধ চেলাগণ। যার

পরিণামে এল শক, হূণ পরে মুসলমান। আর গোপিনীমন-চোরাতে পরিণত হয়ে কৃষ্ণভক্তগণ আন্‌লেন ডেকে ইংরাজকে, বললেন গুহকদা।

কৃষ্ণহীন নিরামিষ ভোজী বৈশ্য রাজত্ব আজ ভারতে। এভাবে আর কিছুকাল চল্‌লে বন্দুক তুলবার লোক পাওয়া যাবে না। যেমন হয়েছিল অর্জুনের। যাদব নারী নিয়ে গেল লুট করে কিন্তু প্রতিবাদ হ'লো না।

প্রতিবাদ করলো বাঙ্গালী। কায়স্থ নরেন্দ্রনাথ হলেন বিবেকানন্দ। বিপ্লব আনলেন সমাজে ও ধর্মে। পার হলেন সমুদ্র। হিন্দুর বাণী প্রচার করে এলেন সারা বিশ্বে। জাত কিন্তু তাঁর গেল না।

জমি চাষ করলেন রামকৃষ্ণ, বীজ বুনলেন বিবেকানন্দ, জল দিলেন লর্ড কার্জ্জন, তাই বাঙ্গালীর হ'লো নিদ্রাভঙ্গ। বাংলার বিপ্লবীদের জনক বলি লর্ড কার্জ্জনকে।

বাঙ্গালী ভাবপ্রবণ জাতি। তাই রাজনীতি ও রাজনৈতিক নেতাগণ আমাদের জীবনকে সর্বদা প্রভাবান্বিত করেন। লর্ড কার্জ্জন যখন বাংলাকে ভাগ করে পূর্ববঙ্গ ও আসাম এক প্রদেশ করতে চেয়েছিলেন তখন রাজনীতি বাধা দেয়। তৎকালীন রাজনৈতিক নেতাদের আজ আমরা প্রশংসা করতে পারি না।

পূর্ব বাংলা আসাম যদি পৃথক প্রদেশ হতো তবে হয়তো আজ পূর্ব পাকিস্থানের জন্ম হ'তো না। অধিকন্তু পূর্ব বাংলার পাটের টাকায় যে কোলকাতা গড়া হয়েছে সেই অর্থ পূর্ব বাংলার নদনদীর উন্নয়নের জন্য খরচ হতো।

শুধু কোলকাতা নয়, পাঞ্জাব ও সিন্ধুর মত উন্নতি সবই পাটের টাকায়, বললেন গুহকদা।

লর্ড কার্জ্জনই প্রথম ইংরাজ যিনি চিনেছিলেন বাঙ্গালীকে। জেনেছিলেন যে কোলকাতায় রাজধানী থাক্‌লে শান্তিতে রাজত্ব করা যাবে না। তাই তিনি চলে গেলেন দিল্লী।

দিল্লী! রাজধানী দিল্লী, কিন্তু তার অশ্রু শুকায় না।

উড়ু ভেঙ্গে কাঁত হলেন রাজা দুর্যোধন, গেলেন কাঁদতে কাঁদতে পঞ্চ পাণ্ডব দ্রৌপদী সহ ছেড়ে রাজ্য। সংযুক্তার অশ্রু শুকাবে না কোন কালে। পাঠান কত চোখের জল ফেলে গেল, এলো মুঘল।

সাধের লাল কেল্লায় প্রবেশ করতে পারলেন না সাজাহান। তস্য প্রিয় পুত্র দারার মৃত দেহ শত ছিন্ন হলো দিল্লীর রাজপথে। কত নরনারী ফেলেছে অশ্রু দারার শোকে। বাদশা আলমগীর গেলেন দাক্ষিণাত্যে, আর ফিরলেন না।

এলো ইংরাজ। বাঙ্গালী হয়ে বেশ সুখেই ছিল কোলকাতায়। বানিয়ার হ'লো বাদশা হবার রোগ। রাজধানী স্থানান্তরিত করলো দিল্লীতে। অশান্তির হ'লো সুরু। নদীয়ার পোরাগাছার ছেলে বসন্ত বিশ্বাস দিল্লীতে গিয়ে বৈষ্ণব মতে বোমা ছুড়ে লর্ড হার্ডিঞ্জের মুখটি দিলেন পুড়িয়ে।

শান্তি আন্‌লেন লর্ড মাউণ্টব্যাটেন পনরই আগষ্ট ১৯৪৭ সালে নিজ প্রসাদে বৃটেনের পতাকা নামিয়ে ভারতের পতাকা উত্তোলন করে।

সেবাব্রতী কংগ্রেস হ'লো বাদশা, তাই গান্ধীর অশ্রু শুকাবে না কোন কালে।

শত্রুতা ছিল অশ্রুর সাথে সূর্য্যকান্তের। ধন্যবাদ কার্জনকে। তিনি জাগরিত করেছিলেন বাঙ্গালী জাতিকে। ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তাদের দেশাত্মবোধ। কত অনুনয়, বিনয়, লোভ দেখিয়েছিলেন।

কার্জন ময়মনসিংহের মহারাজ সূর্য্যকান্তকে বাংলা বিভাগের স্বপক্ষে আনবার জন্য। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ লোভকে করলেন জয়। ভয় দেখান হ'লো। ব্রাহ্মণ পালন করেন ক্ষাত্র ধর্ম, তাই ভয়শূন্য। হাসিমুখে সব অত্যাচার সহ্য করেছিলেন। ইচ্ছা করলেই অর্জন করতে পারতেন প্রভূত অর্থ ও সম্মান। কিন্তু বাংলার সমাজ মানসিংহের দেশওয়ালীর সমাজ নয়। এখানে দেশাত্ববোধ কেনাবেচা হয় না।

রাজনীতি বাংলাকে ফিরিয়ে আনে ব্যবসাবাণিজ্যে। নিজ স্বার্থ-

হেতু ধ্বংশ করেছিল ইংরাজ বাংলার শিল্প। সম্মান দান করতো জমিদারদের। তাই রাজ সম্মান লালসায় সব বেনেরা ব্যবসা ছেড়ে কিনলো জমিদারী, নামের পেছনে লিখতে সুরু করলো "রায় চৌধুরী" শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী এলো এগিয়ে। বাঙ্গালীর যে কয়েকটি বৃহৎ শিল্প আজ মাথা উচু করে আছে তাঁর প্রায় সবগুলিই স্থাপিত হয়, দেশপ্রেমের অনুপ্রেরণায় এবং দেশবাসীর পূর্ণ সহযোগিতায়।

বায়ুর বেগে ভেসে যায় বাঙালী ভাবপ্রবণতায়, তাই নেই কোন ব্যবসাবুদ্ধি। বাংলার দেশপ্রেমের অন্ধতার সুযোগ নিল বম্বে ও আমেদাবাদ। ওখানকার মিলের চটের মত মোটা কাপড় বাঙালী মাথায় করে নিল। কিন্তু কি পেল? বম্বে ও আমেদাবাদের মিল মালিক বাংলার কয়লা কিনতে রাজী ছিলেন না কারণ, বাংলার কয়লা দরে মন প্রতি দু'পয়সা বেশী পড়ত দক্ষিণ আফ্রিকার কয়লার চেয়ে। বাংলার আদর্শবুদ্ধি যখন বিলাতী কাপড় বর্জন করেছে, তখন বম্বে ও আমেদাবাদের হিসাবীবুদ্ধি বাংলার কয়লা বর্জন করেছে।

উত্তর প্রদেশ ও বিহার নিল বাংলার আদর্শবুদ্ধির সুযোগ। ঢুকল এসে বাংলার পুলিশ বাহিনীতে। ওরাও কিন্তু হিন্দু। ঘৃণা করে মৎস্যাহারী বাঙ্গালীকে। আরও সুযোগ নিল নেপালী। সবাই মিলে বৃটিশের সাথে হাত মিলিয়ে লুট করতে লাগলো বাংলাকে। উদার বাঙ্গালী, আত্মভোলা বাঙ্গালী তাই আজও ওদের পুষছে।

তাইতো চৌড়ীচেরার ঘটনার পর অহিংস পন্থায় স্বাধীনতার আন্দোলন শিকেয় তুলে কর্ম্মহীন হলেন গান্ধী মহারাজ।

বাঁচিয়ে দিলেন দেশবন্ধু। পরাধীন জাতির স্বাধীনতা লাভ করবার জন্য তৈরী করলেন স্থায়ী কর্ম্মপন্থা। দেশবন্ধু দিলেন নতুন নীতি—গণতান্ত্রিক উপায়ে কাউন্সিলে প্রবেশ। পরাধীন জাতি পেল প্রথম স্বাধীনতার আস্বাদ। চেতনা লাভ করলেন জনগণ। জাগরিত করলেন সারা ভারতকে স্বরাজ্য দল। হিন্দু মুসলমান মিলিত হলেন দেশবন্ধুর নেতৃত্বে।

চিত্তরঞ্জন শুধু প্রাণদান করেই জাতির চিত্ত জয় করেন নি, পার্থিব সমস্ত সম্পদ নিস্বার্থ ভাবে দান করেছিলেন জাতির মঙ্গলের জন্য। হর্ষবর্ধনের দানের গাথা বাঙালীর ছেলেমেয়েরা রাত জেগে মুখস্থ করে পরীক্ষা দেয় কিন্তু তাদের জানতে দেওয়া হয়নি যে দেশবন্ধুর দান হর্ষবর্ধনের দানের চেয়েও মহান। পরদিন পূর্ণ হতো হর্ষবর্ধনের রাজকোষ, কিন্তু দেশবন্ধুর ব্যাঙ্কের খাতায় জমা দেবার জন্য ছিল না কোন মক্কেল।

অস্তগত হলেন দেশবন্ধু। আবার ক্লীবের হাতে গেল কংগ্রেসের নেতৃত্ব। ইংরাজ গ্রহণ করলো সুযোগ।

হড্সন ঢাকার পুলিশ সুপার, বিনয় বসু যাকে গুলি করে মৃতপ্রায় করেন, এক হিন্দু জনতাকে বলেছিল, তোমাদের উপর মুসলমান গুণ্ডা লেলিয়ে দেব।

এই ভেদাভেদ হলো ইংরাজ শাসননীতি যার পূর্ণ প্রকাশ হয় ১৯৩৫ সালের ভারত সংবিধান আইনে। পাকিস্তানের ভিত্তি হলো স্থাপিত।

ক্লীবের ধর্ম হলো না গ্রহণ না বর্জন। তাই কংগ্রেস না গ্রহণ, না বর্জন নীতি অবলম্বন করলো। ফল? দুটি পাকিস্তানের বীজ হলো রোপন। শুধু হিন্দু মুসলমানকেই ভাগ করে ক্ষান্ত হয়নি ১৯৩৫ সালের ভারত সংবিধান আইন। ভাগ করে দিল হিন্দুদের। বর্ণ হিন্দু ও হরিজন হিন্দু। খেলা সুরু হলো ইংরাজের। হিন্দুস্থানী অহিংস বর্ণহিন্দুদের 'মরাল কংকোয়েষ্ট' দিল ঘুচিয়ে। উত্তরপ্রদেশ, বিহার প্রভৃতি প্রদেশের লোকজন নিজেদের বলেন হিন্দুস্থানী। এই 'মরাল কংকোয়েষ্টের' নমুনা দেখেছিলুম মালদহে।

"পায়ে ধরি প্রভু, পায়ে ধরি, অভিশাপ দেবেন না।" কাতর কণ্ঠে আবেদন করেছিল কতিপয় বিহারী কুলি তাদের পুরোহিতকে'।

ঘটনাটি ঘটেছিল মালদহে ১৯৫২ সালে। বন্ধুবর ঠিকাদার।

সরকারের কাছ থেকে ইট্ তৈরী করবার ঠিকা পেয়েছিলেন। মালদহে ইট তৈরী করবার মজুর আমদানী করা হয় বিহার ও উত্তরপ্রদেশ থেকে। বিহারী ব্রাহ্মণ যুবক মিশ্রীজী আমার বন্ধুবরের মজুর সংগ্রহকারী। দাদন দিয়ে মিশ্রীজী এনেছেন দু'শ মজুর। তার থেকে জনা কুড়ি মজুর পালিয়ে গিয়ে অন্য ঠিকাদারের কাজে যোগ দেয়। কুপিত হলেন ব্রাহ্মণ, কারণ তার অর্থ ক্ষতি।

খালি গায়ে ফোঁটা তিলক কেটে পৈতে হাতে নিয়ে "অভিশাপ দেব, অভিশাপ দেব" বলে মিশ্রীজী তাণ্ডব নৃত্য সুরু করলেন মজুরদের মাঝে। ভীত হ'লো মজুরকুল। পলাতক সহকর্মীদের ফিরিয়ে আনবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে শান্ত করলো প্রভুকে।

সুবিধাবাদী ইংরেজ আইন করে মিশ্রীজীদের 'মরাল কংকোয়েস্ট'এ আঘাত হান্‌লো।

'মরাল কংকোয়েস্ট' অনেকদিন পূর্বে বাংলা থেকে পাট তুলেছে। তার কারণ ভাষা, শিক্ষা, অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা, চৈতন্য ও রামকৃষ্ণের প্রভাব এবং বাংলার গণতান্ত্রিক পল্লীসমাজ।

গণতান্ত্রিক পল্লীসমাজ ছিল পূর্ব বাংলার শক্তি। গণতন্ত্র মানুষকে দেয় অধিকার তার গৃহে, ভূমিতে। সেই অধিকার তাকে মায়ায় করে আবদ্ধ। সে হয় সংসারী। সংসারী করে তার সম্পত্তির উন্নয়ন ও বর্ধিত, আর করে রক্ষা। এই মায়া থেকে জন্মায় তার দেশাত্মবোধ। দেশাত্মবোধ বাড়িয়ে দেয় তার মায়ার পরিধি। তখন সমস্ত দেশের মায়ায় সে হয় আবদ্ধ। তাই দেশের মঙ্গলের জন্য প্রাণ দিতে বা নিতে কুণ্ঠিত হয়নি বাঙ্গালী।

তাই বল্। দ্রৌপদীর গণতান্ত্রিক সমবায় সংসার ছিল না বাংলাদেশে, বললেন গুহকদা।

পাণ্ডবদের দুর্বলতার মুলই ছিল সমবায় ভিত্তিতে শ্রীমতীর

পতিত্বলাভ। শুধু তাই নয়, বাংলার সমাজে 'ধর'রে-লক্ষণ ও ছিল না।

যা বলেছিস্! বেচারা লক্ষণ! জীবনটা কাটিয়ে দিল 'ধর' রে-লক্ষণ শুন্‌তে শুন্‌তে, বললেন গুহকদা।

আমাদের সমাজের প্রত্যেক লোকের ছিল গৃহ। আর ছিল জমি। তার মালিক ছিলেন তাঁরা নিজেরাই। পল্লী সমাজ গড়ে উঠেছিল এই সব মালিকদের সহযোগিতায়।

শিক্ষক ছিলেন আমাদের গাঁয়ের মহেন্দ্র পণ্ডিত। তার শিক্ষকতার জন্য তিনি পেয়েছিলেন দশ বার বিঘা নিষ্কর জমি। পাঠশালাটি ছিল গাঁয়ের জমিদার বাড়ীতে। গাঁয়ের সমস্ত ছেলে সেখানে বিদ্যার্জ্জন করতো বিনা খরচায়। তাই গাঁয়ে ছিল না কোন নিরক্ষর। আজও মনে আছে পাঠশালা ছুটির পূর্বে সব ছেলেরা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে নামতা আর শুভঙ্কর উচ্চ কণ্ঠে পাঠ করতো।

গ্রামে ছিল না কোন চোর ডাকাত। শুনিনি কোন লোকের হয়েছে কোনদিন জেল। অপরাধের বিচার করতো গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ।

গ্রাম্য অর্থ বণ্টনের নিয়মও ছিল সমবায় ভিত্তিতে। সবাইরই ছুটি বা পেন্‌সন্ আছে, নেই কেবল হিন্দুর দেবদেবীর। তাই বার মাসে তের পার্বণ। নিমন্ত্রণ হতো সমস্ত গ্রামবাসীর পূজার প্রসাদ গ্রহণ করবার জন্য।

কোলকাতার তুলনায় অর্থশালী ছিল না কিন্তু কোলকাতার সর্ব-গ্রাসী ক্ষুধা আর হৃদয়হীনতা ছিল না পল্লী সমাজে। আনন্দিত ও সন্তুষ্ট ছিল সমাজ।

ইংরেজ বদ্ধপরিকর হলো বাংলার এ সমাজ ভাঙ্গবার জন্য। সমাজের সম্মুখে ধরলো লালসা। সরকারী চাকুরীর মোহ দিল সমাজকে। সমাজের ভাল ভাল যুবকদের করলো আই, সি, এস, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ইত্যাদি। চাকুরী দিয়ে নতুন নতুন শ্রেণী তৈরী করলো যা'তে ওরা না মেশে সমাজের সাথে।

শুনিস নি? আগে বলতো জজের বাড়ী, ডেপুটির বাড়ী। আর দেখিস্ না বালীগঞ্জে অনেক বাড়ীতে লেখা আছে অমুক চন্দ্র অমুক, জেলা জজ বা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, আর ছোট করে লেখা থাকে রিটায়ার্ড। ছিল তো সাব ডিপ্‌টি বা মুন্‌সেফ। ঘষতে ঘষতে হয়েছিল কয়েকদিনের জন্য জজ বা ম্যাজিষ্টেট। গেঁয়ো হরচন্দ্র বাবাকে দিয়ে বাজার করায়, বল্‌লেন গুহকদা।

বলেছিলেন এক অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি বলেছিলেন, মশাই, আমি গ্রাম্য পুরোহিতের ছেলে। আমাকে মাহিনা দেয় পনরশ টাকা। কত নিয়ম কানুন। যাতে আমি আর না মিশতে পারি আমার সমাজের সাথে।

আর আই, সি, এস্! ওদের একমাত্র দুঃখ যে ওদের গায়ের রং কালো, বললেন কুশল।

এই রাজনীতিতে ইংরাজ কিছুটা সফল হয়েছিল। গ্রাম ছেড়ে শিক্ষিত লোকের সহরে বাস আরম্ভ হ'লো। যাদের গ্রামের সম্পত্তির আয়ের উপর নির্ভর করতে হতো তারা পুজো পার্বণে গাঁয়ের বাড়ীতে এক আধবার যেতেন গ্রামবাসীকে শহুরে সভ্যতা দেখিয়ে তাক্ লাগাবার জন্য।

মাগো! তোমায় খায় চেলামাছে আমায় খায় পাওনা-দারে, ছড়া কাটলেন গুহকদা, আর বললেন, তাই আর যায় না।

কিন্তু ইংরাজ বাংলার শক্তির মুল উৎপাটন করতে পারে নি। তাই ১৯৩৫ সালের ভারত সংবিধান আইন দিয়ে আবার আঘাত হানলো উৎসমূলে। সৃষ্টি হলো উচ্চ বর্ণ হিন্দু ও হরিজন। আজও ঠিক জানি না বাংলার কোন কোন সম্প্রদায় হরিজন। জলপান করে প্রায় সবাই সবাইর হাতে। এ কথা ঠিক যে কিছু লোকের সুবিধা হয়েছে। হরিজনের খাতায় নাম লিখিয়ে বিধান সভায় বা কেন্দ্রীয় এসেম্ব্লীতে অনেকে আসন লাভ করেছিল আর মুসলীম লীগের সাথে মিতালী করে মন্ত্রী হয়েছিল।

বাংলার হিন্দু বা মুসলমান কেউই এই ভেদাভেদ স্বীকার করেন নি। বাংলার দুর্ভাগ্য দেশপ্রিয় সেনগুপ্ত গত হন। বাংলার অন্যান্য নেতাগণ ও কর্মীগণ তখন ছিলেন বন্দী।

কতিপয় বাঙ্গালী কংগ্রেস নেতা করলেন কংগ্রেসের নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, তারা গঠন করলেন "কংগ্রেস ন্যাশানালিস্ট" দল। নির্বাচনে পরাজিত করলেন কংগ্রেস প্রার্থীদের।

মুসলমান সমাজও মেনে নেয় নি এ ভেদাভেদ। মুসলীম লীগ হলো পরাজিত বরিশালের বাঙ্গাল ফজলুল হকের "কৃষক-প্রজা" দলের কাছে। অরাজনৈতিক গান্ধী ও তার চেলা চামুণ্ডা তাই ঠেলে দিলেন ফজলুল হক্‌কে মুসলীম লীগের কবলে।

ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মের দোষগুলির অধিকারী হয়েছেন হিন্দুস্থানী কংগ্রেস নেতাগণ। এ ধর্মে যারা পতিত হন তাদের উদ্ধারের পথ নেই। নলিনীরঞ্জন সরকারকে যদি কংগ্রেস উদ্ধার করতো তবে নাজিমুদ্দিনকে বিরোধী দলের নেতা হয়ে থাকৃতে হ'তো।

অবাঙ্গালী নেতাগণ বুঝতেই পারেন না যে বাংলার হিন্দু ও মুসলমানের ভাষা ও কৃষ্টি এক। অবাঙ্গালী ব্রাহ্মণ যেমন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের স্পর্শ করা জল পান করে না, তেমনিই অবাঙ্গালী মুসলমানের নিকট বাঙ্গালী মুসলমান হরিজন।

১৯৩০ সালে বাংলায় আবার আগুন জ্বললো। কত ইংরাজ হলো হত। দেশপ্রেমের অপরাধে বন্দী করে রাখলো ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত প্রায় দশ হাজার যুবক যুবতীকে।

কপিলমুনির জাতভাই ওরা তাই পিতামাতা, ভাইবোন, স্ত্রী-পুত্র, ধনদৌলত, স্নেহ ভালবাসা, পার্থিব কামনা বাসনা সব বিসর্জন দিয়ে মায়ামুক্ত হয়েছিলেন। কোনদিন করেন নি অনুশোচনা।

অনুশোচনা! আমার মনে পড়ে ভবাণীকে। তাঁর ছিল না কোন অনুশোচনা! যুবক ভবাণীপ্রসাদ ভট্টাচার্য বাংলার কুখ্যাত গভর্ণর

স্যার জন্ এণ্ডার্সনকে লাবাংএ পিস্তল দিয়ে গুলি করেছিলেন। বরাত ভাল স্যার জনের। বেঁচে যান। বিচারে ভবাণীর ফাঁসীর হুকুম হয়।

বিচারক জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তাঁর কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা হয় কিনা।

আমার একমাত্র অনুশোচনা যে ঐ লোকটি ( স্যার জন এণ্ডার্সন ) এখনও জীবিত, উত্তর দিলেন ভবাণীপ্রসাদ ভট্টাচার্য, ঢাকার বাঙ্গাল।

শত শত ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল, সূর্য সেন জন্মেছিলেন এই পুণ্য ভূমিতে; কিন্তু সরকারী ইতিহাস তাদের পরিচিত করেছে সন্ত্রাসবাদী-রূপে। এই নামটি বৈশ্য ইংরাজের দেওয়া। তাঁরা দেশপ্রেমিক নন, তাঁরা সন্ত্রাসবাদী। আর দেশপ্রেমিক হ'লো অহিংসবাদী তকলী-ওয়ালাগণ। এর নাম রাজনীতি।

ইংরাজের দেওয়া এই কালো নাম গান্ধী মেনে নিয়েছিলেন। তারিখটি ঠিক মনে নেই। এণ্ডার্সন বাংলার গভর্ণর, নলিনীরঞ্জন সরকার মন্ত্রী। গান্ধী এলেন বাংলায় রাজবন্দীদের মুক্তির বিষয় আলোচনা করতে। দেখা করলেন এণ্ডার্সনের সাথে। এণ্ডার্সন কথা দিলেন যে বন্দীগণ যদি অঙ্গীকার করেন যে তাঁরা সন্ত্রাসবাদী কার্য আর করবেন না তা' হ'লে তিনি তাঁদের মুক্তি দেবেন।

উল্লসিত গান্ধী ছুটে এলেন লাটভবন থেকে সরকারী গাড়ী চড়ে নলিনীরঞ্জন সহ আলিপুর কারাগারে বন্দীদের কাছে, তাঁদের অঙ্গীকারে অবদ্ধ করতে। ভাবেন নি যে পড়বেন বাঘের মুখে।

তাঁকে প্রশ্ন করলেন বন্দীগণ যে তিনি কি এণ্ডার্সনের কথা নিয়ে এসেছেন যে তাঁদের বিনা বিচারে বন্দী করা হবে না ?

না।

তবে তিনি কেন এসেছেন ? কে তাঁকে আসতে বলেছে ? কেন তিনি প্রতিবাদ করেন নি যখন ওঁদের সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দেওয়া হলো ? ওঁরা কি সন্ত্রাসবাদী না as patriot as he is ?

গান্ধী নিজেকে বললেন নির্দোষ। বন্দীদের সাথে বাক্যালাপের সময়ই তাঁর রক্তের চাপ হয় বৃদ্ধি এবং করলেন বাংলা ত্যাগ।

বাঙ্গালীর ছেলেমেয়ে যারা রাইটার্স ভবনে চাকুরী করেন তারা হয়তো জানেন না বা ভুলে গেছেন যে ঐ অট্টালিকা 'ব্যাপ্‌টাইজ' করেছিলেন কে? মহাকরণের পাপ ধৌত করার ক্ষমতা জর্ডান বা গঙ্গা নদীর বারির ছিল না। পবিত্র করেছেন মহাকরণ তিনটি বাঙ্গাল যুবক, বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত, আগুণ, রক্ত ও মৃত্যু দিয়ে।

মৃত্যু! দীনেশ গুপ্ত ফাঁসীর পূর্বে এক পত্রে তার মাকে লিখেছিলেন।

মৃত্যুটাকে আমরা এত বড় করিয়া দেখি বলিয়াই সে আমাদিগকে ভয় দেখাইতে পারে। এ যেন ছোট ছেলের মিথ্যা জুজুর ভয়। যে মরণকে একদিন সকলেরই বরণ করিয়া লইতে হইবে, সে আমাদের হিসাবের দুদিন আগে আসিল বলিয়াই কি আমাদের বিক্ষোভ, এত চাঞ্চল্য? যে খবর না দিয়া আসিত, সে খবর দিয়া আসিল বলিয়াই কি আমরা তাকে পরম শত্রু মনে করিব…।

এই ইতিহাস নিশ্চয়ই মহাকরণের চাকুরীজীবি সম্প্রদায়ের অনেকেই জানেন না। তা' না হলে ঐ মন্দিরে বসে কি করে করেন তারা এত অবাঙ্গালীসুলভ কার্যকলাপ।

তিনটি যুবকের নেই কোন প্রতিচ্ছবি মহাকরণে। অবশ্য গান্ধীর একটি ছবি আছে যার উপর মাকড়সা জাল বুনছে।

আজ বিনয়-বাদল-দীনেশের গোষ্ঠীর সব সন্ত্রাসবাদী। আর দেশ-প্রেমিক বা patriot হলেন সব অহিংসবাদীগণ। এর নাম রাজনীতি।

'অথচ, সমস্ত ভারত যখন গত শতাব্দীতে সুষুপ্ত, বাংলাদেশ

তখন জাতীয় আন্দোলনের যৌবনের দ্বিতীয় পর্বে প্রবেশ করেছে। ১৯০৫ সালে বাংলাদেশের নিভৃত গ্রামের অশিক্ষিত কৃষকের গৃহেও যেদিন স্বদেশী সঙ্গীতে উচ্চকণ্ঠে মুখরিত হচ্ছিল এবং সূর্যের প্রচণ্ড তেজ ও বহ্নিমান আলোকের ন্যায় যখন বাংলাদেশের হৃদয় দেদীপ্যমান, তখনও ভারতের অন্য রাজ্যগুলি দেশ কাকে বলে জানে না। ভারতীয় জাতির যে ঐতিহ্য ও অস্তিত্ব বাঙ্গালী এক শতাব্দীর সাধনায় উদ্‌ঘাটিত করে এনে নবজাগ্রত ভারতবর্ষের সম্মুখে দেবী মূর্তিতে স্থাপন করেছিল, সে ঐতিহ্য উপলব্ধি এখনও সারা ভারত করতে পারেনি।

'বাংলার ছেলেদের যখন ইংরেজ ফাঁসিতে ঝোলায় জাতীয়তাবাদের অপরাধে, বাংলায় ছেলে মেয়ে যখন ইংরেজকে গুলি করে পটেসিয়াম সাইনাইড খেয়ে জীবন বিসর্জন দেন, যখন বাংলার ছেলে মেয়েদের নিরাপদ আশ্রয় ছিল ইংরেজের কারাগার, তখন ভারতের অন্যান্য প্রদেশগুলিতে জাতীয়বাদের ঐতিহ্যের চিহ্নমাত্র দেখা যায়নি, দুর্ভাগ্য এই যে সেই সব প্রদেশের কাছ থেকে বাংলাদেশকে আজ জাতীয়তাবাদের মেড-ইজি মুখস্ত করতে হচ্চে।'

> তোরা বড় বেশী আদর্শবাদী। মাতৃত্বের ঐতিহ্য ও মহত্ব রক্ষা করে ফাঁসিতে ঝুলেছিস। অহিংস আমলে মেড-ইজি পড়িয়ে তোদের ব্রেণ-ওয়াস্ করা হচ্চে, বললেন গুহকদা।

মাতৃগর্ভের মহত্ব ছিল রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের। মৃত্যুদণ্ড মাথায় নিয়ে তিনি কারাগার থেকে তার মাকে লিখেছিলেন,

> যতদিন 'নিজের' 'নিজের' করিয়া মায়েরা কাঁদিবেন, ততদিন দুঃখ বাড়িবেই, কমিবে না। দুনিয়ায় এত ছেলে মেয়ে আছে, তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে যখন মায়েরা নিজের ছেলের স্বরূপ দেখিতে পাইবেন তখনই তাঁহাদের মাতৃত্ব সার্থক হইবে।

বাঙ্গালীর ছেলের স্বাস্থ্যবান হওয়া ছিল পাপ। সমস্ত ব্যায়ামাগার আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হলো। কিন্তু পাঞ্জাব, সীমান্তপ্রদেশ ও

অন্যান্য রাজ্যের যুবকদের শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি করাবার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করছিল একই ইংরাজ সরকার, কারণ ঐ সব প্রদেশ ইংরাজকে "কামানের খাদ্য" সরবরাহ করতো।

আজও বাঙ্গালী ফিরে পেল না তার স্বাস্থ্য। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি আধুনিক যুবকদের পানে। লম্বায় তারা পাঁচ ফুট চার বা পাঁচ ইঞ্চির উপর প্রায়ই হয় না। জীবনে বোধ হয় বুক ডন কাকে বলে জানে না। সার্থক ইংরাজের রাজনীতি।

১৯৩০ সালে পূর্ব বঙ্গের সহরগুলির খেলার মাঠ মিলিটারী দখল করে নেয়। পূর্ববঙ্গ চলে গেল সামরিক শাসনাধানে। গ্রামে গ্রামে সৈনিকগণ কুচ্‌কাওয়াজ করে ভয় দেখাত।

প্রতি সহরে খোলা হলো মদের দোকান আর সিনেমা গৃহ। বম্বের সিনেমা শিল্পকে করলো উৎসাহিত। বম্বের সিনেমা শিল্পের মত জাতির নৈতিক অবনতি আর কিছুতে করতে পারে নি।

ওরা হলো বেনের জাত। পয়সা ওদের ধর্ম। উপার্জন করতে হবে যে কোন উপায়ে। তারপর কিছু দান করলেই ওরা ভাবে পাপ কেটে যায়। আজকাল অবশ্য দেবমন্দিরে দান করে না। এখন দান করে রাজনৈতিক দলগুলিকে। কারণ পাথরের ভগবান রক্তমাংসের মানুষ হয়ে রাজনৈতিক দলগুলিতে অবস্থান করছেন।

রাজনৈতিক তাণ্ডব সুরু হ'লো আবার ১৯৩৭ সাল থেকে।

নিজ ধর্ম পরিত্যাগ করে সুভাষচন্দ্র জাত দিলেন অহিংসাবাদী গান্ধীর কাছে। গান্ধী তাঁকে করলেন পুরস্কৃত কংগ্রেস সভাপতি পদটি দিয়ে। পরের বছর হলেন অবাধ্য। নির্বাচিত হলেন আবার কংগ্রেস সভাপতি। গান্ধী কাগজে ফতোয়া দিলেন সীতারামায়ার পরাজয় তাঁরই পরাজয়। সুভাষচন্দ্র হলেন বিতাড়িত কংগ্রেস থেকে। এও রাজনীতি।

দৃঢ়তা ছিল সুভাষচন্দ্রের চরিত্রে। অহিংসাবাদী ক্লীবত্ব করলেন

পরিহার। একা চলে গেলেন সমস্ত ইংরাজ গুপ্তচরকে ফাঁকি দিয়ে জার্মাণীতে। তারপর জাপানে। মিলিত হলেন রাসবিহারী বসুর সাথে। ইংরাজ পলায়নে বাহাদুর। জাপানের মারের ভয়ে ভারতীয় সৈন্যদের দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ফেলে পালিয়ে আসে ইংরাজ সমরনায়কগণ।

রাসবিহারী ও সুভাষচন্দ্র সেই সব ভারতীয় সৈনিকদের নিয়ে গঠন করেন জাতীয় বাহিনী। ভারতভূমিতে প্রথম তিনি স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলন করেন। স্থানটি মনিপুর রাজ্য। মাউণ্টব্যাটেন উত্তোলন করবার অনেক পূর্বে।

ভারতবাসী কোনদিন জানবে না যে কি কি কারণে ইংরাজ ছেড়ে গেল ভারত। তার প্রধান কারণ সুভাষচন্দ্র ও তাঁর জাতীয় বাহিনী। ইংরেজ বুঝল যে তার প্রধান সহায় ভারতীয় সৈনিক, কিন্তু তাদের আর তাঁবে রাখা যাবে না।

আবার এলো ১৯৪২ সালের ভারত ছাড় আন্দোলন। হাজার হাজার বাঙ্গালী জ্বালাল আগুন। মেদিনীপুর হলো স্বাধীন। বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী হাজরা কংগ্রেসের পতাকার সম্মান রক্ষার্থে দিলেন প্রাণ। কস্তুরবার মত কিন্তু আগা খাঁ প্রাসাদে স্বামীর শয্যায় তাঁর প্রাণ যায় নি। পতাকাটি হাতে করে ইংরাজের গুলি বিদ্ধ হয়ে মেদিনীপুরের পথের ধূলোয় তাঁর প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। তাই তাঁর নামে খোলা হয়নি কোন 'ফাণ্ড'।

তোদের এই ফাণ্ড শুনলেই আমার মনে হয় মৌলানা আজাদকে, বললেন গুহকদা।

কেন ?

মৌলানা যখন কারাগারে তখন তাঁর স্ত্রী মারা যান। কতিপয় অতি উৎসাহী ব্যক্তি "বেগম আজাদ ফাণ্ড" খুলবার পরিকল্পনা করেন। কারাগার থেকে বেরিয়ে আসতেই তারা দেখা করেন মৌলানার সাথে এবং ব্যক্ত করেন নিজেদের মনোবাসনা। শুনেই তো আরবী ঘোড়া লাফিয়ে উঠলেন। তিনি

আমার স্ত্রী ; দেশবাসীর জন্য তিনি কি করেছেন যে তাঁর নামে ফাণ্ড খুলতে হবে। অতি উৎসাহীদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন।

এবার ইংরাজ মারলো ভাতে। আনলো শস্য শ্যামলা দেশে দুর্ভিক্ষ। ত্রিশ লক্ষ বাঙ্গালী নরনারী মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে অনাহারে দিলেন প্রাণ। নদী একূল ভাঙ্গে, ওকূল গড়ে। ত্রিশ লক্ষ বাঙ্গালী দিল প্রাণ, লাভ করলো কতিপয় ইংরাজ, মুসলমান ও হিন্দু বণিক সরকারের অনুগ্রহে ধান ও চালের ব্যবসা করে।

ইংরাজ অতি সভ্য জাতি। গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। জনগণের দাবী মান্য করে দুর্ভিক্ষের কারণ অনুসন্ধান করবার জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করলেন। সিভিলিয়ান উডহেডকে করা হলো কমিটির সভাপতি। তাঁর তদন্তের রিপোর্টে তিনি লিখেছেন যে ব্যবসায়ীগণ প্রতি শবে অতিরিক্ত মুনাফা করেছে এক হাজার টাকা। এই অতিরিক্ত মুনাফাকারীদের ইংরেজ কোন শাস্তি দেয় নি।

স্বাধীন ভারতও দেয়নি কোন শাস্তি। ১৯৪২ সালের অনেক কংগ্রেস নেতা আজ পশ্চিম বাংলার মন্ত্রী। শবব্যবসায়ীগণ আজও সব রকম সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে সরকার থেকে। এর নাম রাজনীতি।

তাই তো বলি শবব্যবসায়ীদের সাথে সরকারের কেন এত মিতালী ? দুইই এক পথের পথিক। ইংরাজ যখন বলছিল যে গত যুদ্ধে ভারতের বিশেষ ক্ষতি হয়নি তাই ইংল্যাণ্ডের কাছে যুদ্ধকালীন পাওনা ষ্টার্লিংএর পরিমাণ কমানো উচিত। তখন ভারত সরকার জবাব দিলেন যে বাংলা খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং দুর্ভিক্ষে মৃত ত্রিশ লক্ষ শবকে দেখানো হ'লো 'যুদ্ধে ক্ষতি'।

এতো টাকা কি করে উড়ে গেল ?

দিল্লীতে পাঞ্জাবী এক মহিলা দোকানে গিয়ে চাইলেন টাঙ্গী, বললেন গুহকদা।

টাঙ্গী কি ?

আরে বাঙ্গাল ! টাঙ্গী চিনিস্ না ? একপ্রকার ঠোঁটের সিঁদুর ।

ওঃ ।

দোকানী দাম চাইলে ছ' টাকা। 'ছয় টাকা! আমি রিফিউজি। দাম একটু কম করুন', বললেন মহিলা।

রিফিউজী! আমি ভেবেছিলাম আপনি কপুরতলার রাজকুমারী, উত্তর দিল দোকানী। এই সব বিলাসিতার সামগ্রী আমদানী করেছে ভারত প্রায় তিন শত কোটি টাকাব। তারপর নেতা ও কর্মচারীর বিদেশ ভ্রমণের ব্যয়। তারপর লাভ করেছে সেই শ্রেষ্ঠীকুল যারা প্রতি বাঙ্গালীর শবে অতিরিক্ত মুনাফা করেছিল এক হাজার টাকা। ওরা সরকারের অনুমতি নিয়ে আমদানী করেছে নানা যন্ত্রপাতি।

ওরা হলো শাঁখের করাত। দু'দিকেই কাটে, বললেন কুশল।

নেতারা হলেন মন্ত্রী। কত আশা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন দেশবাসী। লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাব মেনে নিল না কংগ্রেস। কিন্তু কেন ? কারণটি বোধহয় আজও অলিখিত। কংগ্রেসানুরক্ত কতিপয় অবাঙ্গালী শ্রেষ্ঠী ও ইংরেজ শিল্পপতিগণ হলেন ভীত। কারণ তারা বুঝলেন যে বাংলা, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা যদি এক জোন হয় তবে তাদের ব্যবসা উঠবে শিকেয়। ইংলণ্ডের কন্‌জারভেটিভ দল কলকাঠি ঘোরালেন, আর ওয়াভেল প্ল্যান বানচাল হয়ে গেল।

জিন্নার মত ব্যক্তি কংগ্রেসে ছিলেন। তিনি কেন কংগ্রেস ত্যাগ করলেন ? কারণ বুঝতে বাঙ্গালীর আজ কষ্ট হয় না।

পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য যদি জিন্নাকে দোষারোপ করা হয়, ততোধিক দোষারোপ করা যেতে পারে অহিংসবাদী নিরামিষ ভোজী কংগ্রেস নেতাদের।

বিহার আসাম ও উড়িষ্যায় কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব, পাঞ্জাবে তিরোয়ানা মন্ত্রীত্ব কংগ্রেসের সহযোগিতায়, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব। তবে ভয় কোথায় ?

ভয় হ'লো টোরী দলের তাই বান্চাল হয়ে গেল ওয়াভেল প্ল্যান, বললেন গুহকদা।

ভগ্ন হৃদয়ে বিদায় নিলেন লর্ড ওয়াভেল। সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী স্ত্রী-সহ এলেন ভাইসরয় হয়ে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন। টোপ ফেল্লেন তিনি ভারত বিভাগের। গিললেন সর্দার পেটেল আর নেহরু। কান টানলে মাথা আসে। যে গান্ধী বলেছিলেন যে তার শবের উপর দিয়ে হবে ভারতবিভাগ, সেই গান্ধীর আশীষ নিয়ে হয়ে গেল ভারতের অঙ্গচ্ছেদ।

প্রস্তাব ছিল যে স্বাধীন বাংলা বা বাংলা-বিভাগ—পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব বাংলা। কংগ্রেস ফতোয়া দিল বাংলা বিভাগের। বাঙ্গালী হিন্দু তাই মেনে নিলেন আনন্দ সহকারে।

এই মেনে নেওয়ার কয়েকদিন পরেই বাঙ্গালী প্রথম আস্বাদ করলেন তাঁদের প্রতি অবাঙ্গালীদের ঘৃণার তাপমাত্রা। আসাম কংগ্রেস ও আসাম সরকারের বাঙ্গালী বিদ্বেষ এত প্রবল যে সিলেট জেলা ওরা দিয়ে দিল পাকিস্থানকে। এই রাজনীতির মূলে ছিল ইংরাজ আর তাদের সহচর আসামের অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীগণ। ইংরাজ বুঝেছিল যে আসামে যদি বাঙ্গালী প্রবেশ করে তবে তাদের চা বাগানের কুলি যাবে বিগড়ে, তেলের কারবারে হবে অশান্তি। "বাঙ্গাল খেদা" দলের নেতা ছিলেন বড়দলুই। তিনি আসামের কংগ্রেস নেতা ও মুখ্যমন্ত্রী। তাই চলে গেল সিলেট পাকিস্থানে। কারণ সিলেটের অধিবাসী সবাই বাঙ্গালী। অথচ বাঙ্গালীর সাথে বিবাদ নেই আসামের পাহাড়ী সম্প্রদায়ের। কারণ ত্ব সম্প্রদায়ই স্বাধীনতাকামী ক্ষাত্র সম্প্রদায়।

১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে ময়মনসিংহ সহরে বাংলার কংগ্রেস নেতাগণ এক কন্ভেন্সনে মিলিত হয়ে পূর্ববঙ্গবাসী হিন্দুদের বিনয় সহকারে অনেক আশার বাণী শোনালেন।

# বিধবা

আশার বাণী! কিন্তু আমি নাম দেব দু' দেশের 'হেট্রেড্',

বললেন গুহকদা।

আশার বাণী কংগ্রেস নেতৃকুল বাঙ্গালদের শোনালেন ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে ময়মনসিংহ সহরে কন্‌ভেন্‌সন্ করে। সুরেন ঘোষ সভাপতি, কালীপদ মুখার্জি সচিব। বাঙ্গালদের আশার বাণী শুনিয়ে বলা হলো যে তারা যেন দেশ না পরিত্যাগ করেন। তাদের উপর কোন অত্যাচার হলে ভারত সরকার তার প্রতিবিধান করবেন। বাংলার কংগ্রেস একই থাকবে। বোঝান হলো যে এ বিভাগ শুধু প্রশাসনিক বিভাগ।

রাজনৈতিক নেতাগণ বোধহয় কখনও সত্যি কথা বলেন না। কিন্তু সেই কন্‌ভেন্‌সনে একজন নেতা সত্যি কথা বলেছিলেন। তিনি ৺জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী। তিনি বলেছিলেন, যদিও আমার বাড়ী ময়মনসিংহে, এখানকার জেলা কংগ্রেস থেকেই আমি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভ্য নির্বাচিত হয়েছি, কিন্তু আমি এখানে থাক্‌বো না, তাই কাউকে আমি থাকবার উপদেশ দেব না।

এই সত্য ভাষণ যদি পূর্ববঙ্গীয় হিন্দুগণ তখন বিশ্বাস করতে পারতেন তবে তারাঅনেকেই আরও অধিক অর্থ নিয়ে ভারতে আসতে পারতেন, কারণ তখন বাঙ্গালী মুসলমানদের হাতে অর্থ ছিল এবং হিন্দুর সম্পত্তি তারা ন্যায্য মুল্য দিয়ে ক্রয় করতে প্রস্তুত ছিলেন।

সুরেন ঘোষ ও অন্যান্য নেতাগণ কেউই দেশ বিভাগের তাৎপর্য্য তখন বোঝেন নি। কিন্তু নেতাগিরির দম্ভ ছিল এদের। সেই দম্ভেই দগ্ধ হয়েছেন নিজেরা, আর দগ্ধ হচ্চে লক্ষ লক্ষ পূর্ববঙ্গবাসী হিন্দু।

আমার এক বন্ধু এই নেতাদের আচরণ ব্যাখ্যা করে আখ্যা দিয়েছিলেন "বিধবা"। তখন কুপিত হয়েছিলুম। আজ মনে হয় এঁরা তো বিধবা বটেই, কিন্তু যুবতী নন্, অতি বৃদ্ধা।

## বি. পি. সি. সি-র. অন্তর্জাল

যেদিন পূর্ববঙ্গীয় হিন্দুগণ ময়মনসিংহের অমরাবতী সভাকক্ষে বসে কংগ্রেস নেতাদের শ্রীমুখ থেকে আশার বাণী শুনছিলেন, সেই দিনই বর্ধমান জেলার কোন এক স্থানে, পশ্চিমবাংলার "ছায়া মন্ত্রীসভার" নেতা, পূর্ববঙ্গে যার বাড়ী এবং বাংলার খাদি দলের নেতা এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য প্রফুল্ল ঘোষের নেতৃত্বে আর একটি কনভেনসন হচ্ছিল। সেই সভায় প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে এখনই ভাগ করা হোক। এরাও কিন্তু কংগ্রেসের নেতা।

অদ্ভুত এই বাংলার খাদিদল। কোনদিনই এঁরা বাংলার রাজনীতিতে সম্মুখে আসতে পারেন নি। সুভাষচন্দ্রের দ্বিতীয় নির্বাচনের সময় বাংলা থেকে কেবল এঁরাই তাঁর বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন। এদের কর্মক্ষেত্র ছিল নিজেদের কয়েকজনের ভেতর সীমাবদ্ধ। কিন্তু তবুও প্রফুল্ল ঘোষ কি করে পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হলেন? এও রাজনীতি।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি স্থির করেন যে কিরণশঙ্কর যখন পাকিস্থানে থাকবেন তখন সুরেন ঘোষকে পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী করা হবে। এবং মৌলানা আজাদ কোলকাতায় এসে এ নির্বাচন করাবেন।

কৃপালনী তখন কংগ্রেস সভাপতি। তিনি বললেন যে তিনিই যাচ্ছেন কোলকাতায় তখন আর মৌলানার যাবার দরকার নেই। তিনি নির্বাচন পর্ব সমাধা করে আসবেন। তাঁর কথা সবাই মেনে নিলেন। কৃপালনী প্রফুল্ল ঘোষের বন্ধু।

কৃপালনী তাঁর বঙ্গীয় ভার্য্যা সহ অতিথি হলেন সুরেন ঘোষের।

তিনি স্বামীর নির্দেশ অনুযায়ী কংগ্রেস এম, এল, এ ডাক্তারদের বাড়ী ঘুরতে লাগলেন বন্ধুবর প্রফুল্ল ঘোষকে মুখ্যমন্ত্রী করবার জন্য। রাত্রিবাস ও আহার অবশ্য সুরেন ঘোষের বাড়ীতেই হ'তো।

আমি প্রসংশা করি সুরেন ঘোষকে তাঁর উদারতা ও নির্লোভতার জন্য। তিনি নিজ অতিথির সব আচরণ জেনেও তাঁকে বাধা দেন নি বা গান্ধীর কাছে নালিশ করেননি। তাঁর মহত্ত্বকে সম্মান করি। প্রফুল্ল ঘোষ মুখ্যমন্ত্রী হলেন। কৃপালনী রিপোর্ট দিলেন যে সুরেন ঘোষ মুখ্যমন্ত্রী হ'তে রাজী হলেন না।

যুগান্তর দল কিন্তু কৃপালনীর কাছে কৃতজ্ঞ। তিনি সুরেন ঘোষকে ল্যাং দিতে গিয়ে ল্যাং দিলেন নিজ সুহৃদকে আর খাদি দলকে, আর বাঁচিয়ে দিলেন যুগান্তর দলের গৌরব ও ঐতিহ্য। আর বাঁচিয়েছেন যুগান্তর দলের সবাইকে কিরণদার প্রহার থেকে।

সুচেতা কৃপালনী কিন্তু আদর্শ বাঙ্গালী মহিলা। বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য যে তিনি বাঙ্গালী উদ্বাস্তুর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন নি। তিনি দায়িত্ব নিয়েছিলেন পাঞ্জাবী উদ্বাস্তুর।
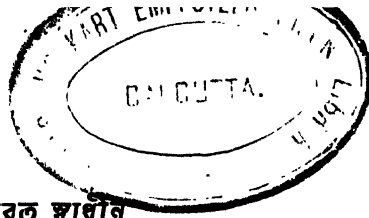
## ভারত স্বাধীন

বাবু, আপনে নাকি ছ্যাশ ছাইড়া যাইবেন? সজল নয়নে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন হবিবর। সামান্য মাঝি ছিলেন হবিবর রহমান। পদ্মা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, ধলেশ্বরী, মেঘনা নদী দিতেন ওরা পাড়ি নানা বিপণি নিয়ে। ব্যবসা সূত্রে আমার পরিচয় হয় ওদের সাথে এবং হৃদ্যতা জন্মে। ১৯৪৭ সালের পূজার পূর্বে হবিবর রহমান, মাণিকগঞ্জ মহকুমার দরগ্রামের অধিবাসী সজল নয়নে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে আমি নাকি দেশ ছেড়ে যাব। ব্যাথাতুর হয়েছিলেন সবাই আমার দেশ ত্যাগ করবার কথা শুনে। যেদিন চলে আসি সেদিন ওরা সবাই কেঁদেছিলেন। ওরাও ভাবেন নি আমিও ভাবিনি যে আর ফিরে যাব না। তাই আমি জবাব দিয়েছিলুম যে পূজোর আগেই ফিরবো।

পূর্বদিন জন্ম হয়েছে পাকিস্তানের, পর দিবস স্বাধীন ভারতের। হিন্দু মুসলমান সকলেরই আনন্দের দিন, তবু কেন আমাদের ব্যথাতুর হৃদয়?

আশা ছিল পূজোর পূর্বেই দেশে ফিরে যাব। আমাদের গ্রামের বাড়ীতে চৌদ্দ পুরুষের আমল থেকে হয় দুর্গা পূজা। দুর্গোৎসবে যোগদান করতেন সমস্ত হিন্দু মুসলমান। সেদিনও তো, ১৯৪৫ সালে আমিনুল হক্ ছিলেন অসামরিক সরবরাহ বিভাগের মহকুমা অধিকর্তা, পূজার বিবিধ সামগ্রী কিনবার জন্যে কত উৎসাহ করে পারমিট দিয়েছিলেন। তাঁর উৎসাহ দেখে মনে হয়েছিল যেন তাঁর গৃহেই পূজো।

তোরা করবি পূজা, আর পয়সা খরচ আমাদের, বলেছিলেন সত্থু মুন্সি।

কি রকম?

তোরা পরবি নতুন জামা কাপড় পুজোর সময় তাই আমাদেরও কিনতে হয়।

না কিনলেই পারিস্।

তোর যেমন বুদ্ধি! সামান্য কয়েকটা জামা কাপড়ের জন্য গৃহের ভেতরই বুঝি পাকিস্তান হিন্দুস্থান করবো?

পাকিস্তান আর হিন্দুস্থান, সত্থ মুন্সির উক্তি। সত্থরুদ্দিন মুন্সি ছিলেন নারায়ণগঞ্জের অসামরিক সরবরাহ দপ্তরের হিসাবরক্ষক। কার্যোপলক্ষে যেতে হ'তো ওঁর দপ্তরে। সত্থ ওর ডাক নাম। বাড়ী ছিল ঢাকা সহরে। রেল পথে প্রত্যহ যাতায়াত করতেন।

১৯৪৬ সাল। প্রায় সারাটা বছরেই ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লেগে ছিল। তবুও যেতে হতো নারায়ণগঞ্জে সত্থর দপ্তরে। নারায়ণগঞ্জে সারাদিন তুজনে একসাথে থাকতুম একসাথে খেতুম। ঢাকা স্টেশনে নেমেই সত্থ বলতেন, এবার আমি যাই পাকিস্তানে, তুই যা হিন্দুস্থানে। সত্থ ষ্টেশন থেকে সোজা বেরিয়ে যেতেন, আর আমি রেল লাইন পার হয়ে রমনা দিয়ে বাড়ী ফিরতুম।

'পালে সত্যিই বাঘ পড়িল', ১৫ আগষ্ট ১৯৪৭ সাল। ভারত হলো স্বাধীন। বাংলা হলো বিভক্ত। মাউণ্টব্যাটেন গভর্ণর জেনারেল, নেহেরু প্রধান মন্ত্রী। প্রফুল্ল ঘোষ পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। সুরেন ঘোষ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি, কালীপদ মুখার্জী সচিব। অরুণ গুহ, সতীশ সামন্ত, ভূপতি মজুমদার, অমর ঘোষ সব উপনেতা। কিরণ শঙ্কর রায়, মনোরঞ্জন গুপ্ত, ভূপেন দত্ত পাকিস্তানকেই বেছে নিলেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, নলিনী সরকার তখন রাজনীতিতে অস্পৃশ্য। ডাঃ রায় ও নলিনীরঞ্জন গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হবার জন্য কংগ্রেস মনোনয়ন প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের মনোনয়ন দেওয়া হয়নি।

ওদের মেরেছিল লেকিনে, বললেন গুহকদা।

লেকিন আবার কি ?

লেকিন্ জানিস্ না ? তবে শোন্। এক কংগ্রেস কর্মী পেলেন না মনোনয়ন, গেলেন মৌলানা আজাদের কাছে দরবার করতে। মৌলানা বললেন যে তাঁর মত উচ্চ শিক্ষিত, বাগ্মী ব্যক্তিকে নিশ্চয়ই মনোনয়ন দেওয়া উচিত লেকিন্.................। আর শুনে কাজ নেই। লেকিনের মার খেয়ে কর্মীটির কোলকাতায় প্রত্যাবর্তন বিরস বদনে।

## তীর্থযাত্রা হ'লো সুরু

পাঞ্জাব ও সারা ভারত থেকে সরকারী সব উর্দুভাষী মুসলমান কর্মচারী এসে দখল করলো পূর্ব বাঙলার মসনদ। রাতারাতি পেয়ে গেল সবাই প্রমোশন। বাঙ্গালী মুসলমান দেখলেই ওরা নাক সিটকায় কারণ ওরা হরিজন। আর দম্ভভরে চলে পথ, যেন সব ক্ষুদে বাদশা। হবিবর ও সত্তর বরাতে হ'লো শুধু মনিব বদল।

বাংলার সরকারী কর্মচারী সবাই প্রায় ছিলেন বাঙ্গালী হিন্দু। ইংরাজ বা অবাঙ্গালী মুসলমান উচ্চ পদে ছিল মাত্র কয়েকজন। সরকারী কর্মচারীদের অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হ'লো ভারত বা পাকিস্তানের ভেতর একটিকে বেছে নেবার।

হিন্দু প্রায় সমস্ত কর্মচারীই বেছে নিলেন ভারত, আর প্রায় সমস্ত মুসলমান কর্মচারী বেছে নিলেন পাকিস্তান। কিন্তু কতিপয় উদারচেতা বাঙ্গালী মুসলমান সরকারী কর্মচারী কিন্তু পাকিস্তান বেছে নেননি যদিও তাদের বাড়ী ছিল পূর্ববঙ্গে। জিন্নার চেলারা তাদের ভয় দেখিয়েও টলাতে পারেনি। তাঁরা বুঝেছিলেন যে পূর্ব পাকিস্তানে রাজত্ব হবে উর্দুভাষী মুসলমানের, বাঙ্গালীর নয়।

একজন ছিলেন মাত্র বাঙ্গালী মুসলমান আই, সি, এস। তিনি রয়ে গেলেন ভারতে। আর একজন আই, পি। বাংলার ব্যাঘ্র ফজলুল হকের জামাতা এবং ভাগিনেয় দুজনেই রয়ে গেলেন পশ্চিমবঙ্গে।

স্বাধীন ভারত ও পাকিস্তান স্থাপনের সাথে সাথেই সরকারী কর্মচারীদের এপার ওপার চলা সুরু হলো। জনগণের মতই সরকারী কর্মচারীরাও ঠিক বোঝেন নি কি রূপ হবে স্বাধীন ভারতের বা পাকিস্তানের। তারাও অনেকটা খেলার ছলেই সই দিয়েছিলেন 'অপ্‌সন্‌ ফর্মে'।

আমি তখনও আমার দেশে। সিভিল সাপ্লাই বিভাগে

একাউণ্টটেণ্ট হয়ে এলেন বাঁকুড়া থেকে এক মুসলমান কর্মচারী। আসবার ছুদিন পর আমার সাথে তার হয় পরিচয়। তিনি কাঁদ কাঁদ ভাবে আমায় বললেন, মশাই, কি দেশেই এলুম? না বুঝি কথা, না পারি রান্না খেতে। করুণ কণ্ঠে আবার বললেন, আসবার আগের রাতেও আমি সপরিবারে একসাথে বসে দই খেয়ে এসেছি।

পরিবার সঙ্গে আনেন নি?

ক্ষেপেছেন আপনি? এখানে আন্‌বো পরিবার! আমি ফিরে যাব আবার বাঁকুড়াতে।

অবোধ শিশু! রাজনীতির প্যাঁচ জানে না। বোঝে নাই যে অজান্‌তে কি চরম পত্রে সই দিয়ে ফেরার পথ করেছে বন্ধ।

কয়েক লক্ষ সরকারী কর্মচারী ওয়ারিশ সূত্রে পেল স্বাধীন ভারত। যাযাবরের ভাষায় এরা ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাল ছাত্র। স্বাদেশীকতার নাম গন্ধ এদের ভেতর ছিল না, আর ছিল বাপ বা মামা বা শ্বশুরের রাজ দরবারে আধিপত্য। আর ছিল না এদের চরিত্র। অবশ্য এদের ভেতর অনেক মহৎ ব্যক্তি ছিলেন বা এখনও আছেন। সেটা হ'লো নিয়মের ব্যতিক্রম।

সরকারী কর্মচারীর রাজনীতি অতি বিচিত্র। আজ যারা নানা মন্ত্রণালয়ের সচিব, বৃটিশ আমলে তাদের সবচেয়ে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ছিল জেলাশাসক হয়ে অবসর নেওয়া। ক্ষমতা কেউ ইচ্ছা করে ছাড়্‌তে চায় না। তাই নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখবার জন্য তারা বৃটিশ আমলের যত প্রশাসনিক নিয়ম কানুন ছিল সেইগুলি বলবৎ রাখলেন। কারণ সেইগুলি আমলাতন্ত্রকে দেয় প্রাধান্য।

কেন পেল সরকারী কর্মচারীরা প্রাধান্য? কারণ যারা মন্ত্রী হলেন তাঁদের কেউই রক্তস্নাত বিপ্লবের পথে ক্ষমতায় আসেন নি বা রক্ত-পাতের কথা শুনলেই তাঁদের হতো মূর্চ্ছা! মূর্চ্ছা হবার ভয়ে তাঁরা ভুলে গেলেন তাঁদের শক্তির উৎস। তাঁরা ভুলে গেলেন যে জনগণ

তাঁদের বসিয়েছে গদীতে, এবং জনগণের কল্যাণের জন্য তাঁরা ইচ্ছা করলে বৃটিশ রচিত আইন নাকচ করতে পারেন। তার পরিবর্তে আশ্রয় নিয়েছেন পুলিশ প্রহরীর।

জামসেদপুরের কেদার দাসের দল খুব জোরদার হয়েছে। সভা হচ্চে। দাঁড়ালুম। আলাপ জমালুম এক বিহারী শ্রমিকের সাথে। তার লম্বা বুলি শোনার পর জিজ্ঞাসা করলুম যে যদি শ্রীবাবু ( শ্রীকৃষ্ণ সিং ) এসে তাদের সাথে বসে আলাপ আলোচনা করে সব ঠিক করে দেন তবে তাদের আপত্তি আছে কিনা ?

আরে, বাবু ! শ্রীবাবু যদি এসে একবার ডাক দিয়ে কথা বলে তবেই তো সব মিটে যায়। মন্ত্রী হবার আগে আমরা তো তার কাছেই সব বিষয়ে ছুটে যেতুম। কিন্তু তা তো আর হবে না ! তিনি তো এখন মন্ত্রী, দুঃখ করে শ্রমিকটি আমায় বললেন।

ওদের কেউ লোহা আর রক্ত দিয়ে শুদ্ধি করেনি তাই দেশের দুর্দশা, বললেন গুহকদা।

রাজনীতিতে উত্থান ও পতন কখন যে কার হয় বলা দায়। আমার এক বন্ধুর মামা প্রথম পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী ছিলেন। মামাটি অবিবাহিত আর পেশা ছিল রাজনীতি। তার স্থায়ী বাসস্থান হলো আমার বন্ধুর ভাড়াটে বাড়ী। মন্ত্রী হবার কয়েকমাস পরে মামা বললেন ভাগ্নেকে বড় বাড়ী ভাড়া করতে। ভাগ্নে বললেন, মামা তোমাদের ভোটে চাকুরী। তার উপর ভরসা করে কি বড় বাড়ী ভাড়া নেওয়া যায় ?

প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে সর্ব স্থানে পূর্ববঙ্গীয় হিন্দুগণের প্রাধান্য ছিল। কথায় বলে, কাক যেখানে বিক্রমপুরের লোকও সেখানে। বাংলার রাজনীতিতে পূর্ববঙ্গীয়দের প্রাধান্য ছিল সর্বাধিক। পূর্ববঙ্গের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ও জলবায়ু এর কারণ।

প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করে জবহরলাল নেহেরু যেদিন দিল্লীর

মসনদে বসলেন, সেদিন একটু অবাক হয়েছিলুম। বিনা রক্তপাতে, বিনা ত্যাগে দেশ কখনও স্বাধীন হয়? প্রকৃতি তার পাওনা আদায় করবেই।

হিন্দু সরকারী কর্মচারী যদিও প্রায় সবাই ভারতে চলে আসেন, তবুও রাজনৈতিক নেতাগণ হিন্দু মুসলমান "ভাই ভাই" করছিলেন আর কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের পতাকা নিয়ে শোভাযাত্রা করছিলেন। এমন সময় কুপিত হলেন জিন্না। করলেন আক্রমণ কাশ্মীর। ভূস্বর্গ কাশ্মীর। রক্তপাতের দ্বিতীয় পর্ব।

বৈশ্যের হাতে শাসন। তার পরিণাম?

"আর মাত্র সাতদিন সময় পেলে আমরা পাকিস্তানীদের কাশ্মীর ছাড়া করতুম," বলেছিলেন আমাকে ভারতীয় বাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। তিনি কাশ্মীর যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

কেন পারলেন না?

ক্রোধান্বিত হলেন সৈনিক। জবাব দিলেন, পলেটিসিয়ানদের জন্য হলো না। এত দুঃখ, কষ্ট, রক্তপাতের পর জয় যখন করায়ত্ত তখন পলেটিসিয়ানগণ দিলেন যুদ্ধ বন্ধ করে। এই যদি ওদের ইচ্ছা ছিল তবে রক্তপাতের আগেই কেন কাশ্মীর ছেড়ে দিলে না।

পলেটিসিয়ানগণ সুরু করলেন পলায়ন—কাশ্মীর আক্রমণের সাথে সাথেই।

জিন্না বদ্ধপরিকর হলেন পূর্ব বাংলায় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মিলিত পতাকার শোভাযাত্রা বন্ধ করতে। তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে হিন্দুর জমি, জরু ও গরুর জন্য হয়েছে পাকিস্তান।

প্রকৃতি তার দাবী আদায় করতে আরম্ভ করলো। পাকিস্তানের ইজ্জৎহীন অন্নের চেয়ে ভারতে অনাহারে মৃত্যু শ্রেয়, তাই তীর্থ যাত্রা সুরু করলেন ধনীগণ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী। প্রত্যেক পরিবার সঙ্গে

আনলেন স্বর্ণ, রৌপ্য ও নগদ অর্থ। ঢাকার বসাক, সাহা ও তিলি সম্প্রদায়ের লোকগণ এক শত কোটি টাকার অধিক মূল্যের সোনা, রূপা ও হীরা জহরৎ নিয়ে আসেন ভারতে।

তীর্থে তো পৌঁছলুম। গুহকদা বললেন, এসেছিস্ যখন থাক্। আপন ধন পরকে দিয়ে বৈরাগী মরেন কাঁথা বয়ে। বাঙ্গালীর সেই অবস্থা। তোদের খুব অসুবিধা হবে কিন্তু।

কেন ?

আমাদের নারায়ণ বড়ই স্ত্রৈণ। লক্ষ্মী ছাড়া থাকতেই পারেন না।

হেঁয়ালি ছেড়ে একটু বুঝিয়ে বলুন।

আরে লক্ষ্মী হলেন চাল তাঁর সাথে নারায়ণ শিলা, অর্থাৎ কাঁকর সর্বদাই থাকেন। তোদের নারায়ণহীন বাকৃতুলসী, বিড়ই বা বালাম এখানে নেই।

তখন গুহকদার কথায় হেসেছি। আজ বুঝেছি তার কথার প্রকৃত অর্থ।

# ভূমিহীন মহারাজ

পশ্চিমবাংলায় প্রফুল্ল ঘোষের মন্ত্রীত্ব, আর সুরেন ঘোষের কংগ্রেস সভাপতিত্ব।

প্রফুল্ল ঘোষের বাস্তব দৃষ্টির অভাব ছিল। তিনি চাইলেন যে পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দুরা না আসুক। দুই বঙ্গে অবাধ চলাফেরা এবং ব্যবসা বাণিজ্য বজায় থাক। তিনি দিল্লীতে জানালেন যে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু সমস্যা নেই। তিনি করলেন প্রথম ভুলটি, আর সে ভুল মারাত্মক রকমের, যার জের আজও বাঙ্গালী টান্‌ছে।

আর সুরেন ঘোষ! মহাশয় ব্যক্তি। তিনি বি, পি, সি, সি,তে একটি পুনর্বাসন সাব-কমিটি করে নিজ দায়িত্ব সম্পন্ন করলেন। থাকতেন তিনি তিন তলার উপর। রোজ ভীর করে এক তলায় তাঁরই দেশের লোক। কিন্তু একটি সহানুভুতির বাণীও তারা শুনতে পায় না তাদের প্রিয় মধুদার কাছ থেকে। তিনি নতুন গণ্ডী তৈরী করবার জন্য পশ্চিমবঙ্গীয় সমাজে ঘোরেন যারা মধুদার দেশের লোকদের বলেন "বাঙ্গাল", আর তিনি করেন ছুটোছুটি দিল্লীতে। পরিণত করলেন নিজেকে ভূমিহীন মহারাজে।

সুভাষ বসুর পর সুরেন ঘোষের মত সম্মান আর কোন নেতা বাংলাদেশে পান নি।

গান্ধী যেমন আর্তের সেবার জন্য নিজ কর্মক্ষেত্র বেছে নিয়েছিলেন নোয়াখালীতে, সুরেন ঘোষেরও তখন কর্মক্ষেত্র ছিল বানপুর ও শিয়ালদহ ষ্টেশন। কিন্তু তিনি তা' করেন নি।

ইতিহাস বলবে যে পূর্ববঙ্গীয় হিন্দুদের আজ যত দুঃখ ও দুর্দশা, তার জন্য সুরেন ঘোষ ও তার সহকর্মীগণ প্রধানত দায়ী।

তোর তরজমায় ভুল হলো। মধুদা আদর্শবাদী কিন্তু বাস্তববাদী নন্‌। সাংসারিক অভিজ্ঞতাহীন। কিরকম জানিস্‌?

এলেন তো জেল থেকে ১৯৩৮ সালে। বললেন যে তাঁকে আবার জেলে যেতে হবে দু' বা তিন বছরের মধ্যে,তার পুর্বে তিনি তিনটি জিনিস দেখে যাবেন। আমি জিজ্ঞাসা করলুম কি কি ?

শিশির ভাদুড়ির থিয়েটার, উদয় শঙ্করের নাচ ও এক বিখ্যাত গায়িকার গান, দাদা বললেন।

শিশিরবাবু তখন থিয়েটার করেন না। উত্তর কোলকাতার কোন এক প্রেক্ষাগৃহে, বোধহয় 'উত্তরা', শিশিরবাবুর 'চাণক্য' ছবি প্রদর্শিত হচ্ছিল। নিয়ে গেলুম দাদাকে। তিনি দেখে বললেন ঠিক বোঝা যায় না। আমি বললুম গিরিজাবাবুর সাথে শিশির-বাবুর খুব ভাব আছে তিনি আপনাকে তার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন। গিরিজাবাবু পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন এবং শিশিরবাবু দাদার জন্য দু' দিন অভিনয় করেছিলেন।

গিরিজাবাবু কে ?

আরে মুর্খ! গিরিজাবাবু আবার ক'জন হয় ? গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী। দেশবন্ধু বলেছিলেন যে আমার জীবনী একমাত্র গিরিজা লিখ্‌তে পারে। এ হলো সেই গিরিজাবাবু, টাঙ্গাইলের বাঙ্গাল।

তারপর উদয়শঙ্কর আর সেই গায়িকার কি হ'লো ?

উদয়শঙ্কর তারপর কোলকাতায় এসে ম্যাডান থিয়েটারে নেচেছিলেন। গিরিজাবাবু দাদাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। শঙ্করের 'জীবন' কি অন্য একটি নাচ দেখে দাদা সমালোচনা করেছিলেন। গিরিজাবাবু সেই কথা শঙ্করকে বলেন। শঙ্কর দাদাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে তার সমালোচনা শুনে তার নাচ পরিবর্তন করেছিলেন। দাদা একদিন বলেছিলেন যে গান্ধীকে দেখ্‌তে যে রকম লোক হয় শঙ্করকে দেখবার জন্যও সেই রকম সমাগম হওয়া উচিত।

গায়িকার গান ?

সেই খানেই তো আমি আর দাদা দু'জনেই চোট খেলুম।

চোট খেলেন?

আমি খেলুম দাদার কাছে আর দাদা খেলেন তার আদর্শের কাছে।

কি রকম?

আমি দাদাকে একদিন বললুম ঐ গায়িকার গান আপনার শোনা হবে না, কারণ তিনি থাকেন অভদ্র পল্লীতে। যেই না বলা অমনি দাদা মারেন আর কি এক থাপ্পর!

তোমরা কোন মেয়েমানুষকে ভাল ভাবতে পার না। যার এমন ঈশ্বরদত্ত কণ্ঠস্বর সে কি কখনও খারাপ হতে পারে?

কোথায় শুনেছেন তার গান?

জেলে, গ্রামফোন রেকর্ডে।

কতিপয় দিবস পর দাদা একদিন খুব বিষণ্ণ মনে তার ঘরে বসে আছেন, আমি যেতেই বললেন, তোমার কথাই ঠিক। গিরিজাবাবুও তাই বললেন যে তার গান আমার শোনা হবে না। আচ্ছা, বলতে পার যার এমন স্বর্গীয় কণ্ঠস্বর সে কি করে খারাপ হতে পারে? নিশ্চয়ই ভগবান তাকে উদ্ধার করবেন, বললেন দাদা।

## কিরণশঙ্কর ও ডাঃ রায়

ডেমোক্রেটিক দেশে আইনজীবিরাই সাধারণত হন সাফল্যমণ্ডিত নেতা। যেমন দেশবন্ধু, দেশপ্রিয়, শ্যামাপ্রসাদ, কিরণশঙ্কর। কিরণশঙ্কর ছিলেন যুগান্তর দলের মাথা বা বুদ্ধি। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীত্ব তাকে প্রলুব্ধ করতে পারলো না। দেশ ছিল তাঁর মানিকগঞ্জ মহকুমার তেওথা গ্রামে। তিনি বেছে নিলেন পাকিস্তান, হলেন পাকিস্তানের বিরোধী দলের নেতা। থাকেন তিনি তাঁর কোলকাতার বাড়িতে।

নেতা তিনি। নিত্য তিনি পান পাকিস্তানের নাড়ীর খবর। চঞ্চল হয়ে উঠলো তার মন। দেশ বিভাগের সর্বনাশ তিনি টের পেলেন। তিনি একমাত্র বাংলার নেতা যিনি বাধা দিয়েছিলেন দেশ বিভাগের। তিনি খবর পেলেন জিন্নার প্ল্যান পূর্ববঙ্গ নিয়ে। ঘৃণিত "কাফের" আর হরিজন মুসলমানের বাস পূর্ববঙ্গে, জিন্না বদ্ধপরিকর হলেন কাফের আর হরিজনের মিতালী ভাঙ্গবার জন্য।

কিরণশঙ্কর বুঝেছিলেন যে হিন্দুরা আর পূর্ববঙ্গে থাকতে পারবেন না। ভারতে এসে তারা যেন অসহায় না হন তাই তিনি পশ্চিম বাংলার রাজনীতিতে কলকাঠি নাড়তে লাগলেন। একটু নাড়তেই প্রফুল্ল ঘোষের পতন। এবং ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের শুদ্ধি।

কিরণশঙ্করকে বাধ্য করা হয় ডাঃ রায়ের মন্ত্রীসভাতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হয়ে যোগদান করতে। পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা পেল আশা, তার থিয়েটার রোডের বাড়ী হলো যুগান্তর দলের প্রধান ঘাঁটি।

অহল্যারও মুক্তি হয়, কিন্তু মুক্তি নেই পূর্ববঙ্গ থেকে আগত হিন্দুদের। তাই সুরেন ঘোষ ক্ষেপে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী হবার জন্য। আর অমর ঘোষ অর্থমন্ত্রী হবার জন্যে। ওরা আনলেন ডাঃ রায়ের মন্ত্রী সভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব। যুগান্তরের কর্মীরা হলেন বিভ্রান্ত।

খাদি দল ভাগ হয়ে প্রফুল্ল সেন যোগ দিলেন ডাঃ রায় ও

কিরণশঙ্করের সাথে। অনাস্থা প্রস্তাব আর শেষ পর্যন্ত ভোটে দেওয়া হলো না। অনাস্থা প্রস্তাবে ডাঃ রায়ের মন বিষিয়ে যায়। কারণ মধু ঘোষ ছিলেন তাঁর আজীবন সঙ্গী। অনেক সাহায্য পেয়েছে যুগান্তরের কর্মীরা ডাঃ রায়ের কাছ থেকে।

বিধবা হলো বাংলার সমস্ত বিপ্লবী কিরণশঙ্করের মৃত্যুতে। তার মৃত্যুতে দেশবন্ধু ধারার হলো শেষ। ডাঃ রায়ের প্রধান সহকর্মীর স্থান হলো শূন্য এবং পশ্চিম বাংলার রাজনীতিতে অন্যতম মুখ্য ভূমিকায় প্রবেশ করেন শ্রীপ্রফুল্ল সেন। ডাঃ রায় তাকে বেছে নিলেন সহযোগী করে। তবু কিন্তু তিনি আশা পোষণ করতেন যে, মধু ঘোষ ঢুকবে কিরণশঙ্করের স্থানে তাঁর মন্ত্রী সভাতে। তাঁর ইচ্ছা হলো না পূরণ, কারণ রাজনীত।

ইতিহাস সৃষ্টি করলেন ডাঃ রায় ১৯৫০ সালে। বিহারী মুসলমান আর তাদের বুদ্ধিদাতা ও অর্থদাতা বোরা, খোজা জাতীয় বেনিয়া মুসলমানগণ ভাবলেন যে পূর্ববঙ্গের তারা হলেন বাদশা।

বাঙ্গালী মুসলমান হলো হরিজন, এদের উপর ওরা করবে রাজত্ব, কিন্তু কাফেরদের না তাড়ালে রাজত্ব নিরঙ্কুশ হয় না।

দয়াবান ভারত সরকার। তাই বাস্তু ত্যাগ করতে হয়নি কোন বিহারী বা বেনিয়া শ্রেণী মুসলমানের। হিন্দুর জমি, জরু ও গরুর লোভে ওরা গেল পূর্ববংগে।

করিম আর রহিম দুই ভাই। করিম গেল পূর্ববংগে, লাভবান হবার আশায়। রহিম রয়ে গেল বিহারে। পরিবারের সমস্ত সম্পত্তি রক্ষনাবেক্ষণের জন্য করিম একবার আসে ভারতে আর যায় পাকিস্থানে। দু'রাজ্যের সম্পত্তিই উপভোগ করে।

ভারত সরকারের ট্রেড জার্নাল খুললে দেখতে পাওয়া যায় বহু মুসলমান ব্যবসায়ী আজও আমদানী ও রপ্তানীর লাইসেন্স পায়। অথচ রহিম ও করিমের মতই তারা দু'রাজ্যের মজা লুটছে।

বনলতার স্বামী পেল না একটি পয়সা তার জমি ও বাড়ীর মূল্য

বাবদ। ময়মনসিংহের মুসলমানদের বরদলুই দিয়েছেন কোল। তারা দেখলো ভারি মজা। কারণ তাদের পরিবারের অর্ধেক থাকে আসাম আর অর্ধেক ময়মনসিংহে।

এ হেন মুসলমানেরা বনলতার স্বামীর জমি দখল করলো ১৯৫০ সালে। বনলতার স্বামীর গ্রামবাসীই তারা। থানায় গিয়ে নালিশ করলো। দারোগা তাকে দেখিয়ে দিল ভারত।

দখলকারীগণ সাফ কওলা করে কিনে নিলো বনলতার স্বামীর জমি। তার পরিবর্তে তারা দেবে তাদের আসামের জমি। বনলতার স্বামী গেল আসামে সপরিবারে। কিন্তু জমি তাকে আর দিল না। নালিশ সে করতে গেল, তাকে দেখিয়ে দেওয়া হলো সেকিউ-ল্যারইম্। পথের ফকির হলো বনলতার স্বামী। ধন্য নেহেরু—লিয়াকৎ প্যাক্ট।

এ হেন লুণ্ঠনকারীগণ ১৯৫০ সালে কাফের নিধন যজ্ঞ করলো পূর্ববঙ্গে। কেঁদে উঠলো ডাঃ রায়ের হৃদয় আর্তের ক্রন্দনে। আন্তর্জাতিক কোনরূপ বাধা না মেনে তিনি পাঠালেন পূর্ববঙ্গে ষ্টিমার। উদ্ধার করে আনলেন লক্ষ লক্ষ হিন্দু।

তিনি মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেই রাজ্য সরকারের পুনর্বাসন দপ্তর খোলেন। কেন্দ্র থেকে অর্থ সাহায্য পান।

যে সব আই, সি, এস কর্ম্মচারী ঠিক ইংরেজের সাথে মানিয়ে চলতে পারতেন না তাদের বদলি করা হতো বিচার বিভাগে। এইরূপ একজন আই, সি, এস হলেন হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি রাজনীতির উর্ধ্বস্তরের লোক। তিনি উদ্বাস্তুদের সেবা করেছেন প্রাণ দিয়ে। তাঁর মত করিৎকর্মা কর্মচারী সরকারের নিশ্চয় আরো আছে, তাঁর মত দরদী খুব কমই আছে। নিকুঞ্জ মাইতি ছিলেন পুনর্বাসন মন্ত্রী।

## জন্ম হ'লো পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস

কিরণশঙ্করের মৃত্যুতে বিধবা হলেন বাংলার বিপ্লবী নেতাগণ যাঁরা ছিলেন কংগ্রেসের কর্ণধার। তাঁর মৃত্যুর পরেই ১৯৫০ সালে পশ্চিম বঙ্গের রাজনীতিতে পট পরিবর্তন হয়। বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির লোপ হয়ে জন্ম হলো পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। পুর্ববঙ্গ থেকে নির্বাচিত সদস্যদের আসন বাতিল করে দিল এ, আই, সি, সি,। কারণ তাদের নির্বাচন কেন্দ্র ভারতে নেই। হুগলী গ্রুপ ক্ষমতায় এলেন।

সুরেন ঘোষ এবং তার সহকর্মীগণ যদি উদ্বাস্তু সেবাই জীবনের ব্রত করতেন তবে পশ্চিমবাংলার রাজনীতি থেকে তাঁদের কেউ হটাতে পারতেন না। তাঁদের একটি বাণী পাবার জন্য কংগ্রেস নেতাদের ঘুরতে হতো।

## জবর দখল কলোনী

ভারত সরকার অতীব ব্যস্ত পশ্চিম পাকিস্থানের উদ্বাস্তুদের নিয়ে। ওরা দিল্লীর বুকে বসে নেহেরুর আন্তর্জ্জাতিক সম্মান খর্ব করছিলেন। আর ওদের নেতাগণ, চৈতরাম গিদোয়ানী, ভীমসেন সাচার, মেহের চাঁদ খান্না বাস করছিলেন নিজ দেশবাসী সমদুঃখীদের মাঝে। তারা সরকারকে চাপ দিচ্ছিলেন পুনর্বাসনের জন্য। দিল্লী ও পাঞ্জাবের মুসলমানগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তি ওরা দখল করে নিলেন। আর মাইলের পর মাইল পতিত জমি ছিল দিল্লী ও পাঞ্জাবে। সেই সব জমিতে ওরা সরকারের সাহায্যে পুনর্বাসন পেল।

আর এদিকে? নেই আশা, নেই ভরসা। পশ্চিমবঙ্গে যে জমির দাম ছিল দশ টাকা বিঘা, তার দর হয়ে গেল হাজার টাকা বিঘা। সরকার কোন আইন করলেন না এই কালোবাজার বন্ধ করবার জন্য। তাই কাজু গাঙ্গুলী নিজের হাতে আইন তুলে নিলেন।

বরিশাল থেকে আগত কাজু। ছিলেন কংগ্রেসের সৈনিক। দু দফায় জেল খেটেছেন এগার বছর। ওঁর রাজনৈতিক দাদারাই পশ্চিম বাংলার মন্ত্রী এবং কংগ্রেস নেতা।

দাদাদের নির্দেশে ১৯৪৭ সালে বাংলা বিভাগের জন্য গলা ফাটিয়ে বরিশালের রাস্তায় রাস্তায় চেঁচিয়েছেন। পাকিস্থানের ভাগে গচ্ছিত হলেন কাজু স্বগোষ্ঠী। তারপর ১৯৫০ সালে সমস্ত পরিবার নিয়ে দাদার দেশে হাজির হলেন। ভাবলেন দাদারা তার জন্য ঘর-বাড়ি সাজিয়ে বসে আছেন।

দমেন না কাজু। আবেদন নিবেদন আর হাটাহাটি করে পায়ের টেংরী ছিঁড়ে যাবার অবস্থায় এসে দাঁড়িয়ে কাজু নিজের দিকে তাকালেন।

তাই তো আমি বরিশালিয়া কাজু গাঙ্গুলী, জীবনে করি নি
আবেদন নিবেদন। আমার কেন এ "অধঃপতন?"

জেগে উঠলেন সুপ্ত শিশুগণ। নিজের হাতে নিলেন আইন। শুরু হলো জবর দখল কলোনী। যত খালি জমি ছিল তাতে তৈরী হলো রাতারাতি বাড়ী ঘর। পুলিশ গুলি চালালে। ধরে নিয়ে গেল শত শত কাজুদের। কিন্তু তবুও স্থাপিত হলো শত শত উপনিবেশ। বিদ্যালয়, কলেজ, বাজার, মন্দির হলো স্থাপন। পানীয় জলের জন্য নিজেরাই বসালেন নলকূপ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাজ লাঘব হয়ে গেল। সরকার মনে মনে কাজুর গুষ্ঠীকে ধন্যবাদ দেন। কারণ সরকার জমি দখল করতে গেলেই হাইকোর্টে মামলা করে জমির মালিক দেয় সরকারের কাজ বন্ধ করে।

আজ ১৯৬২ সাল। দশ লক্ষ উদ্বাস্তু বাস করেন পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জবর দখল কলোনীতে। কিন্তু গত ১৯৫৯ সালে নেহেরু দিল্লীর উপকণ্ঠে পশ্চিম পাকিস্তান উদ্বাস্তুদের জন্য সরকারী অর্থে নির্মিত একটি কলোনীর ভিত্তি স্থাপন কালে বলেন যে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুরা অলস ও বোঝাসম।

কাজুর সমগোত্রীয়রা নিশ্চয়ই অলস ও বোঝাসম, কারণ তারা সরকারের অর্থে গৃহ নির্মাণ করেন নি, আর নেতৃস্থানীয় কাকেও আমন্ত্রণ করে আনেন নি তাদের নতুন উপনিবেশের ভিত্তি স্থাপন করবার জন্য।

সারা বিশ্বের রাজদূতেরা থাকেন দিল্লীতে। দিল্লীকে নোংরা করতে দেওয়া মানে নেহেরু সরকারের আন্তর্জাতিক সম্মানে আঘাত দেওয়া। তাই পুনর্বাসনের অর্থে সমস্ত দিল্লী ও পাঞ্জাবের অর্থনীতি নতুন করে গড়া হলো। দিল্লীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে দিলে নেহেরু সরকারের স্বরাষ্ট্রনীতির দুর্বলতার প্রকাশ পায়, তাই পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের প্রথমে দেওয়া হলো সাহায্য,

তারপর দেওয়া হলো ঋণ, সর্বশেষ ক্ষতিপুরণ তাদের ফেলে আসা সম্পত্তির পরিবর্তে। তারা হলেন ঋণমুক্ত।

আর এখানে? পূর্ববঙ্গের অবস্থা একটু ভাল হলেই ওরা ফিরে যাবে—এই ছিল সরকারের ধারণা। অন্য দিকে আবার "বাঙ্গাল খেদা" রব উঠলো। নেতাদের দূরদৃষ্টির অভাব।

মনে পড়ে কিরণশঙ্করের কথা। তিনি বলেছিলেন তাঁর দলীয় এক যুবককে, "তোমরা যদি ব্যবসা বাণিজ্য না কর তবে আমরা টাকা পাব কোথা থেকে? টাকার জন্য কি মাড়োয়ারীর কাছে যাব?

কি দূরদৃষ্টি!

এই দূরদৃষ্টির অভাব ছিল বলেই অনেক নেতা ১৯৫২ সালের নির্বাচনে হেরে যান। তাই সুরেন ঘোষকে রাজনীতি থেকে বিদায় নিতে হয়।

দূরদৃষ্টির অভাব ছিল না কাজুদের, কারণ ওরা ভালবাসে দেশকে।

ওরা যে রাবণ রাজার মত সজীব। দেশকে বলে মা। তাই মাতার দুঃখ মোচন করবার জন্য ওরা নিল রাবণ রাজার পথ, বললেন গুহকদা।

তাই বুঝি পেল গৃহ?

হ্যাঁ। যতদিন রামসখার মত ওরা অপেক্ষা করছিল ওদের বন্ধু ও নেতাদের সহযোগিতার আশায় আর ভক্তিভরে করেছে আবেদন আর নিবেদন, ততদিন ওদের আবেদন, নিবেদনের বিচার হয়েছে অগোচরে, সরকারী নথীর বর্ণমালায়। "দোষী জানিল না কিবা দোষ তার, বিচার হইয়া গেল।" কিন্তু পূর্ণ শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন এই কাজুর জাতি। কিন্তু শাপগ্রস্ত। অন্তর দিয়ে ভক্তি করে দেশকে, মঙ্গল কামনা করে দেশবাসীর। তাই হয়ে উঠলো অসহিষ্ণু। বেছে নিল রাবণরাজার পথ। জীবন্ত ও প্রাণবন্ত

ছিলেন রাবণ। তাই বেছে নিলেন অরিভাব। কারণ নারায়ণ-সখা হয়ে জন্ম নিলে স্বস্থানে ফিরে আসতে লাগতো সাত জন্ম, আর অরিভাবে তিন জন্ম। চাটুকারের মত স্তুতি গান করেন নাই প্রিয় দেবতার, কিন্তু তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ ভক্ত। অন্তিম সময়ও নানা শিক্ষা দিয়ে গেছেন রামচন্দ্রকে, তদ্দ্বারা উপকৃত হয়েছে সমস্ত নরকুল।

## কি হনু রে

স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রথম পর্বে মন্ত্রিত্ব ও ক্ষমতার মোহে নেতারা ভুলে গেলেন তাদের শক্তির উৎস। তাঁদের অনেকে তখন বিধান সভার সদস্য। মনে হয় যেন সবাই মন্ত্রী হতে চান।

নলিনীরঞ্জন সরকার ভাইসরয়ের এক্‌সিকিউটিভ্‌ কাউন্সিলের সদস্য পদ ত্যাগ করে এলে তার এক বন্ধুকে বলেছিলেন যে, তার মত ত্যাগ কটা লোক করেছে? ক্ষমতার লোভ ও মোহ ত্যাগ করা বোধহয় সবচেয়ে বড় ত্যাগ।

প্রফুল্ল ঘোষ স্বগোষ্ঠী কংগ্রেস ত্যাগ করে তস্য বন্ধুবর কৃপালনীর সাথে কৃষক-প্রজা দল করলেন, আর উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য একটি সমিতি করলেন। ইতিহাস তার বুদ্ধিকে প্রশংসা করবে না। ভেবেছিলেন বোধহয় যে, তিনি ছেড়ে গেলেই কংগ্রেস ভেঙ্গে যাবে।

সুরেন ঘোষ কিন্তু কংগ্রেস ত্যাগ করেন নি। তিনি মনে করেন লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর রক্ত দিয়ে গড়া কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান, সেখানে ব্যক্তিগত মতের অমিল হ'লে কি প্রতিষ্ঠানকে ত্যাগ করতে হবে? তিনি ১৯৫২ সালে মালদহ কেন্দ্র থেকে লোকসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন।

উদ্বাস্তু বাঙ্গালীর দুঃখ যে, কোন নেতাই জান্‌তে চান্‌ নি তাদের কোথায় ব্যথা, কি তারা নিজেরা করতে পারেন। কোন নেতাই তাদের চালিত করেন নি দেশের পুনর্গঠনের কাজে। জীবন্ত ও সজীব এই মাংসপেশী ইওরোপের যে কোন দেশ পেলে লুফে নিতো।

তাই তো ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষকে ১৯৫২ সালের নির্বাচনে বালীগঞ্জ বিধান সভার কেন্দ্রে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেনের কাছে, আর বর্তমানে তিনি কমিউনিষ্ট দলের পেছনে বসে বিধান সভার শোভা বর্ধন করেন। সুরেন ঘোষ রাজ্য সভার শোভা বর্ধন করছেন।

ছ্যাখ্! তোরা তো শোভাযাত্রা করার বাহাদুর, বললেন গুহকদা।

আমরা পিছ্‌পা হই নে।

শ্যামাপ্রসাদের মৃতদেহ নিয়ে তোরা বিরাট শোভাযাত্রা করেছিলি।

তা' করেছিলুম।

তোরা তো শোকযাত্রায় মত্ত, এদিকে এক বৃহৎ নেতা অন্য মহান নেতাকে বলছেন, তিনি আবার তখন অসুস্থ, শুনেছ! শ্যামাপ্রসাদের দেহ নিয়ে প্রায় পাঁচ লক্ষ লোকের শোকমিছিল বেরিয়েছে।

'উৎসাহে বসিল রোগী শয্যার উপর।' রুগ্ন নেতা লাফিয়ে উঠে বসে জিজ্ঞেস করলেন, তা হ'লে আমাদের সময়েও এরকম বেরুবে, কি বলেন?

বৃহৎ নেতাটি মুখ ভার করে বললেন, বেরুবে। তবে রাস্তায় শোকমিছিল নয়। শ্মশানে গিয়ে চিতার ভেতর খুঁচিয়ে তারা পরখ করে দেখবে সত্যিই আমরা মরেছি কিনা।

# শ্রীমতির আবির্ভাব

পরাজিত হয়েও জেতা যায় শ্রীমতি রেণুকা রে তার উদাহরণ। ১৯৫২ সালে লোকসভার নির্বাচনে তিনি হিন্দু মহাসভার নেতা নির্মল চট্টোপাধ্যায়ের নিকট হেরে গিয়েও জিতে গেলেন। তিনি ডাঃ রায়ের মন্ত্রী-সভায় যোগদান করেন পুনর্বাসন মন্ত্রী হয়ে। তিনি রণে ভঙ্গ দেবার পাত্রী নন।

বৃটিশ আমলে তিনি ছিলেন ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সরকারী মনোনীত সদস্যা। পিতা ছিলেন আই, সি, এস। বরিশালের লোক। তাই বরিশালীয়া "গো" আছে রেণুকা রে-র ভেতরে।

যুগ গেল পাল্টে ১৯৪৭ সালে। শ্রীমতী রে-ও। সুচেতা কৃপালনীর সাথে এককালে মুখ চেনা ছিল। এবার সেটিকে কাজে লাগালেন। পুরান মুখ চেনাকে গভীর বন্ধুত্বে দাঁড় করালেন। তাই কংগ্রেস মনোনীতা হয়ে বিপ্লবী নেত্রী লীলা রায়ের স্থানে সভ্যা হয়ে বস্‌লেন গণপরিষদে। আচার্য কৃপালনী তখন কংগ্রেসের সভাপতি।

শ্রীমতী রে ব্রাহ্ম। ডাঃ রায় কিরণশঙ্করকে হারিয়ে আস্থাবান লোক পান না খুঁজে যাকে মন্ত্রীসভায় নিতে পারেন। আবার নেহেরু ফতোয়া দিয়েছেন যে, একজন নারীকে মন্ত্রিমণ্ডলীতে লওয়া বাঞ্ছনীয়। তাই ডাঃ রায় রেণুকা রে-কে নিলেন তার মন্ত্রিসভায়। আরও একটি কারণ : শ্রীমতীর আছে দিল্লীর উচ্চ মহলে অবাধ গতি। তাই তাকে দেওয়া হলো পুনর্বাসন দপ্তর। এইটি হলো একটি "রেভিনিউ আরনিং" দপ্তর। আর প্রজা মাত্র একজন—ভারত সরকার। শ্রীমতী কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের ভার পেলেন।

অনেক গুণে গুণবতী ছিলেন শ্রীমতী রে। তিনি শিক্ষিতা, সাহসী। কাজ করবার আগ্রহ ও ইচ্ছা ছিল এবং শক্তিও ছিল। কোন উপদলীয় স্বার্থ তার ছিল না।

লেকিন্ তার জন্ম এবং বিবাহ তার দেশসেবা করবার অন্তরায়। এমন সমাজে তার জন্ম যা' ভারতীয় নয়। "এনামেল" করা সমাজের তিনি লোক। সাধারণ মানুষ কি ভাবে বাঁচে, কি তাদের দুঃখ, কোথায় তাদের ব্যথা, তা' বোধ করবার মত মন তাঁর কোনদিনই জন্মায় নি। কারণ, দেশের মাটিতে তাঁর নেই কোন শেকড়।

স্বামী তাঁর আই, সি, এস, এবং পশ্চিম বাংলা সরকারের মুখ্য সচিব*। তাই রাইটার্স বিল্ডিংসের আমলাতন্ত্রের সাথে ছিল তার রুটি আর সম্মানের সম্পর্ক। আমলাতন্ত্রকে ডিঙ্গিয়ে বা উপেক্ষা করে কোন কাজ করার ক্ষমতা তার ছিল না।

১৯৫২ থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন পুনর্বাসন মন্ত্রী। তার সচিব হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় আর সহসচিব নির্মল রায় চৌধুরী। সচিবকে মন্ত্রীর ঘরে থাক্‌তে হ'তো দিনে পাঁচ ছয় ঘণ্টা করে। বেচারা সচিব! কোনদিনই রাত নটার আগে বাড়ী ফিরতে পারেন নি।

শেষ পর্যন্ত শ্রীমতীর গোল বাধল সচিবদের সাথে। রায় চৌধুরীকে যেতে হলো জেলা শাসক হয়ে। হিরণ্ময় কাজে ইস্তাফা দিতে চাইলেন। পরে দীর্ঘ ছুটি নিলেন। এলেন খৃষ্টান এ, ডি, খান।

ওদিকে অজিতপ্রসাদ জৈন কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী। শ্রীমতী রে টাকা চান। অজিতপ্রসাদ আপত্তি করেন। রে যান নেহেরুর কাছে নালিশ করতে। নালিশ করে কিছু কিছু অর্থ আনেন।

আরে রাজ্য সরকারের স্টেটাসও আমাদের মত, বললেন গুহকদা।

মানে?

ঠিক আমাদের মতই ওরা ঋণের আবেদনকারী। ওদের আবেদন পত্রেরও স্ক্রুটিনী হয়। নাকচ হয়। আবার যা চায় তার থেকে কম টাকা মঞ্জুর হয়।

পুনর্বাসন কিন্তু নেই। কেবল ডোল। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার

*বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত

রাজ্য সরকারের ডোলের আবেদন স্ক্রুটিনী করে না। কিন্তু কোন পুনর্বাসনের আবেদন পত্র এলেই স্ক্রুটিনীর পর স্ক্রুটিনী। তাই সহজ রাস্তা বেছে নিয়েছিল রাজ্য সরকার।

সুবিধা হয়েছিল খুবই। বন্ধু বান্ধবের জন্য নানা পদ সৃষ্টি হয়েছিল।

সমাজ সেবক ও সেবিকাতে ধুলপরিমাণ, বললেন কুশল।

ডোল দিতে কেন্দ্রীয় সরকার কার্পণ্য করেন নি। কারণ ডোলের অর্থে বাঙ্গালী মাথা উঁচু করতে পারবে না, তা সরকার জানতেন তাই ডোল মঞ্জুর করতে তাদের বাধা ছিল না। শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার খরচ করতেন ছয় থেকে আট কোটি টাকা। শিবিরে বাস করে প্রায় তিন লক্ষ লোক। টাকা খরচ হয় রাজ্য সরকার মারফৎ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি বৃহৎ আয়, বললেন গুহকদা।

প্রজা মাত্র একজন, বললেন কুশল।

"ডোল" কথাটা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় ইংরেজের বাঙ্গালী বিপ্লবী রাজনৈতিক বন্দীদের ডোল দেবার রাজনীতি।

বাঙ্গালীর সবল ও সচল মাংসপেশী অচল কোরবার জন্য ইংরেজ ডোল দিত রাজনৈতিক বন্দীদের। বন্দীদের মানসিক ও নৈতিক অবনতি ঘটাবার জন্যই কারাগারে অকৃপণ হস্তে ইংরেজ ডোল দিত।

কেন্দ্রীয় সরকারের ডোল প্রথাও বাঙ্গালী চাষীদের সবল ও সচল মাংসপেশীকে করেছে অচল, আর এনেছে মানসিক ও নৈতিক অবনতি।

আরও গভীর রাজনৈতিক খেলা হয়েছে এই ডোলের অর্থ নিয়ে। হিসাবে বাহাদুর কেন্দ্রীয় সরকার। তারা মাথা পিছু হিসাব করে দেখিয়ে দিয়েছে যে বাঙ্গালী উদ্বাস্তু ও পাঞ্জাবী উদ্বাস্তুর পুনর্বাসনের ব্যয় প্রায় সমান সমান হয়েছে।

কেন ওরা শিবিরে থাকে মাসের পর মাস বছরের পর বছর? এর কৈফিয়ৎ কেউ দেয় নি। স্বাস্থ্যবান্ বাংলার চাষী ওরা।

ওরাই খাদ্যে করেছিল পূর্ববাংলাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ। আর ওদের পাট? বিশ্বের চাহিদার শতকরা আশি ভাগ পাট উৎপন্ন হতো এক ময়মনসিংহ জেলায়।

পাট! পাট শুনলেই মনে পড়ে "ময়মনসিংহ জুট সেল সাপ্লাই সমবায় সমিতি।"

বাঙ্গালী পাট বোনে আর কাঁদে, লাভ খায় ইংরেজ, স্কচ আর কাঁইয়া। পূর্ববাংলায় মাড়োয়ারীদের বলে 'কাঁইয়া'।

পাট চাষীদের কান্না বন্ধ করবার জন্য ময়মনসিংহের গঠিত হলো ময়মনসিংহ জুট সেল সাপ্লাই সমবায় সমিতি। পাটের সাথে ছিল ময়মনসিংহের অর্থনীতির নাড়ীর সম্পর্ক। কোন্ সালে সে সমিতি গঠন হয়েছিল তা' আমার মনে নেই। বোধহয় ১৯২৮ বা ১৯২৯ সালে।

পাটের দর আট বা দশ টাকা মন প্রতি হলেই অর্থ নৈতিক স্বচ্ছলতা আসতো ময়মনসিংহে। আর পাটের টাকা আসতো ডাণ্ডি থেকে সোজা চাষীর ঘরে। অথচ এই পাট নিয়ে হতো ফটকা। তাই না খেয়ে মরতো পাট চাষী, আর তাদের সাথে সুর মেলাতে আরও অনেকে।

সমবায় ভিত্তিতে সমস্ত পাট চাষীগণ একত্রিত হয়ে ইংরেজের পকেটে হাত দিলেন। দাদন দিলেন সমিতি থেকে সমস্ত পাট চাষীকে। সমিতি পাটের দর বেঁধে দিল আট থেকে দশ টাকা। পাট কিনতো সমিতি। ইংরেজ বা কাঁইয়া চাষীর কাছ থেকে পাট কিনতে পারতো না। অর্থ নৈতিক বিপ্লব এলো—বেনিয়াকে মারতে হবে বেনিয়া ভাবে।

টনক নড়ল। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র আরম্ভ হলো ক্লাইভ ও উমিচাঁদের বংশধরদের ভেতর। বন্ধ করে দেওয়া হলো জুট সেল সাপ্লাই সমবায় সমিতি। 'জুট'-কে করলে 'ঝুট' ইংরেজের রাজনীতি।

'বাঙ্গালী উদ্বাস্তুরা অলস,' বলেন চুপি চুপি ভারত সরকার সবার কাছে। কিন্তু বলেন না যে এই উদ্বাস্তুরা ভারতকে করেছে পাটে স্বয়ং-সম্পূর্ণ। আর পাকিস্থানের দিকে পাটের জন্য তাকিয়ে থাক্তে হয় না। ধন্যবাদ প্রফুল্ল সেনকে। তিনি এই সত্যি কথাটি পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় বলেছিলেন।

## ডাইনের হাতে ছেলে অর্পণ

লালসা আমাদের এত বেশী যে টাকার জন্য অথবা জালিয়াতী, কালোবাজারী করতে পিছপা হই না। তাই জেলেও আমরা যাই। একটিও গুজরাটির জেল হয় নি আমেদাবাদে। সব ভিন্‌দেশি লজ্জায় আমার মাথা হেট হয়ে যায়, বললেন বন্ধুর অগ্রজ ছগনলাল।

ছগনলাল আর মোহনলাল দু'ভাই। ছগনলাল বড, তিনি দেখেন আমেদাবাদের ব্যবসা আর মোহনলাল কোলকাতার। মোহনলাল একটি শিল্পের লাইসেন্স ভাড়া নিয়ে কারখানা স্থাপন করবার অনুমতি চেয়েছিলেন বড় ভাইয়ের কাছে। অগ্রজের ধম্‌কি খেয়ে চুপ্‌সে যান বন্ধুবর।

১৯৫৪ সালে শ্রীমতী রে বাংলার উদ্বাস্তু সমস্যার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। মাসটি হ'লো মে। অজিতপ্রসাদ জৈন ঘোষণা করেন যে, উদ্বাস্তুদের কর্ম সংস্থানের জন্য সরকার টাকা দেবেন বড় বড় শিল্পপতিদের, উদ্বাস্তু শিবিরে বা কলোনীতে শিল্প স্থাপন করবার জন্য, শিল্প সম্প্রসারণের জন্য এবং মৃত শিল্পকে পুনরায় জীবিত করবার জন্য।

সমাজতন্ত্রী সরকারের এ হ'লো সমাজতন্ত্রবাদের নমুনা। ইংরেজ ও মুসলীম লীগের সাথে হাত মিলিয়ে যে সব অবাঙ্গালী হিন্দু ব্যবসায়ী ১৯৪২-৪৩ সালে মন্বন্তর ডেকে আনে বাংলায়, তাদের আমন্ত্রণ জানানো হ'লো সরকারী অর্থ সাহায্য নিয়ে উদ্বাস্তুদের কাজ দেবার জন্য। ওরা হলো এস্টাব্লিসড্‌ ইণ্ডাষ্ট্রিয়েলিষ্ট, কারণ হাত পাকিয়েছে ওরা ত্রিশ লক্ষ বাঙ্গালীর শব বেচে, শব পিছু অতিরিক্ত মুনাফা করেছে এক সহস্র মুদ্রা।

শনিবার, মার্চ ৩০, ১৯৫৭ সাল। পশ্চিমবঙ্গের গভর্নর শ্রীমতী

পদ্মজা নাইডু ভারত চেম্বার অব. কমার্সের বার্ষিক সভায় উপদেশ দেন যে—

> Business men who have come from outside the State to reinvest the money they earned in West Bengal to the fullest benefit of the people of the State. If they invest their savings outside the State, however strong the sentiments they may have for their ancestral home, she would call it an antisocial act from the moral point of view... ... ...
>
> I have since myself inquired into the matter and found that at least two big firms are investing their savings outside the State.

আমন্ত্রণ তো করা হ'লো, কিন্তু অর্থ নৈতিক পুনর্বাসন হবে, না স্বর্গীয় পুনর্বাসন, তার সাক্ষাৎ দেবে ভবিষ্যৎ ইতিহাস।

রাজনীতির পঙ্কিলতার বাইরে যারা তারাই পশ্চিমবঙ্গের অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের স্বরূপ চেনেন এবং তাদের চরিত্র ব্যাখ্যা করতে ভীত হন না, যেমন সরোজিনী কন্যা পদ্মজা এবং হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সরকারের এই নীতির বিরোধিতা করেছিলেন।

বিরোধিতা করলে আর কি হবে? উপায় হয়ে গেল কতিপয় শিল্পপতির। আট বছর পার হয়ে গেছে। একটি উদ্বাস্তু কলোনীতে একটি নতুন শিল্প স্থাপন ব্যতীত আর কোন কলোনী বা শিবিরে কোন শিল্প স্থাপন হয় নি। তবুও শ্রেষ্ঠীকুলের নিজ নিজ শিল্প সম্প্রসারণের জন্য অর্থ পেয়েছেন প্রায় দেড় কোটি টাকা। কর্ম সংস্থান করেছেন প্রায় পনর শত উদ্বাস্তুর।

জৈন পরিকল্পনা অনুযায়ী শিল্পপতিগণ অর্থ পাবেন ইণ্ডাস্ট্রিয়েল ফাইনান্স কর্পোরেশনের সুদের হারের চেয়ে কম সুদে। অর্থ প্রাপ্তির পর যদি তারা উদ্বাস্তুদের চাকরী থেকে বরখাস্ত করে তবে সরকারের বলবার কিছু থাকবে না। অধিকন্তু উদ্বাস্তু নিয়োগ করে

শিল্পের যে ক্ষতি হবে তা সরকার বহন করবেন। অথচ পুনর্বাসন অর্থ সংস্থা থেকে যে সব উদ্বাস্তু অর্থ নিয়েছেন তাদের শিল্পে যে লোকসান হয়েছে তা' সরকার বহন করেন না।

এই হ'লো জৈন পরিকল্পনা।

রেনুকা রে কেন্দ্রীয় সরকারকে চাপ দিচ্ছিলেন শিবিরের বাহিরের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য। কারণ শিবিরের বাইরে আছে প্রায় ত্রিশ লক্ষ উদ্বাস্তু। অনেকে হয়তো সামান্য চাকুরী করছেন বা সামান্য ব্যবসা করছেন তাদের গৃহঋণ দিলেই সমস্যার সমাধান হয়। বা অনেকে ব্যবসা করছেন কিন্তু পুঁজির অভাবে পুনর্বাসন লাভ করতে পারছেন না, তাদের সামান্য অর্থ সাহায্য করলেই সমস্যার সমাধান হয়। শ্রীমতী রে বেশী সফলকাম হন নি। প্রায় দশ লক্ষ গৃহঋণের দরখাস্ত পড়ে আছে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে। এর ভেতর প্রায় এক লক্ষ আবেদনপত্র মঞ্জুর হয়েছিল। কিন্তু টাকা তাঁরা পান নি। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার গৃহঋণের অর্থ বন্ধ করে দিয়েছে।

মরেছে কৃষ্ণগোপাল। মঞ্জুরী পত্রটি পেয়েই বাড়ীর ভিত পর্যন্ত গেঁথে ফেল্‌লো নিজের আঠার শ' টাকা খরচ করে। ব্যস! তারপর কনুইতে গুড়। আর পেল না অর্থ। ওর দুকুল ভেঙ্গেছে, বললেন গুহকদা।

অবাঙ্গালী মন্ত্রী বা রাজকর্মচারী কেউই বাঙ্গালীর সমস্যা বোঝে না, কিন্তু বোঝবার ভান করে। অজিতপ্রসাদ যাদবপুরের গাঙ্গুলী বাগানে উদ্বাস্তুদের বসবাসের জন্য চার তলা বাড়ীর পরিকল্পনা করে অর্থ মঞ্জুর করেছেন এবং নিজে সেই অট্টালিকার ভিত্তি স্থাপন করেন।

হাসেন কমিউনিষ্টরা অলক্ষ্যে। কারণ ঐ সব প্রাসাদই হবে অদূর ভবিষ্যতে ওদের ডেন।

## এলেন মেহেরচাঁদ

মেহেরচাঁদ খান্না পশ্চিম বাংলার উদ্বাস্তু রাজনীতিতে নতুন নক্ষত্র। তিনি পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব নিয়ে কলকাতায় আগমন করেন ১৯৫৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে।

প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগে মেহেরচাঁদ ছিলেন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কংগ্রেস সরকারের অর্থ মন্ত্রী। যৌবনেই তিনি খেতাব পেয়েছিলেন "রায় বাহাদুর"। হিন্দু মহাসভার নেতা ছিলেন। খেতাবটি বর্জন করে কংগ্রেসে যোগদান করেন। তিনি ছিলেন তার প্রদেশের একজন ধনী ব্যক্তি। এক বস্ত্রে তাকে প্লেনে চেপে আসতে হয়েছিল দিল্লীতে। হলেন উদ্বাস্তু, একদা ছিলেন অর্থবান। তাই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সর্বহারাদের ব্যথা কোথায়। পশ্চিম পাকিস্থানী উদ্বাস্তুদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ প্রাপ্তি সবই মেহেরচাঁদের চেষ্টার ফল।

মেহেরচাঁদের আগমনের একমাস পূর্বে কোলকাতায় আগমন করেন প্রফুল্ল চক্রবর্তী। তিনি জাতীয় কংগ্রেস কমিটির স্থায়ী সচিব। থাকেন নতুন দিল্লীতে। দেশ ছিল তাঁর ঢাকা জেলায়। অনুশীলন দলের একজন নেতা। কারাবাস করেছেন বহু বছর। অধ্যাপক ছিলেন অনেক বেসরকারী কলেজে। কিন্তু তৎকালীন সরকারের অনুগ্রহে কোথাও টিক্‌তে পারেন নি। যে কলেজেই তিনি নিযুক্ত হন সেই কলেজেরই উপর পড়ে রাজরোষ, তাই তাকে ছাড়তে বাধ্য হতে হয়। অন্তবর্তী কেন্দ্রীয় মান্ত্রসভার সদস্য যখন শরৎচন্দ্র বসু ছিলেন, প্রফুল্ল চক্রবর্তী ছিলেন তার একান্ত সাচব। শরৎচন্দ্র বসু কংগ্রেস ত্যাগ করলেন কিন্তু তিনি রয়ে গেলেন। অসাধারণ মেধাবী ও কর্মী পুরুষ। দিল্লী বিধান সভার সদস্য ছিলেন। পশ্চিম পাকিস্থানী

উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য তিনি অনেক পরিশ্রম করেছেন।*

তিনি এলেন মেহেরচাঁদের অগ্রদূত হয়ে। বহু উপনগরীতে তিনি ঘুরে ঘুরে শোনালেন আশার বাণী। মেহেরচাঁদের গুণ বর্ণনা করলেন। আশা দিলেন যে উদ্বাস্তুরা পাবে মেহেরচাঁদের ভেতর দরদ ও সহানুভূতি।

মেহেরচাঁদ এলেন। কয়েক মাস পরেই অজিতপ্রসাদের পদোন্নতি, তৎসহ মেহেরচাঁদের ভাগ্যোদয়। তিনি নিযুক্ত হলেন কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী।

দিল্লীতে তার কার্যপ্রণালী ছিল দুরকম। তিনি খোদাই খিদ্‌মদ্‌গার। সর্বদা তিনি নিজে উদ্বাস্তুদের সাথে দেখা করতেন। আর সমস্ত কর্মচারীদের নিয়ে একসাথে বৈঠকে বসে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ছিল তার কর্মধারা। তিনি ফাইলে "নোটা নোটি" পছন্দ করতেন না।

কোলকাতায় এসেও তিনি পূর্বধারা অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করেন। সহায়ক পেলেন কর্মঠ ও আশাবাদী অবনী চ্যাটার্জিকে। অবনী চ্যাটার্জি ছিলেন জয়েণ্ট সেক্রেটারী। নিজে তিনি উদ্বাস্তুদের সাথে সাক্ষাৎ করতে আরম্ভ করলেন। ঘুরতে লাগলেন উপনগরীতে উপনগরীতে। উদ্বাস্তুদের ভেতর আশার সঞ্চার হলো। যেখানেই গলদ দেখেন নিজে এগিয়ে যান তার সমাধান করতে।

তিনি বলতেন যে বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন করা অনেক সহজ, কারণ তাঁরা শুধু কর্মঠই নন তাঁরা বুদ্ধিমান এবং বেশীর ভাগ শিক্ষিত। তিনি বুঝলেন যে শুধু "ইকনমিক্ বিইং" করে এদের পুনর্বাসন দেওয়া যাবে না। এদের সম্মুখে তুলে ধরতে হবে একটি মহৎ আদর্শ। সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত করতে পারলেই বাঙ্গালী এগিয়ে আসবে স্বেচ্ছায়।

মেহেরচাঁদ অনুভব করলেন যে বাঙ্গালী উদ্বাস্তু রাজনৈতিক চেতনা

* বিহার রাজ্যের ধানবাদ লোকসভার নির্বাচন কেন্দ্র থেকে ১৯৬২ সালের নির্বাচনে তিনি কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

সম্পন্ন। যদিও তিনি স্বার্থপর রাজনৈতিক নেতাদের নিন্দা করলেন।

বাঙ্গালী ও পশ্চিম পাকিস্থানী উদ্বাস্তুদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানসিক তফাৎ মেহেরচাঁদ ধরতে পারেন নি। মেহেরচাঁদের প্রদেশের রাজনৈতিক নেতা ছিলেন তিনি নিজে ও খান ভ্রাতাগণ। তারা ছিলেন ধনী শ্রেণীভুক্ত। ঐ সব প্রদেশে ছিল দু' শ্রেণী—ধনী ও গরীব। অর্থ ও রাজনীতি ছিল ধনী শ্রেণীর আয়ত্বে। দরিদ্র শ্রেণী যে কিরকম ছিল তা' বাঙ্গালীর পক্ষে কল্পনা করা কঠিন। হাজার হাজার উদ্বাস্তু এসেছেন যাঁদের কোনদিনই নিজস্ব গৃহ ছিল না।

পূর্ব বাংলায় ছিল দু' শ্রেণী—ধনী ও মধ্যবিত্ত। মধ্যবিত্তের ভেতর ছিল আবার দু' শ্রেণী—অবস্থাশালী মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত। মেহেরচাঁদের দেশে যাদের গরীব বলা হয় এমন লোক পূর্ব বাংলায় বিরল। প্রত্যেক লোকের নিজস্ব গৃহ ছিল আর ছিল অন্তত তিন মাসের খাবার সংস্থান।

বাংলার রাজনীতি ছিল মধ্যবিত্তের হাতে। ওরা প্রাণ দিয়েছে ও নিয়েছে। কোন হাঙ্গামা বা অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতার জন্য দেশ ছেড়ে আসেন নি মধ্যবিত্ত। স্বাধীন ভারতের সরকার গঠন করেছে কংগ্রেস, তাই ওরা চলে এলো ভারতে অতি আনন্দে, যেমন আসে গৃহে ফিরে বিদেশ থেকে।

গৃহে এসে আশা ভঙ্গ হ'লো। যে কংগ্রেসের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সর্বস্ব ত্যাগ করে তারা ভারতে এলো সেই কংগ্রেস হ'লো আদর্শচ্যুত।

ভুল, সম্পূর্ণ ভুল। কংগ্রেস আদর্শচ্যুত হয় নি, মাত্র পার্শ্ব পরিবর্তন করেছে, বললেন গুহকদা।

পার্শ্ব পরিবর্তন করেছে কিরকম ? কুশল প্রশ্ন করলেন।

জানিস্ তো কোন এক সমাজে বিয়ের আসরে পাত্রীকে বলে পুরোহিত, 'ভগিনী পার্শ্ব পরিবর্তন কর ঈশ্বরের কার্য সমাধা হোক্ বললেন গুহকদা।

জানি না কিন্তু শুনেছি।

ঈশ্বরের কার্য সমাধার জন্য কংগ্রেস পার্শ্ব পরিবর্তন করে একটি দলে পরিণত হলেন। স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত কংগ্রেস ছিল প্লাটফর্ম, যেখানে মিলিত হয়েছিল হিংসাবাদী ও অহিংসাবাদী, কমিউনিষ্ট ও ধনিকবাদী, হিন্দু ও মুসলমান। পরে হ'ল দল ; সবাইর স্থান কোনদিনই এক দলে হয় না, বললেন গুহকদা।

আদর্শবাদী বাঙ্গালী। দিনের পর দিন যে জাতি ধর্মের নামে উপোষ দিতে পারে, তাকে অর্থ নৈতিক পুনর্বাসন দেবার আগে যে তার নৈতিক পুনর্বাসনের দরকার তা ভারত সরকারের অগোচর এবং তা' বুঝবার ক্ষমতাও তাদের ছিল না। কিন্তু মেহেরচাঁদ কয়েক মাস কোলকাতায় থাকার পর তা বুঝেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে বাঙ্গালী উদ্বাস্তুর নিকট দেশপ্রেমের একটি আদর্শ তুলে ধরতে পারলেই তাঁরা এগিয়ে আসবেন দেশের উন্নতির জন্য।

মেহেরচাঁদ ছেড়ে দিলেন বক্তৃতা দেওয়া। তিনি মিশতে আরম্ভ করলেন উদ্বাস্তুদের সাথে। দশ বা পনর জন উদ্বাস্তু মিলে তাঁকে ডাক্‌লেই তিনি যেতেন এবং তাদের কথা শুনতেন। এই ভাবে তিনি তাদের মনের কথা জানতে আরম্ভ করলেন। তিনি জানলেন যে উদ্বাস্তু বাঙ্গালী হ'লো মধ্যবিত্ত শ্রেণী যারা দেশের সর্ব কাজে অগ্রণী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করলেন যে শান্ত বাঙ্গালী, তবে শান্ত ভারত।

আগষ্ট ১৪, ১৯৫৫ সাল। মেহেরচাঁদ মিলিত হলেন কতিপয় পূর্ববঙ্গীয় কংগ্রেসকর্মীর সাথে এক বৈঠকে। প্রায় তিন ঘণ্টা চল্‌লো আলাপ আলোচনা। কোন বক্তৃতা হল না।

মেহেরচাঁদ জানতে চাইলেন কি করলে উদ্বাস্তুদের সুবিধা হয়। নানা রকম প্রশাসনিক বাধার কথা উঠলো। কেন্দ্রীয় সরকার পুনর্বাসন করেন রাজ্য সরকারের মাধ্যমে।

ঐখানেই যত গলদ কারণ মহামান্য জার নিয়ে যান অর্ধেক, বললেন গুহকদা।

কি রকম ?

আজকের কমুদের দেবস্থানে একদিন রাজত্ব করতেন প্রবল প্রতাপান্বিত জার। তাঁর রাজত্বে বাস করতো একটি পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালক। একটি চার্চের সম্মুখে সে ভিক্ষা করতো। ভক্তিমান নর ও ভক্তিমতী নারী ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবার জন্য বালককে উপদেশ দিতেন। তিনি সর্বশক্তিমান, তিনিই একমাত্র বালকের সর্ব দুঃখ মোচন করতে পারেন। প্রতি রাববার উপদেশ বাণী শুনে শুনে বালক এক মহিলাকে জিজ্ঞাসা কর'লো ভগবানের বাসস্থান কোথায় ?

স্বর্গে, উত্তরিলেন ভক্তিমতী নারী।

অবোধ বালক লিখলো এক চিঠি ভগবানকে। সবাই বলে তুমি সর্বশক্তিমান ও দয়ালু এবং আমার দুঃখ একমাত্র তুমিই মোচন করতে পার। তাই আমি তোমাকে জানাই যে শীত আগতপ্রায় ; আমার কুটির মেরামত করতে হবে, আর আমার গরম জামা একদম নেই। তুমি আমাকে দয়া করে একশ' রুবেল পাঠিও। ঠিকানা লিখলো ভগবান, কেয়ার অফ্ মহামান্য জার, স্বর্গধাম।

চিঠি তো গিয়ে পৌছল জারের দরবারে। এক সভাসদ বললেন যে, বালকটি জারকে ভগবান বলে সম্বোধন করেছে এবং বালকটি বড়ই দুঃখী তাই তাকে একশ' রুবেল পাঠাবার আদেশ দান করা হউক।

তথাস্তু, বললেন সম্রাট।

ঈর্ষা হ'লো আর একজন সভাসদের। সামান্য বালক একটি চিঠি লিখেই নিয়ে যাবে একশ' রুবেল ! তিনি বললেন যে, বালক অত্যন্ত গরীব ও পিতৃমাতৃহীন। একশ' রুবেল তার

হাতে গেলে অপচয় হবে। সেই হেতু পঞ্চাশ রুবেল পাঠাবার আদেশ দেওয়া হউক। সম্রাট তার আদেশ পরিবর্তন করে পঞ্চাশ রুবেল পাঠাবার আদেশ দিলেন।

মঞ্জুর করা আর অর্থপ্রাপ্তি এক কথা নয়। শীত প্রায় শেষ, বালক মৃতপ্রায়, তখন গিয়ে পৌছিল পঞ্চাশ রুবেল।

ধন্যবাদ দিয়ে বালক ভগবানকে জানাল, তোমার প্রেরিত অর্থ পেয়েছি, কিন্তু ভবিষ্যতে তুমি যদি আরও অর্থ পাঠাও তবে জারের মাধ্যমে পাঠিও না। জার শুধু দেরিই করে না, অর্ধেক নিয়েও যায়।

বৈঠকে উপস্থিত উদ্বাস্তুগণ খান্নাজীকে বললেন যে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত উদ্বাস্তুদের সমস্যা সমাধান না করতে পারলে উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান হবে না। এদের সমস্যার সমাধান হয় স্থায়ী চাকুরীতে অথবা এদের উদ্যম, অধ্যবসায় ও শিক্ষাকে কোন ব্যবসায় বা শিল্পে নিযুক্ত করে। বাঙ্গালীর স্বাতন্ত্রবোধ ও শিক্ষার পক্ষে উপযুক্ত হবে তার নিজস্ব ছোট ছোট শিল্প বা ব্যবসা। পুনর্বাসন অর্থ সংস্থা যা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন, এই সমস্যার সমাধান করতে পারে। মেহেরচাঁদ একমত হলেন।

এই বৈঠকের পর মেহেরচাঁদ অভিমত দিলেন এইরূপ শিক্ষণীয় পরিবেশে তিনি পূর্বে কখনও আসেন নি। তিনি আশা করেন ভবিষ্যতে আরও এইরূপ বৈঠকে মিলিত হবেন।

## বাঙ্গালী সমাজ ও পুনর্বাসন অর্থ সংস্থা

কিরণশঙ্কর গত, সুরেন ঘোষ অস্তগামী, তাই অরুণচন্দ্র গুহের উদয়ে আশার আলোক দেখ্‌লো বাঙ্গালী উদ্বাস্তু।

বাংলার রাজনীতিতে উদ্বাস্তু হয়েও অরুণচন্দ্র লোকসভায় কংগ্রেস মনোনীত সভ্য হয়ে নির্বাচিত হন। তিনি মেধাবী ও কর্মঠ। পশ্চিমবঙ্গ থেকে যে ক'জন সভ্য কেন্দ্রে নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁদের ভেতর তিনিই বোধহয় সবচেয়ে বেশী লেখাপড়া করেন। তাঁর উদ্যম ও অধ্যবসায় সার্থক হ'লো। নেহরু তাকে উপমন্ত্রী মনোনীত করেন এবং তিনি অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে যুক্ত হন। কিছু দিন পরে তিনি অর্থমন্ত্রণালয়ের রাষ্ট্র-মন্ত্রিত্ব লাভ করেন। পুর্নবাসন অর্থ সংস্থা বা আর, এফ, এ, তাঁর অধীন।

শিবিরের বাইরে যে সব উদ্বাস্তু বাস করেন তাদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করেন নি। একমাত্র পুনর্বাসন অর্থ সংস্থা থেকে ব্যবসা বা শিল্প স্থাপন করবার জন্য ঋণ গ্রহণ করে তাঁরা পুনর্বাসন লাভ করতে পারতেন। এই সংস্থা স্থাপিত হয় ১৯৪৮ সালে পশ্চিম পাকিস্তানী উদ্বাস্তুদের সাহায্যকল্পে। সংস্থার প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হয় দিল্লীতে। কলকাতায় একটি শাখা কার্যালয় স্থাপিত হয়।

দেশ বিভাগ হবার সময় থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত বাঙ্গালী উদ্বাস্তুর অর্থ ছিল। তাঁরা দেশের গৃহ, জমি ইত্যাদির বিক্রিত অর্থ আমদানি করে নিজেদের পুনর্বাসনে চেষ্টিত হলেন। এ কয়েক বছরে "চোরা রাস্তায়" ভারতে আমদানি হয় দু'শ' কোটি টাকার উপর।

† শ্রদ্ধেয় পৃথ্বীশচন্দ্র দাশগুপ্ত সম্প্রতি গঙ্গালাভ করেছেন। তাঁর মৃত্যুর দশ বা বার দিন পূর্বে আমার এই অধ্যায়ের পাণ্ডুলিপি তাঁকে তাঁর ব্যারাকপুরের বাড়ীতে পড়ে শুনিয়ে তার আশীর্বাদ লাভ করেছিলুম।

নিজেদের পুনর্বাসন করবার জন্য চল্লিশ হাজার বাঙ্গালী উদ্বাস্তু ঋণের জন্য আর, এফ, এ-র নিকট আবেদন করেন।

পূর্ববঙ্গের সমাজ ব্যবস্থায় সম্মানিত হতেন বিদ্বান, গুণী ও জ্ঞানী। বিদ্যাহীন অর্থবানের সম্মান ছিল সমাজের অতি নিম্নস্তরে। তাই জমিদারী প্রথা ও সরকারী চাকুরী আকৃষ্ট করেছিল উচ্চবর্ণ হিন্দুদের। কিন্তু সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য ছিল পূর্ববঙ্গীয় বৈশ্যদের হাতে।

স্বামী বিবেকানন্দ বাঙ্গালীর চাকুরীর মোহ ভাঙ্গেন। তিনি আমেরিকা ও ইয়োরোপ ঘুরে এসে বাঙ্গালীকে শিল্প স্থাপন করবার জন্য উৎসাহ দিলেন।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে আরম্ভ হয় স্বদেশী আন্দোলন। ইংরেজকে "ভাতে মারবার" আন্দোলন শুরু হয়। শিক্ষিত বাঙ্গালীর জীবনে প্রথম শুরু হ'লো গোলামী না খুঁজে বণিক হওয়া বা শিল্প-পতি হওয়ার চেষ্টা। প্রতিষ্ঠা হ'লো অনেক শিল্প ও ব্যবসা। ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে কিন্তু কোন সাহায্য পাওয়া যায় নি।

তাই কিন্তু কন্যার পিতা বেশী পছন্দ করতেন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকের চেয়ে তার মাইনে করা হিসাব রক্ষককে, বললেন গুহকদা।

গল্পটি বলুন, দাদা, অনুরোধ করলুম।

কন্যাদায়গ্রস্ত বিচারক। বিবাহের প্রস্তাব এলো। গেলেন তিনি পাত্র দেখতে। পছন্দ হ'লো না কারণ পাত্র ব্যবসা করে। আরও একটি বিয়ের প্রস্তাব ছিল। পাত্র কোনও বেসরকারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের হিসাব রক্ষক। ভাল মাইনে। আর কথা নেই। বিয়ে হয়ে গেল।

হয়ে গেল?

হয়ে তো গেল। তারপর শোন। কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করলেন বিচারক। গৃহ নির্মাণ করলেন বাঙ্গালগঞ্জে। লেক বাজারে প্রতিদিন প্রাতে বাজার করেন নিজে। বাজারের

উপরেই জামাতার অফিস। গেলেন তো একদিন জামতার অফিসে। জামাতা পরিচয় করিয়ে দিলেন মালিকের সাথে। মালিক তাঁকে বললেন যে তিনি তাঁর পূর্ব পরিচিত। ভূতপূর্ব বিচারকের মনে পড়'লো যে মালিক তাঁরই নাকচ করা পাত্র।

ত্রিশ সালের রাজনৈতিক আন্দোলনে পূর্ববঙ্গে নাকচ করা পাত্রের সংখ্যা পেল বৃদ্ধি। চাকুরী না পাওয়ায় বহু মধ্যবিত্তের সন্তান স্থাপিত করলেন ব্যাঙ্ক, ইন্সিওরেন্স কোম্পানী, শিল্প, ব্যবসা। অনেকগুলি নষ্ট হয়ে যায়। বোধহয় ১৯৩৭ সাল। নলিনীরঞ্জন সরকার বলেছিলেন যে, গত সাত বছরে বাঙ্গালীর ছেলেরা ব্যবসা ও শিল্পে প্রায় সাত কোটি টাকা লোকসান দিয়েছে।

আবার এলো যুদ্ধ। সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান। ১৯৪২ সালের "ভারত ছাড়" আন্দোলন। বাংলাকে দমন করবার জন্য ইংরেজ সৃষ্টি করলো দুর্ভিক্ষ। না খেয়ে মরলো ত্রিশ লক্ষ বাঙ্গালী মাত্র কয়েক মাসে। জাতির নৈতিক চরিত্রের উপর পড়ল প্রচণ্ড আঘাত।

যুদ্ধের সাথে তাল রাখ্‌তে পারে নি বাংলার বৈশ্য সমাজ, যাঁরা ছিলেন বাংলার জাতব্যবসায়ী। সরকার করলেন চালু নিয়ন্ত্রণ প্রথা। ওঁরা হলেন ভীত। কি জানি কোথায় কোন স্টেটমেণ্ট দাখিল করতে হবে, আর তাতে থাকবে গলদ, অমনি ভারত রক্ষা আইনে বন্দী! কি দরকার ঝামেলায় গিয়ে! যথেষ্ট অর্থ আছে বসে খাবার মত। ফল হ'লো কলকাতার ঢাকা পট্টি শূন্য, কাপড় সূতো সমস্ত ব্যবসা চলে গেল অবাঙ্গালী জুয়াড়ীদের করতলে।

যুদ্ধের দরুন খাদ্য-দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হয়। পূর্ব বাংলার কৃষক শ্রেণী হয় ধনবান, যেমন ধনবান্ হ'তো।

তারপর পাটের দাম দশ টাকা হলে, সবারই আর্থিক উন্নতি হয়েছিল। যুদ্ধ বাঙ্গালীকে ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠার দিকে নতুন প্রেরণা দিল। ছোট ছোট অনেক শিল্প গড়ে উঠে পূর্ব বাংলায়।

শিল্প ও ব্যবসায় বাঙ্গালীর অর্থ নিয়োগ করবার আর একটি কারণ ফজলুল হক, ও তাঁর ঋণ শালিশী বোর্ড আইন। হক যখন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তখন তিনি এ আইন পাশ করেন। হিন্দু ছিল মহাজন, কৃষক ছিল খাতক। হক খতম করেন মহাজনের তেজারতী কারবার। ইতিহাস কৃতজ্ঞতা স্বীকার করবে বৃদ্ধ শার্দুলের নিকট।

যুদ্ধ তো গেল। বাঙ্গালীর জীবনে এলো বিপর্যয়। দেশ হলো বিভাগ। বিত্তবান্ হলেন বিত্তহীন। সবাই ইজ্জত বাঁচাবার জন্য এপার ওপার হলেন। রামানুজ এপারে এলেন।

রামানুজ প্রমাণ করেছেন যে শিক্ষিত মধ্যাবত্ত বাঙ্গালীর ছেলে না পারে এমন কাজ নেই।

যাদবপুর কলেজ থেকে কৃষিবিদ্ হয়ে রামানুজ যায় দেশে ফিরে। ওর পিতা দিলেন ওকে পঞ্চাশ একর জমি উচ্চ ধরনের কৃষি ও পশু পালন করবার জন্য। কাজ আরম্ভ করতে না করতেই ভারত হ'লো স্বাধীন। পাকিস্তানের সম্মানহীন অন্নের চেয়ে ভারতে সম্মান নিয়ে অন্নহীন থাকা শ্রেয় তাই রমানুজের পরিবার চলে আসে ভারতে।

পুনরায় জমির মায়ায় আবদ্ধ হতে চাইলেন না রামানুজের পরিবার। নতুন উদ্যমে পরিবারটি আবার শিল্পের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হতে অধ্যবসায় আরম্ভ করলো। আবার বিদ্যার্থী হলেন রামানুজ। প্রবেশ করলেন একটি অটমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারীং স্কুলে। সেখান থেকে পাশ করে চলে গেলেন লণ্ডনে ১৯৫০ সালে। তিন বছর সেখানে অধ্যয়ন করে অটমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারীং পাশ করলেন।

ভারত-জার্মান টেক্‌নিকাল কোপারমন স্কিমে রামানুজ মনোনীত হয়ে জার্মানীতে অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারীং হাতে কলমে শিখতে যান। সেখানে মারসিডেজ বেঞ্জ কারখানায় দু' বছর শিক্ষানবীশ ছিলেন। শিক্ষান্তে টাটা কোম্পানী তাঁকে নিয়োগ করে কৃষিবিদ্ রামানুজ আজ টেলকোতে অটমোবাইল যন্ত্রবিদ্।

চল্লিশ হাজার রামানুজ ঋণের জন্য আবেদন করেছিলেন পুনর্বাসন অর্থ সংস্থার নিকট।

আমরা আবার বাঁচব। শিল্প স্থাপন করবো। অর্থ চাই। কোথায় অর্থ? এই যে এখানে, বিজ্ঞপ্তি দিচ্ছে আর, এফ, এ, যে সব উদ্বাস্তুর উদ্যম আছে, অধ্যবসায় আছে আর, এফ, এ, তাদের অর্থ সাহায্য করবে। নবারুণ করলেন আবেদন।

পারিবারিক নিয়মানুযায়ী লেখাপড়া শিখেছিলেন আর শিখেছিলেন অর্থ উপার্জনের জন্য পরিশ্রম না করতে। উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন স্বাস্থ্য, উদ্যম ও অধ্যবসায়।

এলেন তো কলকাতায়। বৃহৎ পরিবার। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে পরিবার প্রতিপালন হচ্ছে। নবারুণের শান্তি নেই। হিসাব করে দেখলেন তিন বছর এভাবে বসে খেলে ফুরিয়ে যাবে ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স।

পথ বাৎলে দিলেন ওদের বাড়ীর ভূতপূর্ব মটর চালক। মটর তো আর নেই। দেশেই ফেলে এসেছিল। কিন্তু চালক নগেন্দ্রকে ফেলে আসতে পারেন নি। সপরিবারে নবারুণের আশ্রিত।

অটোমবাইল পার্টস তৈরি করবার একটি কারখানা স্থাপন করবার জন্য নগেন্দ্র বললেন নবারুণকে। যেই বলা অমনি কাজ আরম্ভ। একটি ঘর ভাড়া নিয়ে যন্ত্রপাতি বসান হ'লো। নগেন্দ্রের চেষ্টায় কাজও আসতে শুরু হ'লো। চারজন লোক নিয়ে এলো নগেন্দ্র। ওরা সবাই নবারুণের দেশের লোক। মটর গাড়ি মেরামতের কাজ জানে। নবারুণ তাঁর মিথ্যা সম্মান বর্জন করে নিজেও যন্ত্র ধরলেন।

পাঁচ ছ' মাস কাজ করার পর নবারুণ ব্যবসা বুঝতে পারলেন। কারখানা বাড়াবার পরিকল্পনা করলেন। আরও অর্থ চাই। সংবাদ পত্রের বিজ্ঞপ্তি দেখে নবারুণ আর, এফ, এ-এর নিকট ঋণের জন্য আবেদন করলেন।

প্রায় ছ' মাস পরে প্রাপ্তির স্বীকৃতি এল, আর সঙ্গে এল একটি ছাপান আবেদন পত্র।

তারও প্রায় তের মাস পরে পত্রযোগে নবারুণকে সাক্ষাৎ করবার জন্য আহ্বান করা হ'লো সংস্থার কলকাতার কার্যালয় থেকে। কর্মকর্তাগণ চাইলেন নানা কাগজ। প্রথমে চাওয়া হ'লো উদ্বাস্তু প্রমাণ পত্র। দাখিল করা হ'লো। অবার চাওয়া হ'লো ব্যবসার প্রমাণ পত্র। পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না।

স্কিম দিন? স্কিম আবার কি? কটা মেসিন, কি প্রোডাক্সন, কত লাভ হতে পারে, কত টাকা মূলধন দরকার, কত জন লোক কাজ পাবে? খরচ হয়ে গেল নবারুণের প্রায় পাঁচ শ' টাকা স্কিম তৈরি করতে আর হাঁটাহাঁটি করতে।

আচ্ছা, আপনি এখন যান। যথা সময়ে পাবেন খবর বললেন কর্মকর্তা।

আরও প্রায় ছ' মাস পরে আবার ডাক এলো রাজ্য শিল্পাধিকর্তার কাছ থেকে। তিনি পুনর্বাসন অর্থ সংস্থার টেক্‌নিক্যাল উপদেষ্টা। সংস্থার নিজের কোন টেক্‌নিক্যাল উপদেষ্টা ছিল না। তাই স্কিমটি গেছে তার দপ্তরে। তিনি আবার নানা রূপ প্রশ্ন করলেন। উত্তর দিলেন নবারুণ। উনিশ মাস পার হয়ে গেছে। নবারুণের উৎসাহে পড়েছে ভাটা।

চার মাস পরে আবার এলো আহ্বান সংস্থার স্থানীয় কার্যালয় থেকে।

আরে মশাই! সিকিউরিটি কি দেবেন তা' তো লেখেন নি। জামিনদারের নাম কোথায়, শুধালেন সংস্থার কর্মকর্তা।

আমার যা যন্ত্রপাতি তাই থাক্‌বে সিকিউরিটি, আর জামিনদার পাবো কোথায়?

কোন আত্মীয় স্বজন যার ঘর বাড়ী আছে?

জীবনে হয় নি কোনদিন কারও কাছে অর্থ সাহায্য

চাইবার প্রয়োজন। জামিনদার হতে কাউকে বলতে পারব না।
আর আমার আত্মীয় বা বন্ধুবান্ধব সবাই আমার মত উদ্বাস্তু,
উত্তর দিলেন নবারুণ।

বাইরেও অনেক জমিনদার পাওয়া যায় একটু খোঁজ করে
দেখুন না।

মাপ করবেন। এখনও শিখি নি মিথ্যার আশ্রয়
নিতে।

কি করবো? আমরা হুকুমের চাকর।

আটাশ মাস পর নবারুণ পেল, পত্র সংস্থায় দিল্লীর কার্যালয়
থেকে যে, তাঁর আবেদনপত্র মঞ্জুর হয় নি।

এরকম প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার নবারুণের আবেদন পত্র নামঞ্জুর
হয়েছে।

গড়পড়তা বাইশ মাস করে লেগেছে একটি আবেদন পত্র সম্পর্কে
চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে।

সংস্থার চাহদানুযায়ী স্কিম ইত্যাদি তৈরি করতে, কাগজ পত্র
দাখিল করবার জন্য যাতায়াত ইত্যাদির জন্য প্রতি আবেদনকারীর
খরচ হয়েছে গড়পড়তা পাঁচ শ' টাকা। তা' হলে চল্লিশ হাজার
আবেদনকারীর খরচ হয়েছে দু' কোটি টাকা।

চাওয়া আর পাওয়া কি মশাই একদিনে হইছিল? এত
দিন যে বইয়া বইয়া খাইছি তার দেনা পয়লা শোধ দিমু না?
উত্তর দিয়েছিলেন সুরেশ রায় সংস্থার ইন্স্পেক্টারকে।

সুরেশ রায় ছিলেন স্বর্ণকার। সংস্থা থেকে কিছু অর্থ ঋণ
স্বরূপ পেয়েছিলেন। টাকা পেয়েই হিসাবের খাতায়
লিখ্লেন—

| জমা— | খরচ |
|---|---|
| আর, এফ, এ, হইতে ঋণ গ্রহণ ৪০০০৲ | খাই খরচের দেনা বাবদ শোধ দেওয়া গেল—১২০০৲ |

সংস্থার ইন্সপেক্টর সুরেশ রায়ের হিসাব খাতা পরীক্ষা করে প্রশ্ন করলেন যে তার আবেদন পত্রে এমন কোন ঋণের কথা উল্লেখ ছিল না।

কৈফিয়ৎ দিলেন রায় মহাশয় চা'য়া আর পাওয়া কি মশায় একদিনে হইছিল ?

যন্ত্রচালিত কাপড় ধোলাইয়ের স্কিম করে ঋণের জন্য আবেদন করেছিলেন শৈলেন। সংস্থা তাঁকে ঋণ দেন নি কারণ শিল্পটি আন্‌ইকনমিক।'

আজ কোলকাতা ছেয়ে গেছে চীনাদের যন্ত্রচালিত ধোপাখানায় মিকানাইজ্‌ড লণ্ড্রীতে। এ শিল্পটি বাঙ্গালীর হ'তে পারতো।

একটি ধান ছাটাইয়ের কল বসিয়েছিলেন গিরিজাশঙ্কর ভাদুড়ী। গিরিজাশঙ্কর ছিলেন নাটোর মহকুমার কংগ্রেস কমিটির সচিব।

কংগ্রেসী নেতা এলেন তো সপরিবারে। জীবনে করেন নি ব্যবসা। ধানের ক্ষেত তো আর নেই তাই ব্যবসার পরিকল্পনা করলেন। ছিল তার দশ হাজার টাকা। ধানের দেশের লোক তাই বসালেন ধান ছাটাই কল পশ্চিম দিনাজপুরে।

ত্রিশ হাজার টাকার স্কিম করলেন কারণ এর কম অর্থে ব্যবসা চালান যাবে না। আর, এফ, এ-র কাছে চাইলেন ঋণ পঁচিশ হাজার টাকা। প্রায় বাইশ মাস পর মঞ্জুর হ'লো ছ' হাজার টাকা। যদিও রাজ্য শিল্পাধিকর্তা, সংস্থার টেকনিক্যাল উপদেষ্টা, কিন্তু তার মতামত কোনদিনই সংস্থা গ্রাহ্য করে নি। এ ঋণ হ'লো পুনর্বাসন ঋণ। তাই আবেদনকারীর পরিবারের সংখ্যা বিচার করে মাথা পিছু একটি অর্থ বরাদ্দ করে দেওয়া হতো পুনর্বাসনের ঋণ।

বাইশ মাসে তাঁর দশ হাজার টাকা নেমে এসেছে তিন হাজারে। অনাহারের ছায়া দেখে গিরিজাশঙ্কর। চল্লিশ হাজার গিরিজাশঙ্করের গড়পড়তা ছ' হাজার টাকা প্রত্যেকের ছিল ব্যবসাতে বা শিল্পে নিয়োগ করবার জন্য। চল্লিশ হাজারকে ছ' হাজার দিয়ে গুণ দিলে

গুণফল হয় চব্বিশ কোটি। এই চব্বিশ কোটি টাকা খরচ করেছে ঋণের আশায় চল্লিশ হাজার আবেদনকারী মাত্র কয়েক বছরে শুধু নিজেদের বাঁচিয়ে রাখবার জন্য।

গিরিজাশঙ্কর গ্রহণ করলেন ঋণ। স্থাপন করলেন শিল্প। কিন্তু অর্থাভাবে চলে না সুষ্ঠু ভাবে তার শিল্প। আবার আবেদন করলেন ঋণের জন্য।

গিরিজাশঙ্কর আশায় আছেন যে তাঁর কংগ্রেস সরকার তাঁর ব্যবসার অবস্থা বুঝবেন এবং তাকে পুনরায় ঋণ দেবেন।

আশাই দুঃখ। আশা ছিল নিজ দলীয় সরকারের উপর। সেখানেই পেয়েছে আঘাত। সরকার তাঁকে বাঁচবার মত পাথেয় তো দিলই না, আবার পাওনা টাকার জন্য সার্টিফিকেট করে তাঁর ব্যবসা দিয়েছে বন্ধ করে। পাঁচ হাজার পঁয়ত্রিশ জন ঋণীর ভেতর চার হাজারের উপর দায়ের করা হয়েছে মামলা।

† দু' কোটি আশি লক্ষ টাকা দিয়েছে আর, এফ, এ, পাঁচ হাজার পঁয়ত্রিশ জন বাঙ্গালী উদ্বাস্তুকে। গড়পড়তা উদ্বাস্তু পিছু পাঁচ হাজার পাঁচ শত বাষট্টি টাকার একটু কম। এ ঋণের নাম "রিহ্যাবিলিটেসন লোন।" ঋণ দেবার সময় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে পরিবারের সংখ্যার উপর এবং ব্যবসায় কত জন কর্মীর অন্ন সংস্থান হবে তার সংখ্যার উপর। গড়পড়তা প্রতি পরিবারের সভ্য সংখ্যা পাঁচ জন। তা' হলে মাথা পিছু দেওয়া হ'লো এক হাজার একশত বার টাকা। এই পাঁচ হাজার পঁয়ত্রিশ জন ঋণী কর্ম দিয়েছেন কুড়ি হাজার বাঙ্গালী উদ্বাস্তুকে।

সরকারও মাঝে মাঝেই সংবাদপত্রে বড় বড় হিসাব ছাপিয়ে বলেন যে 'বহুৎ বহুৎ রুপেয়া' বাঙ্গালী উদ্বাস্তুর জন্যে খরচ হয়েছে। আর না। সরকারী পরিকল্পনার কল্যাণে হিসাবে কাঁচা আর কেউ

† বর্ত্তমানে ঋণের মোট পরিমাণ প্রায় চার কোটি আটাশ লক্ষ, ও ঋণীর সংখ্যা প্রায় ছ' হাজার।

নেই। হিসাব মিলিয়ে দিচ্ছি। প্রতি ঋণীর পরিবারের সভ্য সংখ্যা পাঁচ তা' হলে পাঁচ হাজার পাঁয়ত্রিশ জন ধনীর পরিবারের মোট সভ্য সংখ্যা পঁচিশ হাজার এক শত পঁচাত্তর। পাঁচ হাজার পঁয়ত্রিশটি ব্যবসা বা শিল্প কর্ম সংস্থান করে কুড়ি হাজার উদ্বাস্তু বাঙ্গালীকে। পঁচিশ হাজার একশত পঁচাত্তরের সাথে কুড়ি হাজার যোগ দিলে ফল হবে পঁয়তাল্লিশ হাজার একশত পঁচাত্তর। ছু'কোটি আশি লক্ষ টাকাকে এই সংখ্যা দিয়ে ভাগ দিলে ভাগফল হবে ছ' শ' এগার টাকার একটু কম। ছ' শ' এগার টাকায় কোন ব্যবসা বা শিল্প যে হয় না তা' জান্‌তেন সংস্থার ভূতপূর্ব প্রধান কর্মকর্তা শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র দাশগুপ্ত। তিনি তাঁর অষ্টম বার্ষিক রিপোর্টে লিখেছিলেন যে কতিপয় পরিবারকে কিছুদিন আরও অর্থ নৈতিক সংগ্রাম করবার জন্য এ ঋণ দেওয়া হয়েছিল।

যদিও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের নিয়ম আছে যে আন্‌স্কিল্ড উদ্বাস্তু নিয়োগ করলে শিল্প বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে মাথাপিছু আর্থিক সাহায্য করে ক্ষতি পূরণ করা হবে কিন্তু আর, এফ, এ-র ঋণিগণ সেইরূপ কোন আর্থিক সাহায্য পান নি তাই আন্‌স্কিল্ড উদ্বাস্তু নিয়োগ করে তাদের ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি হয়েছে।

মঞ্জুর করে নি এই সংস্থা তাপসের আবেদন। তাপসের অপরাধ অতি ভীষণ। তিনি ভারতে আসেন ১৯৪৮ সালে আর আবেদন করেন ১৯৫৬ সালে।

তাপসের অপরাধ ক্ষমাহীন। তিনি কেন পূর্বে আবেদন করেন নি? তিনি জানালেন যে তিন বছর পূর্বে তিনি নিজ অর্থে শিল্প স্থাপন করেছেন এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। এখন হয়েছে অর্থের প্রয়োজন, তাই তিনি এখন আবেদন করেছেন কারণ কোন ব্যাঙ্ক 'ইনস্টল্ড' যন্ত্রপাতির উপর ঋণ দেয় না।

পশ্চিম পাকিস্তানী উদ্বাস্তুদের ক্ষতিপূরণ দেবার পরিকল্পনা চালু হবার সাথে সাথেই আর, এফ, এ-র দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায় সেই সব

বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের কাছে যাঁরা ভারতে এসেছেন ১৯৫৩ সালের পূর্বে।

কেন ?

কেন আবার কি ? সরকারী নিয়ম ! ওদের যখন পুনর্বাসন হয়েছে তখন বাঙ্গালীরও হয়েছে।

কেউ কি ছিলেন না এ অন্যায়ের প্রতিকার করার জন্য ?

সংস্থার বোর্ডই প্রতিবাদ করে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল যে বাঙ্গালী-দের জন্য নেই কোন ক্ষতিপূরণের পরিকল্পনা তাই তাদের জন্য সংস্থার দ্বার সর্বদা খোলা রাখা উচিত। কেবা শোনে কার কথা। ডাঃ রায়ের চেষ্টায় অবশেষে ১৯৫১ সালের ১লা জানুয়ারীর পর যাঁরা ভারতে এসেছেন তারা সংস্থা থেকে ঋণ পাবেন এই স্থির হয়। তাই তাপস বাদ পড়ে যায়।

আর, এফ, এ-র পূর্ণ সুযোগ ছিল পশ্চিম বাংলায় শিল্প বিপ্লব আনবার। অরুণচন্দ্র মন্ত্রী, পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য সচিব, পৃথ্বীশ দাশগুপ্ত প্রধান কর্মকর্তা। তিন জনই পূর্ববঙ্গীয় মধ্যবিত্ত পরিবারের লোক। মেহেরচাঁদের শত ইচ্ছা থাকলেও তিনি সরাসরি কোন শিল্প স্থাপন করবার জন্য অর্থ সাহায্য করতে পারতেন না। রাজ্য সরকারের অনুমোদন ব্যতীত তাঁর কোন কাজ করার ক্ষমতা ছিল না। আর, এফ, এ-র মাধ্যমে অরুণচন্দ্র নতুন বাঙ্গালী সমাজ গড়তে পারতেন। তাঁর সে সুযোগ ছিল।

কি হতো যদি পাঁচ হাজার ছোট শিল্প উদ্বাস্তুরা স্থাপন করতেন পশ্চিম বাংলায় আর, এফ, এ,-র অর্থ সাহায্যে ! কত টাকাই আর খরচ হতো ? পঁচিশ কোটি। অনেক টাকা ? অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাথায় বাজ পড়বে ? অথচ এই অর্থমন্ত্রণালয়ই প্রতি বচ্ছর মঞ্জুর করে প্রায় আট কোটি টাকা, শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের ডোল দেবার জন্য।

বিন্নুর সাথে অর্থমন্ত্রণালয়ের অদ্ভুত মিল সাথে। সেবার প্রেসিডেন্সি জেলের গুলজারবাগে ফুটেছিল সাহিত্যিক, তপস্বী,

পড়ুয়া, খেলোয়াড় সবাই। এক দিবস কতিপয় সাহিত্যিক বন্ধু এক সভায় রবি ঠাকুরের 'শেষের কবিতা' নিয়ে আলোচনা করছিলেন। এমন সময় সভায় বিনুর আবির্ভাব ও আলোচনায় যোগদান।

হুঁঃ, লাবণ্যের অবার একটা চরিত্র! দেহবিলাসিনীরও অধম। রবি ঠাকুর আবার লেখক? সেমিজ পরে ঘুরে বেড়ায়।

এ হেন বাক্য-তুবড়ীর ঘায়ে ঘায়েল হয়ে সাহিত্যিকগণ প্রথমে নির্বাক হন পরে পশ্চাদপসরণ করেন।

কোহিনুরদা ও বিনু শয়ন করতেন এক ঘরে। রাত্রে শয়ন করার পর কোহিনুরদা আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলেন, বিনু আজ যে শেষের কবিতা নিয়ে এত তর্ক করলে, কিন্তু বইটি কবার পড়েছ?

আপনিও ভাল কোহিনুরদা! পড়লে কি আর তর্ক করা যায়?

তাই তো, পড়লে কি আর তর্ক করা যায়? দুর্দশাগ্রস্ত বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের যদি অর্থ মন্ত্রণালয়ের কর্মচারিগণ স্বচক্ষে দেখতেন, তবে কি আর, এফ, এ-র প্রস্তাব নাকচ করতে পারতেন। পৃথ্বীশচন্দ্রকে দোষ দেওয়া যায় না। তিনি অনেক চেষ্টা করেছেন সংস্থাকে সক্রিয় করবার জন্য।

সংস্থা থেকে যাতে সব বাঙ্গালী উদ্বাস্তু সাহায্য পান তার জন্য তিনি চেষ্টা করেছেন। সংস্থার দ্বার ১৯৫১ সালের ১লা জানুয়ারীর পূর্বে আগত বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের নিকট বন্ধ হয়ে যাবার দরুন আবেদন মঞ্জুরীর হার নেমে আসে শতকরা তিনে।

সংস্থা বাঙ্গালীদের গৃহঋণ দেবার অনুমতি চেয়েছিল অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিকট। সেই অনুমতি পাওয়া যায় নি।

পৃথ্বীশচন্দ্র চেষ্টা করেছিলেন এক লক্ষ টাকার অধিক অর্থ সাহায্য দিতে যে সব শিল্প সংস্থা থেকে অর্থ সাহায্য নিয়ে স্থাপিত

হয়েছে। সংস্থার একত্রিশ ধারানুযায়ী এক লক্ষ টাকার অধিক ঋণ দাদন করতে পারা যায় কিন্তু দাদন করবার পূর্বে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমতি প্রয়োজন। ১৯৫৬ সালে একটি শিল্পকে অতিরিক্ত পাঁচ লক্ষ টাকা সংস্থা ঋণ মঞ্জুর করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমতি প্রার্থনা করে টাকা দাদন করবার। সংস্থা তার নিজ অভিজ্ঞতা থেকে অনুভব করেছিল যে উদ্বাস্তু উপনগরীতে উদ্বাস্তুদের দিয়ে মাঝারি ও ছোট শিল্প স্থাপিত হলে উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন হবে। পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের শিল্পকে অর্থ সাহায্য দেবার স্কিমে কোন উদ্বাস্তুই অর্থ গ্রহণ করতে পারে না। কারণ শুধু যন্ত্রপাতির উপর শতকরা পঞ্চাশ ভাগ পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় দাদন করে। বাকী পঞ্চাশ ভাগ দেবার ক্ষমতা উদ্বাস্তুর নেই। তাই পৃথ্বীশচন্দ্র এগিয়ে এসেছিলেন সাহায্য নিয়ে। কিন্তু অনুমতি তিনি পান নি। অথচ তখন সংস্থার তহবিলে সাত কোটি টাকা মজুত। তা' সংস্থা দাদন করতে পারছে না। পৃথ্বীশচন্দ্রের নীতি মেহেরচাঁদ অনুমোদন করেছিলেন।

পৃথ্বিশচন্দ্র যখন কোনদিকেই এগোতে পারছেন না তখন তিনি অতি অল্প টাকার কিস্তিতে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা মঞ্জুর করেন। মাসিক পাঁচ, দশ, পনর টাকাও তিনি গ্রহণ করেন। তাঁর নিজের উপর বিশ্বাস ছিল যে কিছুদিন এভাবে টাকা দেবার পর ঋণ মকুব করবার চেষ্টা তিনি করবেন। অরুণচন্দ্র বা পৃথ্বীশচন্দ্র ভুলে গিয়েছিলেন যে চিরকাল তাঁরা ক্ষমতাবান থাকবেন না। তাই এখন ফল ভুগছেন ঋণিগণ। আইন অনুসারে সংস্থার ঋণ পরিশোধ করবার মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার শেষ দিন ঋণীকে তার সমস্ত অর্থ সুদ সমেত শোধ করতে হবেই। তা' না হ'লে তার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি নিলাম করে "as arrears of land revenue" আদায় করা হবে। শুধু ঋণীই সর্বস্বান্ত হন নি, তার জামিনদারও।

পাকিস্তান থেকে আসবার সময় কেউ জমিনদার:নিয়ে আসেন নি। জমিনদার হয়েছেন, সাধারণত, ঋণিগণের আত্মীয় স্বজন যাঁরা প্রায়

সবাই ক্ষুদে সরকারী কর্মচারী বা পশ্চিমবঙ্গে সামান্য স্থাবর সম্পত্তির মালিক। এহেন একজন স্থাবর সম্পত্তিবান জমিনদারের দক্ষিণ কোলকাতার মহিম হালদার স্ট্রীটের বাড়ীটি "as arrears of land revenue" মাত্র আঠার হাজার টাকায় নিলাম করে পুনর্বাসন অর্থ সংস্থা ছুটি পরিবারের স্বর্গীয় পুনর্বাসনের রমণীয় ব্যবস্থা করেছে।

পৃথ্বীশচন্দ্র অবসর গ্রহণ করবার পূর্বে অষ্টম বার্ষিক রিপোর্ট লেখেন। অনেক সত্যি কথার ভেতর তিনি একটি ভুল তথ্য লিখেছেন। সেটি হ'লো যে কোলকাতার শাখা কার্যালয়ের কর্মচারিগণ প্রায়ই অসাধু।

দুঃখ হয় বেচারা পঙ্কজের জন্য। ফরিদপুর ছিল বাড়ি। যুগান্তর দলের একজন কর্মী (অরুণচন্দ্র এই দলেরই ছিলেন একজন নেতা)। কারাবাস করেছেন বহু বছর। আইন পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। দেশ সেবার রোগটি না থাকলে মুন্সেফ তাঁর আটকায় কে?

এলেন তো ভারতে। চাকুরী পেলেন পুনর্বাসন অর্থ সংস্থায়। পদ সাব-ইন্সপেক্টর।

আমি বহু অনুসন্ধান করেছি ঋণিগণের নিকট এবং বিফল মনোরথ আবেদনকারিগণের নিকট। কেউ সংস্থার কোলকাতার শাখার কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ করেন নি।

তাই দুঃখ হয় পঙ্কজ ও তাঁর সহকর্মীদের জন্য। মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী তায় আবার উদ্বাস্তু চাকুরীজীবি। মুখ বুজে কিল হজম করা ছাড়া উপায় নেই। তা' না হ'লে বিষ ওদের কলমেও আছে; না হ'লে এত আবেদনপত্র নাকচ হয়!

পৃথ্বীশচন্দ্রের পর এলেন হাজারী। ইনিও মন্ত্রণালয়ের অবসর-প্রাপ্ত কর্মচারী। তিনি কাবুলীওয়ালার ভূমিকা অভিনয় করলেন।

এদিকে সার্টিফিকেট জারী করে সর্বস্ব নিলাম করে টাকা আদায়, অন্যদিকে আবেদনপত্র নাকচ করা এই ছিল তাঁর নীতি।

এই সংস্থাটির সবচেয়ে দুর্বল স্থান হ'লো তার প্রধান কর্মকর্তা যিনি হলেন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী এবং তাঁকে নিয়োগ করা হতো এক বছরের জন্যে। তিনি দিল্লী ছাড়তে পারতেন না কারণ তাঁকে সর্বদাই চাকুরীর মেয়াদ বাড়াবার জন্যে তদ্‌বির করতে হতো।

মেহেরচাঁদ নতুন আর একটি সংস্থা স্থাপন করেছেন। নাম তার রিহ্যাবিলিটেসন্ ইনডাস্ট্রিজ করপোরেশন। পুনর্বাসন অর্থ সংস্থার হ'লো মৃত্যু। প্রথম হাজারী মহাশয়ই শব পাহারা দিচ্ছিলেন, অর্থমন্ত্রণালয় বর্তমানে নিজেই দিচ্ছে।

অনেকদিন পূর্বে জাপান চীন যুদ্ধের একটি ছায়াচিত্র দেখেছিলুম। জাপানীরা অগ্রসর হচ্চে আর চীনারা পালাচ্ছে। পালাবার সময় ওরা ছোট ছোট শিল্পের যন্ত্রপাতি বয়ে নিয়ে অন্য স্থানে আবার বসাচ্ছে। দুর্গাপুরের লোহ কারখানা এক বোমায় খতম হয়ে যাবে কিন্তু পুলিন রানা তার লেদ্ দুখানা খুলে নিয়ে গরুর গাড়ীতে চাপিয়ে অন্য কোথাও বসাতে পারবে।

অরুণচন্দ্রের সুযোগ এসেছিল বাংলাকে ফিরিয়ে দিতে তার কুটির শিল্প। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে যে তিনি তা' পারেন নি; হয় তাঁর এই বৃহৎ দায়িত্ব নেবার ক্ষমতা ছিল না, নয়তো হীন রাজনীতির চক্রে পড়ে তিনি তা' করতে পারেন নি। কিন্তু সময় কাউকে ক্ষমা করে না। অরুণচন্দ্রকেও করে নি। তাই তিনি আর মন্ত্রীর দায়িত্ব পান নি।

তোরা কেউ কিছু জানিস্ না।

দাদা! সতীশ ঠাকুরের কথা মনে এলো।

সতীশ আবার কি জানে?

সতীশ চক্রবর্তী যুগান্তর দলের একজন পুরাতন কর্মী। তাঁর অভ্যাস ছিল ইংরেজীতে কথা বলার। বিদ্যার দৌড় ছিল বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত।

বর্মা রিফুউজি যখন আসছিল ভারতে তখন আমাদের শহরের রেল-ষ্টেশনে তাদের খাবার জন্যে একটি রন্ধনশালা খোলা হয়। জেলা জজ ডাঃ ওয়েট সভাপতি ও সতীশ ঠাকুর কিচেন-ইন্-চার্জ। এক দুপুরে আমরা ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে আছি। সতীশ ঠাকুর ও ডাঃ ওয়েট কথা বলতে বলতে পাইচারী করছিলেন। আমরা কেউ কাছে যাই নি সতীশদা যা'তে বিরক্ত না হন। ক্ষণকাল পরে সতীশদা ফিরে এলেন আমাদের কাছে। আমরা জিজ্ঞাসা করলুম ডাঃ ওয়েট কি বললেন ?

দুর্! আজকালকার সাহেবরা আবার ইংরেজী জানে না, উত্তরিলেন সতীশদা।

কেন ? কেন ?

আধাঘণ্টা ইংরেজীতে কথা বললুম, তারপর সাহেব বলে কিনা 'আপনি বাংলায় বলুন, আমি বাংলা বুঝি।'*

*বর্তমানে আর, এফ, এ-র পূর্ব বঙ্গীয় উদ্বাস্তুদের দাদনের মোট পরিমাণ চার কোটি আটাশ লক্ষ টাকা এবং ঋণীর সংখ্যা প্রায় ছয় হাজার।

"ডাঃ গোয়েবেলস্ তো শিশু. বললেন গুহকদা।

কার তুলনায় ?

তোদের ভারতীয় সঞ্জয়ের তুলনায়।

১৯৫৪ সাল থেকে একটি হীন প্রচার কার্য চলতে থাকে যে বাঙ্গালী উদ্বাস্তুরা অলস, কর্মে বিমুখ ইত্যাদি।

ভাবটি এরকম যে সরকার ওদের জন্য সবই করেছেন। ওরাই কেবল কুঁড়েমি করে সব খুইয়েছে, বললেন গুহকদা।

কিন্তু সঞ্জয়ের প্রচার বিদ্যায় জোর দখল, বললেন কুশল।

তাই তো বললুম যে ডাঃ গোয়েবেলস্ লজ্জা পেয়ে গেছেন।

বলিস্ কি ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। ১৯৫৯ সালের মে মাসে দিল্লীর নিকটে পশ্চিম পাকিস্তানী উদ্বাস্তুদের জন্যে সরকারী অর্থে নির্মিত একটি উপ-নগরীর ভিত্তি স্থাপন করবার সময় তিনি উক্তি করেন যে, বাঙ্গালী উদ্বাস্তুরা অলস ও দেশের বোঝা, বললেন কুশল।

কঠিন রাজনীতি। বোঝা দায়।

রাজনীতি! তা ঠিক। প্রধানমন্ত্রী যে দিবস এ উক্তি করেন সেই দিবসই তস্য কন্যা ইন্দিরা, কংগ্রেস সভানেত্রী হিসাবে, পশ্চিমবঙ্গ রাজনৈতিক সম্মেলনে ভাষণ দান করে বাঙ্গালী উদ্বাস্তু-দের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন, বললেন কুশল।

তিনিও করছেন রাজনীতি।

হ্যাঁ, পড়তো যদি মুকুলরানীর পাল্লায়, তবে থেমে যেত সব রাজনৈতিক বুলি, বললেন কুশল।

মুকুলরানী আবার কে ?

শেয়ালদা ষ্টেশনে বুঝি যান নি কোনদিন, তাই জিজ্ঞাসা

করছেন মুকুলরানী কে ? ওখানে পদার্পণ করলেই দর্শন পাবেন কাগজের ঠোঙ্গার কারখানার আর তার পরিচালিকা মুকুলরানীর। তার এমনিই প্রতাপ যে তার স্বামীর নাম পর্যন্ত প্রতিবেশীরা ভুলে গেছে। তিনি মুক্‌লীর স্বামী নামেই পরিচিত, বললেন কুশল।

তারপর ?

এসেছিলেন দিনাজপুর থেকে, রপ্তানি করা হয়েছিল বিহারের কোন শিবিরে। ফিরে এসে আশ্রয় নেন শিয়ালদ স্টেশনের প্লাটফর্মে। স্বামী অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় ঘুরতে লাগলেন। গেঁয়ো লোক, তখনও অসৎ পথ চেনেন নি। দিনাজপুরীয়া লোক, কাটারীভোগ চালে গড়া দেহ। দেহের কল্যাণে পেয়ে গেলেন রোজগারের পথ।

কোন পথ ?

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সহযোগিতার পথ। ব্লাড ব্যাঙ্ক খোলা হয়েছে, তার চাহিদা রক্তের। চাই ভাল তাজা রক্ত। দিনাজ-পুরিয়া রক্ত অতীব সতেজ। নতুন পড়শীদের পরামর্শে মুক্‌লীর স্বামী আবিষ্কার করলেন অর্থ উপার্জনের অতি সহজ ও সৎ পন্থা। বিনে পয়সায় দান নয়। দানের পরিবর্তে অর্থ।

মুকুলরানী বাধা দেয় নি ?

আরে ও তো আর চাকুরীয়ার বৌ নয় যে স্বামীর গোলামীর হিসাব রাখ্‌বে ? এরা হল গৃহস্থের বধূ। কত ধানে কত চাল হয় তার হিসাব এরা রাখে নি। মরুভূমিতে এসেও অভ্যাস বদ্‌লায় নি। খবর রাখ্‌তো না স্বামীর রোজগারের পন্থাটি। অভাব অনটনে থাক্‌লে কি হবে বাঙ্গাল স্ত্রী-র প্রখর নজর স্বামীর স্বাস্থ্য ও মেজাজের দিকে। মুক্‌লী লক্ষ্য করল যে তাঁর স্বামীর স্বাস্থ্য অতি দ্রুত ভেঙ্গে যাচ্ছে। স্ত্রী-র মনে অমঙ্গল চিন্তা আগে আসে। স্বামীর কাছ থেকে কারণ জানলেন।

তারপর কি অশ্রু ?

অশ্রুর সাথে ওদের বৈরিতা। বিপদে বাঙ্গাল-বধূদের কে যেন নির্ভীক করে। সমস্ত সংসারের দায়িত্ব মাথায় করে নেয়। বধূ হয় মাতা। শক্তি দান করে পুরুষদের। মুকুলরানী বধূ থেকে হল মাতা। তার দিনাজপুরীয়া জিহ্বা হ'লো আরও ক্ষুরধার। অর্থ উপার্জনের পথ নিজেই বেছে নিল। স্বামী ও দুই সন্তানসহ লেগে গেল ঠোঙ্গা তৈরীর কাজে। সন্তানের লেখাপড়ার কথাও ভোলে নি। ষ্টেশনের ফুটপাতের উপর স্কুল খুলেছে তাঁরই এক প্রতিবেশী। সেই স্কুলেই মুকুলরানীর ছেলেরা পড়ে। মাহিনা মাসে চার আনা।

অকৃতকার্যতা ও অমানুষতা লুকোবার জন্য মিথ্যার বেসাতী করছে ভারত সরকার। আর এই মিথ্যাই কয়েক বছর পর, যখন পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় লুপ্ত হবে, উদ্বাস্তু বাঙ্গালীর সরকার-প্রকাশিত ইতিহাসে পরিণত হবে।

সরকারী হিসাব মত, যে হিসাব নেওয়া হয় ১৯৫২ সালে বা তার কিছু পূর্বে কি পরে, পশ্চিমবঙ্গে বত্রিশ লক্ষ বাঙ্গালী উদ্বাস্তুর বাস। তার ভেতর প্রায় তিন লক্ষ বাস করেন শিবিরে, বাদ বাকী বাইরে। এদের দায়িত্ব কোন সরকার নেয় নি। নিজের চেষ্টায় এরা বেঁচে আছেন।

বেঁচে আছেন বিনয়। বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজ বিনয়দের নিয়ে গড়া। ওদের বলা হয় মধ্যবিত্ত। ওরাই ছিল একদিন সারা ভারতের মাথার মণি। আর এখন ?

বাঙ্গালী।

বাঙ্গালী, বললেন গুহকদা।

পারেন না চুরি করতে কারণ ওঁদের শিক্ষা আর সমাজ, আবার

শিক্ষা ও মর্যাদাবোধের সংকোচের জন্যে ভিক্ষাও করতে পারেন না। কিন্তু ধর্মের নামে দিনের পর দিন উপোস করতে পারেন।

দেশটি হারিয়ে বিনয় এলেন ভারতে। অতি কষ্টে মাথা গোঁজবার ঠাঁই পেলেন একটি ভাড়াটে বাড়ীতে। পরিবারের সভ্য সংখ্যা সাত। যুবক বিনয়ের উপর দায়িত্ব সংসার প্রতিপালনের। বহু চেষ্টার পর পেলেন বেসরকারী অফিসে কেরাণীর কাজ। পারিশ্রমিক মাসে এক শ' সাতাশী টাকা।

বিনয় বাড়ী ভাড়া দেন মাসিক ত্রিশ টাকা, চাল, ডাল ইত্যাদি কেনেন এক শ' কুড়ি টাকা, ভাইদের শিক্ষার ব্যয় কুড়ি টাকা, যাতায়াত খরচ পনর টাকা, আর গুড়ো দুধ দু'টাকা। দেনা হয় প্রতি মাসে।

ধার ওদের দেয় কে? ভারত সরকারের মত ওদের তো আর 'ফেভারড নেশন' নেই, বললেন গুহকদা।

চাক্‌রে বাবু তাই মুদি ফেভারড নেশন হয়েছে, জবাব দিলেন কুশল।

এ শুধু বিনয়ের ইতিহাস নয়। এ হ'লো সমস্ত বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত সমাজের ইতিহাস যে সমাজ আজও নিজেদের দারিদ্র লুকোবার জন্যে ধোপদুরস্ত জামা কাপড় পরে রাস্তায় বের হন। কিন্তু উপার্জন একজন দিন-মজুরের চেয়েও কম।

দুধ ওরা খায় না। পূর্ববঙ্গের ছেলেমেয়ে ওরা। ওদেরই পূর্বপুরুষের দেহ গঠিত হয়েছে মাছে দুধে।

ষষ্ঠী পূজোর পরদিবস বসে আছি বন্ধুবর সোহনলালের ক্রশ ষ্ট্রীটের গদিতে। এক ফেরিওয়ালা ল্যাংড়া আম নিয়ে এ'লো। দাম চাই'লো দেড় টাকা ডজন।

আমি বল্‌লুম ষষ্ঠীপূজার পূর্বদিন কিনেছি এক টাকা ডজন, আর

আজ দেড় টাকা। সোহনলাল বললেন, বাঙ্গালী আম খাবে কি ? তাদের পয়সা আছে ?

যদিও ঠাট্টা করে কথাটি বলেছিলেন বন্ধুবর, কিন্তু আমার মর্মে বিঁধে গেছে। সত্যিই তো আম আজ আমাদের কাছে বাবুয়ানী, যদিও প্রচুর আম জন্মায় মালদহে আর মুর্শিদাবাদে। ভাগ্য গেছে পাল্টে। রাজস্থানী কাঁইয়ারা খাবে আম আর আমরা দেখ্‌বো।

দেখ হারু ভূমিদাস। শিবিরে থাক্‌তে রাজী হন নি। কিছু অর্থ নিয়ে পাড়ি দিয়েছিলেন। কয়েক বিঘে জমি কিন্‌লেন নবদ্বীপের কাছে। সোনা ফল্‌লো জমিতে। পাট, ধান, কলাই।

আনন্দে হাসে গৃহস্থবধূ ধানের ক্ষেত্‌ দেখে।

আনন্দে হাসে ভারত সরকার পাটের ক্ষেত্‌ দেখে, বললেন গুহকদা।

হারু ভূমিদাসদের দৌলতে ভারত আজ পাটে স্বয়ংসম্পূর্ণ। ১৯৫৭ সালে বিদেশে পাট রপ্তানি করে ভারত প্রায় একশ' চৌদ্দ কোটি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে, বললেন কুশল।

কল্যাণ দেন আবগারী কর প্রতি মাসে প্রায় দশ হাজার টাকা তাঁর বিদ্যুৎচালিত তাঁতের মিল থেকে। মিলটি নদীয়া জেলার ফুলিয়া উপনগরীতে স্থাপিত।

শত শত কল্যাণ বসিয়েছেন শত শত ক্ষুদ্র শিল্প তার কোন খোঁজ রাখে না পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়।

খোঁজ নিলেই তো ওদের সঞ্জয়কে সত্য ভাষণ দিতে হবে, বললেন গুহকদা।

উঁইপোকা আর সাপ বাস করতো যে জমিতে সেই জমির দাম হ'লো আড়াই হাজার টাকা প্রতি একর, উদ্বাস্তুর কল্যাণে, বললেন কুশল।

ফুলিয়া উপনগরী যে জমিতে স্থাপিত করেছেন সুরেন্দ্রকুমার দে, সেই জমি সরকার ক্রয় করে একশ' আশি টাকায় প্রতি একর। ম্যালেরিয়া বিতাড়িত করেছিল মানুষকে; বাসস্থান হয়েছিল উঁই পোকা আর সাপের। সেই জমিই সরকার বিক্রয় করেন আড়াই হাজার টাকা প্রতি একর।

অজগর ঐ আসছে তেড়ে আর নয় রে! বাঙ্গালদের জ্বালায় অজগর হয়েছে উদ্বাস্তু, বললেন গুহকদা।

উদ্বাস্তু হয়েছে অশিক্ষিত।

মণীন্দ্রলোচন এবং তাঁর সহকর্মী অনেকে সরকারী কর্মচারী "অপসন্" দিয়ে পশ্চিম বাংলায় আসেন। তাঁদের পোস্ট করা হয় সিউড়ীতে। সিউড়ী বীরভূম জেলার প্রধান শহর। ১৯৪৮ সালের কথা। মণীন্দ্রলোচন এবং তাঁর সহকর্মিগণ পরিবার সঙ্গে নিয়ে গেছেন কর্মস্থলে। ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য উপযুক্ত বিদ্যালয়ের অভাবে তাঁরা সংকটের সম্মুখীন হলেন। শহরে মেয়েদের বিদ্যালয় মাত্র একটি তাও আবার ছাত্রীর অভাবে প্রায় অচল। মণীন্দ্রলোচন এবং তাঁর সহকর্মিগণ বিদ্যালয়টির অচল অবস্থার অবসান করেন।

সরকারী স্ট্যাটিস্‌টিকস্ অনুযায়ী বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের ভেতর শত-করা আশি জন লেখাপড়া জানেন। বিদ্যালয়হীন স্থানের কথা তাঁরা ভাব্‌তেই পারেন না। তাই পশ্চিম বাংলার দূরতম পল্লীতে পর্যন্ত আজ শিক্ষার প্রসার হয়েছে।

সরকারী প্রেসনোটে লিখিত হয়েছে যে তিনশ' চল্লিশটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল পশ্চিমবঙ্গে ১৯৪৯-৫০ সালে। আর ১৯৬০-৬১ সালে সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে তেরশত' পঁচাশি। কেন্দ্রীয়

পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় মোট সাহায্য দিয়েছে পাঁচ কোটি বাইশ লক্ষ টাকা।

শিক্ষার সাথে রাজনীতির গভীর মিতালী। অনিল চৌধুরী কিরণশঙ্করের মৃত্যুর পর শিক্ষকতা গ্রহণ করে কর্মস্থল। করলেন পশ্চিম দিনাজপুরের একটি গণ্ড গ্রাম যেখানে শিক্ষার আলোক পৌঁছয় নি। অনিল ছিলেন রাজনৈতিক কর্মী। বহুদিন কারাগারে ছিলেন।

ঐ গণ্ডগ্রামে তিনি শিক্ষাকতার কাজ নিয়ে যান। স্থাপন করেন কংগ্রেস। নিজে ওখান থেকে পশ্চিম বাংলা কংগ্রেস কমিটির সভ্য নির্বাচিত হন। সারা পশ্চিম বাংলায় রাজনৈতিক চেতনা এনেছে উদ্বাস্তুরা।

কোলকাতাকে রক্ষা করেছেন কেন্দ্রীয় সরকারের সরাসরি শাসন থেকে উদ্বাস্তুরা। স্বাধীনতার সুধাটি পান করেছে কোলকাতার অবাঙ্গালী বণিককুল। ওদের অংশীদার ইংরেজ বণিককুল। কোলকাতার উপর ওদের চিরকালের লোভ। নগরীটিকে ক্রয় করবার ফন্দী আটলো। কি করে কেনা যায় ওরা জানে। ক্রয় করার মূল্য হ'লো নগরীতে অবাঙ্গালীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা। কাগজপত্রে বোধহয় তা' করেও দিল। কিন্তু বিধি বাম। ১৯৫০ সালে বন্যার মত বাঙ্গালী উদ্বাস্তু এসে ভরে গেল কোলকাতা। তাদের দাপট ও তেজ দেখে সাহস পেল না কেন্দ্রীয় সরকার।

সাহস তো পেল না, বলেই তুই খালাস। কিন্তু কচ্ছপের মত কি রকম পায়ে পায়ে এগুচ্ছে জানিস্ ?

না তো।

গণতান্ত্রিক দেশে ফাইল তৈরী না করলে কোন কাজ হয় না জানিস্ ?

জানি।

ফাইল তৈরী হচ্চে। এক মন্ত্রী বলছেন কোলকাতা মৃত শহর

আর একজন বলছেন কোলকাতা শোভাযাত্রার শহর। ফাইলে লেখা হ'লো যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোলকাতার আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারেন না।

আবার আর এক দেড়-পোয়া-মন্ত্রী এসে বললেন যে, কোলকাতা সবচেয়ে নোংরা শহর। বিদেশীদের দেখাতে লজ্জা করে। ফাইলে লেখা হ'লো পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোলকাতার স্বাস্থ্য-রক্ষা কোরতে পারেন নি।

সুতরাং কৈফিয়ত তলব কর কেন, উক্ত শহর কেন্দ্র কর্তৃক শাসিত হবে না?

আজ যদি কবিগুরু জীবিত থাকতেন তবে তিনি নিশ্চয় ময়দানে দাঁড়িয়ে বলতেন, যেমন তিনি বলেছিলেন কোলকাতার টাউনহলের সভায় সভাপতিরূপে, 'যেখানে নির্বিচক অপমান ও অপঘাতে পীড়িত হওয়া দেশের লোকের পক্ষে এত সহজ অথচ যেখানে যথোচিত বিচারের ও অন্যায় প্রতিকারের আশা এত বাধাগ্রস্ত, যেখানে প্রজারক্ষার দায়িত্ব যাদের পরে সেই সব শাসনকর্তার এবং তাদেরই আত্মীয় কুটুম্বদের শ্রেয়োবুদ্ধি কলুষিত হবেই এবং সেখানে ভদ্র জাতীয় রাষ্ট্রবিধির ভিত্তি জীর্ণ না হয়ে থাকতে পারে না।'

কবিগুরু নেই। তাই আমরা এইসা ল্যাং দেব, যার নাম ময়দানী ল্যাং, বললেন সত্য বিশ্বাস।

ময়দানী ল্যাং আবার কিরে? তা' তো কখনও শুনি নি।

তবে, দাদা, শুনুন। পার্ক স্ট্রীট আর চৌরঙ্গীর মোড়ে দেখেছ গান্ধী মূর্তি?

দেখেছি।

অনুভব করেছেন কি নেতাজীভক্তদের মর্ম ব্যথা? গান্ধীর চেলাগণ নেতাজীর অনুচরদের হারিয়ে ঐ স্থান নির্বাচিত

কর্‌লেন গান্ধী-মূর্তি স্থাপনের জন্য। অলক্ষ্যে হাসেন অন্তর্যামী বললেন সত্য।

আমাদের বুদ্ধ-মূর্তির কথাই ধরুন। ছিলেন রাজপুত্র, সুন্দর ছিল তাঁর মুখমণ্ডল। সেই বুদ্ধের মূর্তি জাপানীরা তৈরি করেছেন একরকম, চীনারা অন্যরকম, ভারতীয়রা আর এক রকম। যে দেশের ভাস্কর যে রকম কল্পনা করেছেন সেই রকম তৈরি করেছেন ভগবান তথাগতের মূর্তি। এই কল্পনা দানা বাঁধে দেশ, কাল ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর।

অনাহারে, অর্ধাহারে কঙ্কালসার, যৌবনে বৃদ্ধ বাঙ্গালী। গাত্রাবরণ হয়েছে অঙ্গার বর্ণ। মুখের ভাব দেখ্‌লে মনে হয় প্রতিহিংসাপরায়ণ।

নধর কান্তি, গৌর বর্ণ, সদাপ্রফুল্ল গান্ধী হয়েছেন কঙ্কালসার, অঙ্গারবর্ণ, কুব্জ ও বিষাদ বদন পঞ্চাশ বছর পর যদি কেউ গান্ধীর নামটি মুছে দেন তবে তৎকালীন ছেলেমেয়েরা ভাব্‌বে স্বাধীনতার মূল্যদাতা বাঙ্গালীর প্রতিমূর্তি। এই নিখুঁৎ ভাস্কর্যের জন্য তারা করবে শ্রদ্ধা ভাস্করকে।

কিন্তু শুনেছি যে আর্টের দিক থেকে ঐ রং খুব উচ্চ পর্যায়ের, বললেন কুশল।

মূর্তি দেখ্‌লে ছোট ছেলেমেয়েরা আঁত্‌কে উঠে। এর নাম আর্ট নয়, ল্যাং। কুপিত হয়ে, বললেন সত্যচরণ।

## নতুন যীশু

একটা পয়সা দ্যান্, এ তো জাত ভিক্ষুকের চাওয়া নয়। ফিরে তাকালুম। বয়স অনুমান করা যায় না। বাহুতে তার সুন্দর গৌরকান্তি শিশু। জিজ্ঞাসা করলুম, দেশ কোথায় ছিল!

পাকিস্তান।

পাকিস্তান তো বুঝলুম। কিন্তু কোন্ জেলা?

ঢাকা।

কোন্ মহকুমা?

মাণিকগঞ্জ।

কোন্ গ্রাম?

আপ্নে সব গ্রাম চেনেন?

প্রায় সবগুলিই চিনি।

সিঙ্গাইর।

কি নাম আপনার?

শ্রীমতি শান্তিরানী দেবী।

ব্রাহ্মণ?

আইজ্ঞ্যা।

স্বামী কোথায়?

চোখ নামালেন শান্তিরাণী। বললেন ১৯৫১ সালে স্বামী তাঁকে ও এক কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে চলে আসেন কোলকাতায়। পশ্চিমবঙ্গে নেই কোন চেনাজানা লোক। আর পূর্বে কখনও আসেন নি মহানগরীতে। তাই আশ্রয় নিলেন শিয়ালদ ষ্টেশনের প্লাটফর্মে। যখন এখানে আসেন তখন তিনি গর্ভবতী।

দেশে তাঁদের ছিল পাঁচ বিঘে ধানের জমি। চারটি গাভী, আর

একটি টিনের ছাদওয়ালা বাড়ী। কয়েক ঘর যজমান ছিল। ক্ষেতের ধান, বাড়ীর গরুর দুধ আর যজমানদের বাড়ীতে পূজার্চা করে সুখেই কাটছিল দিন।

দেশ হ'লো ভাগ। অরাজকতার হ'লো রাজত্ব। পুলিশের কাছে নালিশ করলে তারা দেখিয়ে দেয় নেহেরুকে আর বলে যে শরিয়ৎ মতে কাফেরকে রক্ষা করা মুসলমান পুলিশের ধর্ম নয়। কাফের নারীর নেই কোন সম্মান পাকিস্তানে, তাই বাধ্য হ'লো শান্তিরানী শ্বশুরের ভিটা ত্যাগ করতে।

শিয়ালদ ষ্টেশনে তিন চারি দিন অবস্থান করার পর তাঁর স্বামী ফিরে গেলেন আবার দেশে। জমি, বাড়ী, গরু বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ করবার জন্য। স্বামী আর ফিরে এলেন না বা তাঁর কোন সংবাদও তিনি পান নি।

পূর্ব বাংলার পল্লীবধূ শান্তিরানী, জীবনে অনাহার কাকে বলে জান্‌তেন না, দেশের বাড়ীর বাইরে কখনও যান নি, আজ অসহায়, কপর্দকহীনা, গৃহহীনা, একটি কন্যাসহ, আর একটি শিশু জঠরে নিয়ে দিনের পর দিন স্বামীর জন্যে অপেক্ষা করছেন শিয়ালদ ষ্টেশনের প্লাটফর্মে। ছিলেন ব্রাহ্মণ কুলবধূ একদিনে হলেন ভিখারী—কি মূল্যই না দিয়েছেন শান্তিরানী স্বাধীনতার জন্যে!

তারপর নতুন প্রতিবেশীদের উপদেশে একদিন গেলেন রাজ্য পুনর্বাসন দপ্তরের অক্‌ল্যাণ্ড রোড্‌ কার্যালয়ে সাহায্যের আশায়। তিনি যে উদ্বাস্তু তার প্রমাণপত্র দেখাতে বলা হ'লো। কাগজ পত্র সবই তো স্বামীর কাছে, তাঁর কাছে কিছু নেই। বোকা গেঁও মেয়ে জানে না যে সরকার শুধু কাগজপত্রের দাম দেয়। মানুষের কোন মূল্য নেই। বিফল মনোরথে ফিরলেন একদার পল্লীবধূ।

একরাতে নতুন যীশুর হ'লো আগমন। আস্তাবলে নয়, শিয়ালদ ষ্টেশনের আঙ্গিনাতে। ভারতের ব্রাহ্মণ শ্রেণীভুক্ত হ'লো আর একটি শিশু।

কি শিক্ষা পাবে এ শিশু ! ওর পিতামাতার ত্যাগকে ভারত করে নি সম্মান, তাঁরা হয়েছে অবহেলিত, হয়েছে অপমানিত। কত হাজার হাজার নতুন যীশুর জন্ম হচ্চে কেবা রাখে তার খবর ?

শেয়ালদ ষ্টেশনই তো বামপন্থী রাজনীতিবিদ্‌দের প্রধান সৈন্য শিবির, বললেন কুশল।

কংগ্রেস যৌতুক দিয়েছে উদ্বাস্তুদের কমিউনিষ্টদের হাতে, বললেন গুহকদা।

আমার এক কমিউনিষ্ট বন্ধু বলেছিলেন, যে তাঁরা উদ্বাস্তুদের সমর্থন পেয়েছেন শুধু কংগ্রেসের ভুলের জন্য।

এ ভুলের সন্ধান নিতে হলে যেতে হবে সাত নম্বর যন্তর মন্তর রোডে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কার্যালয়ে।

সাল ১৯৫০। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি বিলোপ হ'লো। জন্ম হ'লো পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত প্রাদেশিক কমিটির সভ্যগণ হারালেন তাদের আসন, কারণ তাঁরা যে ভূমিখণ্ড থেকে নির্বাচিত হয়েছেন তাহা এখন পররাজ্য। অনেক সৎ ও কর্মঠ কর্মী কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গিয়ে যোগ দেন কমিউনিষ্ট দলে। আবার অনেকে বুড়ো শিব হয়ে রইলেন।

উদ্বাস্তুদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের দায়িত্ব ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের উপর। তেমনি নৈতিক পুনর্বাসনের দায়িত্ব ছিল কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় দপ্তরের উপর। কংগ্রেস অনুরক্ত উদ্বাস্তুগণ প্রস্তাব করেছিলেন, ১৯৫৩-৫৪ সালে, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির একজন সাধারণ সচিবকে সভাপতি করে বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের সাহায্য কল্পে একটি উপসমিতি গঠন করবার জন্য। এই উপসমিতি সরকারকে করবে সাহায্য, আবার শান্তিরানীর মত সহায়হীনা পল্লীবধূকে করবে সাহায্য। সরকারী কর্মচারী শান্তিরানীকে সাহায্য দান করতে পারেন না, কারণ যে সার্ভিস্-রুলের বলে তাদের চাকুরী, সেই সার্ভিস্-রুলকে শান্তিরানীর জন্য লঙ্ঘন

করলে তাঁদের চাকুরী হবে খতম। লঙ্ঘন করতে পারেন মন্ত্রী, যিনি কংগ্রেস দলের মনোনীত ব্যক্তি এবং কংগ্রেসের নির্দেশানুযায়ী দপ্তর পরিচালনা করতে বাধ্য।

বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের পাঠান হয়েছিল ভারতের নানা রাজ্যে যেখানে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের বা সরকারের কোন এক্তিয়ার নেই। কিন্তু এ, আই, সি, সি-র এলাকা। মধ্যপ্রদেশ, বিহার ও নানা রাজ্য থেকে উদ্বাস্তু চলে এসে কোলকাতায় পশুর মত জীবন যাপন করছেন। এদের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার বহন করেন নি। কেন এঁরা চলে এলো? কোথায় এঁদের সত্যিকারের অসুবিধা? সরকারের পরিকল্পনার কোন ত্রুটি আছে কি? নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি যদি দায়িত্ব গ্রহণ করতেন তবে সরকারের কাজ অনেক লঘু হ'তো।

যদি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি শান্তির বারি দিয়ে নতুন যীশুদের ব্যাপ্‌টাইজ করতেন তবে মহীরাবণের জন্ম হ'তো না।

উদ্বাস্তুরা শুধু পশ্চিমবঙ্গেই বাস করেন না। তাঁদের পাঠান হয়েছে ভারতের নানাস্থানে, যেখানে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের বা সরকারের কোন এক্তিয়ার নেই। কিন্তু এ, ই, সি, সি-র এলাকা!

নতুন যীশুদের যাতে শান্তির বারি দিয়ে ব্যাপ্‌টাইজ করা যায় তাই অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের সাথে সাথে প্রয়োজন নৈতিক পুনর্বাসন। নৈতিক পুনর্বাসন দিতে পারতো জাতীয় কংগ্রেস। উদ্বাস্তুদের পূর্ণ আস্থা ছিল কংগ্রেসের উপর। অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের দায়িত্ব যেমন কেন্দ্রীয় সরকারের তেমনি কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় সমিতির দায়িত্ব ছিল নৈতিক পুনর্বাসনের।

আমি শুনি পদধ্বনি নতুন যীশুর। "দীন্, দীন্" রবে ছুটে আস্‌ছে নতুন শুদ্রশ্রেণী, গড়ে উঠেছে একদার ভূমি উপস্বত্ব ভোগী শ্রেণী থেকে। নতুন শুদ্রশ্রেণীর কবলে যাচ্ছে ক্ষমতা।

ফুলিয়াতে দেখেছি পঞ্চায়েত, আর তার নব নির্বাচিত সভ্যগণকে। সবাই নতুন শুভ্র। মানুষের দৃষ্টি ভঙ্গি বদলেছে। শহরে বাস করে টাকা খরচ করে গ্রামবাসীর ভোটে বিধানসভায় বা লোকসভায় নির্বাচিত হবার দিন বিদায় নিয়েছে। পঞ্চায়েত দাবি করবে তার নিজের লোককে লোকসভায় বা বিধানসভায় নির্বাচিত করতে।

কেন দেবে ফুলিয়ার অধিবাসী কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজস্ব, উত্তর প্রদেশের যবনীজার-ভাষা হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা করবার জন্য ? এদিকে ফুলিয়ায় বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ বেতন পান না অর্থাভাবের জন্য ?

কেন দেবে বহরমপুরের বিদ্যুৎচালিত তাঁত প্রতি মাসে ত্রিশ হাজার টাকা কেন্দ্রীয় সরকারকে আবগারী কর ? সেই টাকা থেকে কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ সাহায্য করেন আসাম সরকারকে, যা দিয়ে আসাম সরকার বুলেট ক্রয় করে আর সেই বুলেটের ব্যবহার হয় শিলচরে নিরীহ বাঙ্গালীদের দেশাত্মবোধ দমন করবার জন্য।

চেতনা এসেছে ফুলিয়া উপনগরীর পঞ্চায়েত সমিতির মন্নু ব্যানার্জির ও ক্ষিতীশ মুখার্জির। এই চেতনা দান করবার জন্য সুরেন দে-কে ধন্যবাদ।

মন্নু ব্যানার্জি ও ক্ষিতীশ মুখার্জিরই শুধু চেতনা আসে নি, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়েরও চেতনা এসেছে। তিনিই বা কেন দেবেন বাংলার কয়লা ভারত সরকারকে ?

কয়লা কালো কিন্তু লোকে বলে সোনা। এই কালো সোনা পশ্চিমবঙ্গের মাটির তলায় আছে, কিন্তু লাভ খায় ইংরেজ, ভাটিয়া, কাচ্ছি, মারোয়াড়ী, পারশী বণিককুল, আর কেন্দ্রীয় সরকার। আর বাঙ্গালী মুখে মাখে কালি, তাই ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় দাবী তুলেছেন যে তাঁর রাজ্য সরকার কেন তাঁর রাজ্যে কয়লাখনি খুলবেন না এবং উত্তোলন করবেন না ?

কয়লাখনি খুলতে দেবার এবং উত্তোলন করতে দেবার অনুমতি দেবার মালিক হলেন ভারত সরকার।

"বৃহস্পতিবার রাইটার্স বিল্ডিংস্-য়ে রোটাণ্ডা হলে খনি হইতে কয়লা উত্তোলন এবং তৎসংক্রান্ত সমস্যাদি সম্পর্কে তিনদিনব্যাপী অন্তঃরাজ্য সম্মেলন শুরু হয়। ডাঃ রায় সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার দুইটি বে-সরকারী ইস্পাত শিল্পকে শুধু যে তাহাদের নিজেদের কয়লাখনি চালাইবার অনুমতি দিতেছেন তাহা নহে, তাহাদিগকে নিজেদের নূতন খনি প্রতিষ্ঠা করিবার অনুমতি দিয়াছেন। অথচ…কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে তাহাদের স্ব স্ব এলাকার কয়লাখনি খুলিবার ও কয়লা উত্তোলনের অনুমতি দিতে প্রস্তুত নহে।…

১৯৫৬ সালে ভারত সরকারের শিল্পনীতি অনুযায়ী খনি ও কয়লা উত্তোলন ব্যবস্থার উন্নয়নের ভার পাবলিক সেক্টরের জন্য সংরক্ষিত রাখিবার ব্যবস্থা হয়। পাবলিক সেক্টর বুঝিতে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলিকে বুঝায় বলিয়া তিনি মনে করেন। কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে জাতীয় কয়লা উন্নয়ন কর্পোরেশন (এন্-সি-ডি-সি) প্রতিষ্ঠা করেন। এবং তাহাদের অভিমত এই যে উক্ত এন্-সি-ডি-সি-র মাধ্যমেই খনি হইতে কয়লা তুলিবার কার্যাদি করিতে হইবে। তিনি এন্-সি-ডি-সি-কে প্রস্তাব দিয়াছেন যে, যে সমস্ত রাজ্যে কয়লা আছে সেই সব রাজ্যকেই খনি হইতে কয়লা উত্তোলনের ব্যবস্থা করিতে দেওয়া হউক। মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে, এন্-সি-ডি-সি কাহারও বাপের সম্পত্তি নহে। আর কেন্দ্রীয় সরকারের 'পথ ছাড়িব না, আগ্‌লাইয়া রাখিব' এই নীতিও ঠিক নহে।

(আনন্দবাজার পত্রিকা, জানুয়ারী ২৬, ১৯৬২)

The Chief Minister disclosed that he had turned down a request from National Coal Development Corporation that the West Bengal Government should not press its

claim for coal-mining in land that has vested in the State under Estates Acquisition Act and for which it would have to pay compensation to the former intermediaries......

He wondered why State Governments should not be represented on the Coal Board and Coal Council although private interests had their representatives in these bodies.

( The Statesman, January 26, 1962 )

১৯৪৬ সালের নির্বাচনে পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের কেন্দ্র থেকে একটিও অকংগ্রেসী নির্বাচিত হন নি। কংগ্রেসের উপর সম্পূর্ণ আস্থা ছিল বলেই হিন্দুগণ ভোট দিয়ে এলেন নিজভূমিকে পরহস্তে তুলে দিয়ে। সেই কংগ্রেসের উপর বিশ্বাস নিয়ে চলে এলেন এদেশে—ঠিক যেমন করে বিদেশ থেকে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে মানুষ।

নেহেরুর পর হলেন ধেবর কংগ্রেস সভাপতি। কোলকাতায় আসেন, ঘোরেন কিন্তু সাহস হ'লো না একবার শেয়ালদ স্টেশনে গিয়ে দেখ্‌তে যে একদার কংগ্রেস ভোটদাতা, অধুনা স্বাধীন দেশের নাগরিক কিভাবে বাস করে, আর দিনের পর দিন না খেয়ে থাকে।

ষ্টেটস্‌ম্যান লিখেছিল ১৩ই এপ্রিল ১৯৫৭ সালে যে, "ওরা ( শেয়ালদ ষ্টেশনে অবস্থিত উদ্বাস্তুরা ) কি করে যে চলাফেরা করে তাই আশ্চর্য। পুষ্টিকর কোন কিছুই ওরা খায় না, শুধু পাকস্থলী কোন কিছু দিয়ে ভরে রাখে।

অথচ শেয়ালদ ষ্টেশনের দু' মাইল দূরে দাঁড়িয়ে, গলায় ফুলের মালা দিয়ে, গান্ধীর দর্শন ও সেবার আদর্শ নিয়ে বক্তৃতা দিতে, আর লক্ষ টাকার তোড়া গ্রহণ করতে কংগ্রেস সভাপতির দ্বিধা হয় নি একটুও।

নিয়তির কি নির্মম পরিহাস! ধেবর যেদিন সেবা, ত্যাগ ও অহিংসার আদর্শ নিয়ে কোলকাতায় বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, সেই দিনই বরিশাল থেকে আগত রামচন্দ্র হালদারের শব নিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে

বসে ছিলেন তার পরিবারবর্গ শেয়ালদ ষ্টেশনের আঙ্গিনায়। তাদের চিন্তা, কি করে দাহ করবে শব? অর্থ? খেবর অবশ্য সেই দিনই এক লক্ষ টাকার তোড়া গ্রহণ করেছেন সেবার জন্যে। (হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড, আগষ্ট ২৮, ১৯৫৭)

আরও বিচিত্র কারবার হয় শেয়ালদ ষ্টেশনের উদ্বাস্তুদের নিয়ে, যখন আসেন নেহেরু কোলকাতা সফরে।

ইংরেজ রাজত্বকালে কদাচিৎ গভর্নর যেতেন মফঃস্বল শহর দর্শনে। যদি কখনও তাঁর শুভাগমন হতো তবে শহরবাসী হতেন ধন্য, গভর্নরের আগমনের জন্য নয়, পৌরসভার কর্মতৎপরতার জন্যে। রাস্তা, ঘাট, নালা, ডোবা সব হতো পরিষ্কার। মহামান্য গভর্নর শহর দেখে দিতেন প্রসংশাপত্র। তিনি ফিরে যাবার পর আবার যে তিমিরে সেই তিমিরে।

নেহেরু আসবেন তাই পরিষ্কার করতে হবে শেয়ালদ ষ্টেশন। তিনি আবার অপরিষ্কার কিছুই দেখ্‌তে পারেন না। তাই কোলকাতার অন্যান্য আবর্জনার সাথে ট্রাকে তুলে চালান দেওয়া হতো শেয়ালদ ষ্টেশনে অবস্থিত উদ্বাস্তুদের। দুদিন পরেই আবার সবাই ফিরে আস্‌তো।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে যে, সভ্যদেশে, দেশের স্বাধীনতার জন্য যাঁরা আত্মবলি দিয়েছেন, কি করে সর্বসমক্ষে তিলে তিলে না খেয়ে তাঁরা মরেন, আর কি করুণ আর বলিষ্ঠ তাঁদের বাঁচবার আপ্রাণ প্রচেষ্টা।

ঐ আঙ্গিনায় তাঁরা তৈরি করেছেন ঘর যার দৈর্ঘ্য ছ' ফুট, উচ্চতা তিন ফুট। এরকম সব ঘরে প্রায় আট হাজার উদ্বাস্তু বাস করছেন বছরের পর বছর। নিজেরা জীবিকার ব্যবস্থা করেছেন। ছেলে মেয়েদের শিক্ষার জন্যে দুইটি স্কুল করেছেন ওখানে।

কেন ওদের কোন পুনর্বাসন কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় না?

ঠেলাঠেলির ঘর খোদায় রক্ষা কর, ছড়া কাটলেন গুহকদা।

ওটা কার দায়িত্ব? কেন্দ্রীয় সরকারের, না রাজ্য সরকারের

তাই ঠিক নেই। রাজ্য সরকার ওদের দু'বার ভিন্ন স্থানে পাঠিয়েছিলেন। তাতে কয়েক হাজার টাকা খরচ হয়েছিল। সেই টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দিতে নারাজ।

প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ লোক যাতায়াত করেন ঐ রাস্তা দিয়ে। সবাই কি পাষাণ হয়েছেন ?

চামড়া ট্যান কেন করে জানিস্ ?

মজবুত করবার জন্যে।

ওদেরও ওখানে রাখা হয়েছে বাঙ্গালীর ভাবপ্রবণ মনটাকে ট্যান করবার জন্যে। মা বোনের দুঃখ দেখ্লেই তোরা লাফিয়ে উঠ্তিস্। তোদের এখন বিশ্বের মা বোনের চোখের জল মোছাতে হবে। তোরা কি আর ঘরের মায়ায় আট্কে থাক্তে পারিস্? এখন তো আর উদ্বাস্তু দেখ্লে পাকিস্তানের উপর রাগ হয় না ?

না।

তবেই বোঝ্। ওটা হ'লো ট্যানারী।

সর্বগ্রাসী রাহুর কবলে রবি, তাই কাঁদেন মা জানকী।

সমস্ত গণতান্ত্রিক দেশেই রাজনৈতিক দল থাকবে। দলের অর্থ প্রয়োজন। দলকে অর্থ সরবরাহ করে শিল্পপতি ও ভূস্বামিগণ। ইউরোপ ও আমেরিকা শিল্পপ্রধান দেশ। শিল্পপতিগণ রাজনৈতিক দলগুলিকে অর্থ দান করেন। দেশ, জাতি ও শিল্প অভিন্ন।

তাই বলে দলগুলি নিজেদের বিকিয়ে দেয় না শিল্পপতিদের কাছে।

ভারতে প্রাক্-স্বাধীনতার যুগে কংগ্রেসের অর্থ সংগৃহীত হতো জমিদার ও মধ্যবিত্তের সাহায্যে। ছেলেবেলায় দেখেছি যে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী মাটির হাঁড়ি দিয়ে আসতেন। গৃহবধূ প্রতিদিন সেই হাঁড়িতে এক মুঠো চাল রাখতেন। সাতদিনে সাত মুঠো। প্রতি রোববার স্বেচ্ছাসেবকগণ সেই সাত মুঠো চাল নিয়ে যেতেন। এইভাবে গড়ে উঠেছিল ভারতীয় জাতীয়

কংগ্রেস, গৃহস্থবধূ থেকে রাজপ্রাসাদের অধিবাসী সবাইর দানে। কিন্তু এ দানের খবরটি রাখতে হতো গোপন তা' না হলে পড়তো রাজরোষ। এ দানের ছিল না কোন প্রত্যাশা। তাই বাংলা কংগ্রেসে ছিল না কোন বণিকের স্থান।

ভারত হলো স্বাধীন। কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা। বণিক এলো অর্থ সাজিয়ে রাজ সেবার জন্যে। রাহুর গ্রাস।

ভারত বণিকপ্রধান। বণিকের লালসায় তৃপ্তি নেই। অর্থই তার একমাত্র মোক্ষ। তাই যে দেব যাতে সন্তুষ্ট থাকে সেই পূজো দিয়ে সে মোক্ষ লাভ করতে সদাই প্রস্তুত। বণিকশ্রেণী আন্তর্জাতিক।

চা শিল্প ও চা ব্যবসা হাত বদলেছে। অবাঙ্গালী বণিক প্রবেশ করেছে এই ব্যবসাতে। বিদেশে ভারতীয় চা-র খুব চাহিদা ছিল। নতুন বণিক সংগ্রহ করলো চা রপ্তানির পারমিট। মেশাল নানা ভেজাল তারপর সেই চা করলো রপ্তানী। ভারতীয় চা-র চাহিদার গঙ্গাপ্রাপ্তি হ'লো। ইংরেজ বণিক চা বাগান অধিক মূল্যে বেচে সেই টাকা দিয়ে কেনিয়াতে করেছে চা বাগান। সেই কেনিয়ার চা অদূর ভবিষ্যতে দখল করবে ভারতীয় চা-র স্থান।

ভারতীয় খাবার তেলের সারা বিশ্বে চাহিদা ছিল। আমেরিকা থেকে হোয়াইট অয়েল ভারত আমদানি করে। নতুন গান্ধী টুপিওয়ালা বণিক খাবার তেলের সাথে সেই হোয়াইট অয়েল মিশিয়ে রপ্তানি করলো বিদেশে। পিণ্ড দান করা হ'লো ভারতীয় খাবার তেলের রপ্তানি ব্যবসাতে।

এই বণিকশ্রেণী আজ হয়েছে রসদদার। রসদদার জোগাবে রসদ কিন্তু নিজের আখেরটি আগে গুছিয়ে। আখের গোছাবার জন্যে বণিক পশ্চাদপদ হয় না, দেশ বা জাতিকে বলি দিতে।

তা' না হ'লে ওরা খাবারে মেশায় ভেজাল, বললেন গুহকদা।

নানা ভেজাল মিশিয়ে তিলে তিলে জাতিকে করেছে হত্যা, তবুও সরকার তাদের কঠোর হস্তে দমন করে না। কারণ বণিকের অর্থ।

দেখ, ইংরেজ যাবার সময় দিয়ে গেছে তিনটি 'ক', বললেন গুহকদা।

তিনটি 'ক' ?

হাঁ, কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট আর করাপ্‌সন্‌। নিয়ে গেছে তিনটি 'দ'।

কি, কি ?

দরদ, দয়া আর দেশপ্রেম। পূর্ব ভারতের লোক এখনও একটু দেশের কথা ভাবে তার কারণ পাকিস্তানের ভারতবিদ্বেষী রাজনীতি।

তাই কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ ভেবে গান্ধী হলেন শঙ্কিত। তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন যে রাহু এগিয়ে আস্‌ছে সর্বগ্রাস করতে। রাবণ রাহু, শনি তার দ্বারী। নানা স্তব-স্তুতি করে লাভ করলো অমরত্ব। তার অর্থ; লোভ আর দম্ভ এত বেড়ে গেল যে মা জানকীকে হরণ করতে দ্বিধা হ'লো না।

গান্ধী বুঝেছিলেন যে রাবণ, ভারতীয় বণিক আর তার দ্বারী শনি, ইংরেজ বণিক, নানা স্তব-স্তুতি দিয়ে মন গলাবে ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের, তারপর করবে সীতা হরণ। কংগ্রেসের ক্ষমতা থাকবে না রাহুর গ্রাস থেকে ভারতীয় জনগণকে বাঁচাবার। তাই তিনি চেয়েছিলেন কংগ্রেসের বিলোপ।

যা ভবিতব্য তা কে খণ্ডাবে ? সত্যযুগের অস্ত্র এ যুগে অচল। এ যুগের অস্ত্র হ'লো স্বর্ণ, লঙ্কার স্বর্ণ। স্বর্ণ দেওয়া ও নেওয়া লিগালাইসড্‌ হয়ে গেল আইন সংশোধন করে। বেনের ছেলে বাজায় বেণু।

যে ভাণ্ডারী সেই বাজাবে বেণু, বললেন গুহকদা।

ডাঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব ভাণ্ডারীর দাপটে কাত হয়ে মার্চ ২২, ১৯৬১ এক বিবৃতি দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, কংগ্রেস যদিও জনগণের প্রতিষ্ঠান এবং জনগণ দরিদ্র, কাজেই কংগ্রেসও দরিদ্রের মুখপাত্র। তথাপি কংগ্রেসকে সংগঠন ও নির্বাচন পরিচালনার জন্তে ধনির দ্বারস্থ হতে হয়। কিন্তু ধনীরা কংগ্রেসকে যে সাহায্য দেন তা সম্পূর্ণ শর্তহীন নয়। অর্থাৎ ধনীর বন্ধন কংগ্রেসকে জড়িয়ে ধরছে। অথচ অন্যদিকে সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিত্বের খাতিরে তাকে সমাজ-তন্ত্রের প্রতিশ্রুতিও দিতে হচ্ছে। কিন্তু ধনীর শর্তসাপেক্ষ হওয়ায় সেই প্রতিশ্রুতি তার পক্ষে পালন করা দুষ্কর।' ডাঃ মহতাব বলেছেন যে, এই সঙ্কটের মধ্যে কংগ্রেস তার আদর্শের সততা এবং চরিত্রবত্তা কিভাবে বজায় রাখবে সে সম্বন্ধে গভীর চিন্তার প্রয়োজন। তাঁর মতে সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়েছে যে যাঁরা কংগ্রেসের প্রধান ভাণ্ডারী তারা কংগ্রেস কাণ্ডারীও হতে চাচ্ছেন। কিন্তু ভাণ্ডারীদের এই লিপ্সাকে রোধ করবার মত ক্ষমতা প্রকৃত কংগ্রেস কর্মী হারিয়েছে। ( যুগান্তর, মার্চ ১০, ১৯৬১ )

কেউ শুনলে আশ্চর্য হবে না যে ইংরেজ শিল্পপতি কংগ্রেসের তহবিলে অর্থ দিয়ে নিজেদের আখের পূর্ণমাত্রায় গুছিয়ে নিচ্ছে।

তাই কংগ্রেসের আদর্শ হ'লো সোসিয়ালিস্টিক্-প্যাটার্ণ অব্ সোসাইটি, বললেন কুশল।

তোদের এই প্যাটার্ণ বুলিটি শুন্‌লেই আমার মন খারাপ হয়, বললেন চম্পক।

কেন ?

কুড়ি বছর চাকরি জীবনে গত বার পূজার পূর্বে প্রথম বোনাস্ পাই পঞ্চাশ টাকা। টাকা হাতে পেয়েই গৃহাভিমুখে ছুটল বাঙ্গালী। স্ত্রীকে বললুম তুমি যা চাও এবার পূজোয় তোমাকে তাই দেব। মার্‌লেন মুখ ঝাম্‌টা, বাইশ বছর বিয়ে হয়েছে—কোন দিন একটা ন্যাক্‌ড়া দাও নি, আর আজ সোহাগ উথলে উঠলো। বেচারা আমি ! মধ্যবিত্ত একান্নবর্তী পরিবারের ছেলে। স্ত্রীকে

বিশেষ কিছু দেওয়া সেখানে নিষেধ। আর দেশ ভাগ হবার পর দেশ থেকে মা বাবা সবাই এসেছেন। আমার রোজগারই পরিবারের একমাত্র ভরসা। কি করেই বা দেবো ?

তা তো ঠিকই।

তবু স্ত্রীকে বোঝালুম যে আমি বোনাস্ পেয়েছি। সেই টাকা দিয়ে কিনে দেবো। উনি আবার নিরেট ভারনাকুলার। বোনাস্ মানে জানেন না! ভাবলেন স্বামী দেবতা ঘুষ খেয়েছে। চটেই লাল। অনেক করে বোঝালুম যে অফিস থেকে জলপানি দিয়েছে পূজোর জন্যে। তবে হলেন শান্ত। বললেন, তোমার যদি অতই বাসনা তবে একটি মুর্শিদাবাদী জর্জেট এনো। পাড়ার সব মেয়েরাই ঐ শাড়ী পরে। তারপর কণ্ঠে মধু এনে অতি মৃদু স্বরে বললেন 'বাসন্তী রং-এর'। উনি আবার

পরি কি মরি করে ছুটে গেলুম কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে। ঢুকলুম একটি বড় কাপড়ের দোকানে। চাইলুম মুর্শিদাবাদী জর্জেট। হাজির করা হ'লো এক ডজন শাড়ী। বাসন্তী রং-এরটি হাতে নিয়ে দর জিজ্ঞাসা করলুম।

দু' শ টাকা, উত্তর দিলেন দোকানী।

দু—শ—টা—কা, মনে মনে উচ্চারণ করে ভাবলুম কি করে পালান যায়। উর্বর মস্তিষ্ক। বুদ্ধি খুলে গেল। বললুম যে কাল ভোরে আস্‌বো স্ত্রীকে নিয়ে। বলেই এ্যাবাউট টার্ন।

কর্তা, কর্তা শুনুন, পিছু ডাক্‌লেন দোকানী। ফিরতেই হ'লো।

আজ চল্লিশ বছর ব্যবসা করছি। আপনার মত অনেক গ্রাহক দেখেছি। তাদের "কাল" আর কোনদিনই আসে নি। আমি জানি আপনার কোথায় ডিফিকাল্টি। গিন্নি চেয়েছেন মুর্শিদাবাদী জর্জেট, কিন্তু আপনার কাছে অত অর্থ নেই। এই তো ?

সত্য স্বীকার করলেম।

আপনার মুশকিল-আসান আমি করে দিচ্ছি। তিনি তাঁর সহকারীকে আবার শাড়ী আনতে বললেন। আবার আনা হ'লো শাড়ী। বাসন্তী রং এরটি আবার হাতে নিয়ে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলুম 'দাম কত ?'

মাত্র ত্রিশ টাকা।

বাঃ চমৎকার! কিন্তু এটা বোধহয় আসল মুর্শিদাবাদী জর্জেট নয়। বাড়ীতে যদি ধরা পড়ি, বললুম চিন্তান্বিত হয়ে।

আপনি নির্ভয়ে নিয়ে যান। আমিই সময় সময় বুঝতে পারি না কোন্‌টা আসল আর কোন্‌টা নকল, অভয় দিলেন বিক্রেতা।

টিক্‌বে কি রকম ?

তা বলতে পারি না। আপনার স্ত্রী যদি মোটা-সোটা হন তবে নাগাল ড্যামের মত গলায় আঁচল জড়িয়ে দেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করার সময়ই পেছনটা ফেটে যেতে পারে। আর যদি চিক্কণ-চাক্কণ হন তবে কিছুদিন টিকতে পারে।

স্বস্তি পেলাম কারণ আমার স্ত্রী মোটা নন।

ভাল কথা, এ শাড়ীর নাম কি ?

মুর্শিদাবাদী প্যাটার্ন জর্জেট, উত্তরিল দোকানী।

## কমু ও রেখো

বাবা, তুমি একটি পেটি বুর্জোয়া। মাত্র চার টাকা মাইনে দাও রঘুকে আর সারা দিনরাত খাটাও। এ সহ্য করা যায় না, বললেন তোত্‌লা রায় তস্য জনককে।

জনক তো ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত, তারপরেই, 'ফেটে পড়লেন, তুই আর তোর বৌ বেড় হ' আমার বাড়ী থেকে তোদের চাকর সাথে নিয়ে।

অন্নস্থানে কমিউনিজম চলবে না বুঝে প্রস্থান করলেন তোত্‌লা আর তোত্‌লাবৌ।

তোত্‌লা রায় জেল থেকে কমিউনিষ্ট হয়ে বেরিয়ে আসেন। দেশের সব কিছু ঝুটা আর একমাত্র স'ত্য রাশিয়া। আবুং উবুং হয়ে বিয়ে করলেন আর এক কমরেডনীকে। দিবারাত্র দল করে বেড়ান আর চার বার পিতার আশ্রমে উদর তৃপ্তি করে ভোজন এবং শয়ন। তোত্‌লা আর তোত্‌লাবৌর সংসার ঠিক রাখবার জন্যে পিতা নিযুক্ত করেছিলেন একজন ভৃত্য।

এ হেন কমিউনিস্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া লালিত-পালিত হয় ইংরেজের সৌজন্যে।

ইংরেজের প্রয়োজনে ওদের জন্ম হয়। বাংলার বিপ্লববাদ অতি দ্রুত প্রসার হচ্ছিল। গীতার বাণীর উপর ছিল বিপ্লববাদের ভিত্তি। অত্যাচারে দমন হ'লো না বিপ্লববাদ। বুদ্ধিমান ইংরেজ আর তার সারথী ততোধিক বুদ্ধিমান বাঙ্গালী গোয়েন্দা। বিপ্লবী ঘায়েলের অস্ত্র আবিষ্কার হ'লো—প্রতিদ্বন্দ্বী মতবাদ। সেই প্রতিদ্বন্দ্বী মতবাদ হ'লো কমিউনিজম্।

বন্দী বিপ্লবীদের ভেতর প্রথম শুরু হয় প্রচার কার্য। বোধহয় ১৯২৩ কি ১৯২৪ সালে। গোয়েন্দারা প্রথম দুর্বলচিত্ত বিপ্লবীদের

টোপ্ ফেলে ধরতো, তারপর কমিউনিজমের নানা গ্রন্থ তাদের দেওয়া হতো। শিক্ষা দেবার জন্য নেতা পাঠান হতো জেলে। অবশ্য গোয়েন্দা নেতা রাজবন্দী হয়েই জেলে গমণ করতো। যতদূর মনে হয় ভূপেন দত্ত জেল থেকে এ-বিষয়ে প্রথম প্রতিবাদ করেন।

ইংরেজ সফল হয় বাংলার যুগান্তর ও অনুশীলন দলে ভাঙ্গন ধরাতে। ইংরেজ শুধু কমিউনিজমের প্রচার ভারতে করেই ক্ষান্ত হয় নি। খাস ইংল্যাণ্ডে যে সব ভারতীয় ছেলে পড়তে যেতো তাদের ভেতরও প্রচার করেছে যাতে ওরা ফিরে গিয়ে গীতা না পড়ে।

প্রায় দশ হাজার বাংলার ছেলেমেয়ে কারাগারে ছিল ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত। ইংরেজ তখন প্রবল ভাবে কমিউনিজম্ প্রচার করে। রাজনৈতিক নেতৃত্বে দম্ভ ও আবরণ বজায় রইল। আরও বজায় রইল জন্মদাতা পিতার অন্ন ধ্বংস করবার অবাধ অধিকার।

এলো যুদ্ধ। কমিউনিষ্ট আর ইংরেজ হাত মেলালো যখন হিট্লার রাশিয়া আক্রমণ করলেন। কমিউনিষ্টদের পিতৃভূমি হয়েছে আক্রান্ত। ভারতীয় কমিউনিষ্টদের খাতায় কংগ্রেস হয়ে গেল বুর্জোয়া, সুভাষচন্দ্র হলেন দেশদ্রোহী। ইংরেজের যুদ্ধকে ওরা নাম দিল "জনযুদ্ধ"।

ইংরেজের পয়সায় ওরা ট্রেড ইউনিয়ান গঠন করলো যা'তে কোথাও ধর্মঘট না হয়। ট্রাম, ডক, রেলওয়ে সমস্ত স্থানে ইংরেজ ওদের কাজ কারবার অবাধ সুযোগ ও অর্থ দিলো। ওরা বেইমানী করে নি। ত্রিশ লক্ষ বাঙ্গালী ১৯৪২-৪৩ সালে না খেয়ে মাত্র কয়েক-মাসের ভেতর মারা গেল তাতে কিন্তু ওদের মন গলে নি। কারণ জনযুদ্ধে "এইসা হোতাই হ্যায়"।

সর্দার প্যাটেল চিনেছিলেন খুব ভাল করে কমিউনিষ্টদের। তাই তিনি বিতাড়িত করেন ওদের কংগ্রেস থেকে।

কমিউনিষ্টরা তে-ভাগা আন্দোলন শুরু করে মুসলমান কৃষকদের দলে টান্‌তে চেয়েছিল। কিন্তু ধর্মের সাথে ওদের নাড়ীর সংযোগ। তাই কালা নেগী, সেরপুরীয়া কমু, কার্তিক মাসেই নিজের ক্ষেতের ধান গুদামজাত করে তে-ভাগা আন্দোলন করতো, বললেন গুহকদা।

দেশ তো হ'লো বিভাগ। কমিউনিষ্টদের দুর্দিন। দেখলেই ওদের লোকে পেটায়।

কংগ্রেসের পার্শ্ব পরিবর্তন আর কমিউনিষ্টদের উত্থান। বাংলার কংগ্রেসের শক্তির উৎস ছিল পূর্ববঙ্গীয় হিন্দু। সেই হিন্দুকুল উদ্বাস্তু হয়ে আশাহীন হ'লো! কমিউনিষ্ট ওদের কোলে টেনে নিল। উদ্বাস্তুরা আজ কমিউনিষ্টদের শক্তি, যদিও কমিউনিষ্টগণ আজও ওদের বিশ্বাস অর্জন করতে পারে নি। কিন্তু যেখানে অভাব ও অনাচার সেখানেই কমিউনিজম্ শেকড় গাড়ে।

কমিউনিজম্ শেকড় ছড়াতে পারছে তার কারণ কংগ্রেস রাজত্ব চলেছে বৃটিশ আমলে যে সব প্রভুভক্ত রাজকর্মচারী ছিলেন তাদের নিয়ে নয়তো তাদের সন্তানদের দিয়ে। আর তাদের পরিচালনা করে ইংরেজ আমলের সেই একই বণিকগোষ্ঠী। কংগ্রেস স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বৃটিশ ভারতীয় রাজকর্মচারী ও বণিককুলের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিল। আবার রাজত্বটি পেয়ে তাদের সাথেই হাত মিলিয়েছে। 'এই হাত মিলানো' হ'লো কমিউনিষ্টগণের কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সবচেয়ে বড় অস্ত্র।

আমি অবাক হই এ দলের কর্মপন্থা দেখে। খিদিরপুর ডকের শ্রমিকদের নিয়ে আমি কমিউনিষ্টদের মিছিল দেখেছি। শোভাযাত্রার পুরোভাগে কয়েকটি বাঙ্গালী নেতা, আর বাদবাকী সবাই বিহারী বা পূর্বপাকিস্তানী মুসলমান।

ইতিহাস বলবে যে, কমিউনিষ্টদের আশ্রিত মুসলমান হ'লো "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান" মার্কা। পশ্চিমবঙ্গে যত মোটর লঞ্চ আছে তার সারেং এবং খালাসী সবই পূর্বপাকিস্তানী মুসলমান। ভারত সরকার অনেক উদ্বাস্তুকে লঞ্চ পরিচালনার কাজে শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু এসব ছেলেরা চাকরি পায় না কারণ সারেং ও মালিক বিদেশী।

অধিকন্তু সারেং হবার সরকারী সার্টিফিকেট পেতে হলে কোন সারেং-এর অধীন শিক্ষানবীশ থাকতে হবে। কোন মুসলমান সারেং কোন হিন্দুকে শিক্ষানবাশ রাখে না তাই হিন্দুর আর সারেং হওয়া ঘটে না।

শোভাযাত্রা দেখি আর ভাবি পাকিস্তানে এ রকম শোভাযাত্রা হলে কি পরিণাম হতো নেতাদের?

শোভাযাত্রা হতো:শবযাত্রা, কহিলেন কুশল।

এহেন কমিউনিস্টগণ বিনা আয়াসে মস্ত বড় সম্পত্তি পেলেন। উদ্বাস্তুরা জানে যে কমিউনিষ্টগণ আন্তরিক নন। তবুও কিছুটা সাহায্য পাওয়া যায় ওদের কাছ থেকে কারণ শোভাযাত্রা আর ভীতি প্রদর্শন না করলে কোন কাজই সফল হয় না।

সবচেয়ে আশ্চর্য স্নেহাংশু আচার্য কমিউনিষ্ট। স্নেহাংশুর মত উদার ব্যক্তি বাংলা দেশের কোন রাজনৈতিক দলে নেই। হয়তো ভবিষ্যৎ ইতিহাসে পাব যে স্নেহাংশু বিতাড়িত নয়তো বাংলার কমিউনিষ্ট দল "হিন্দি চীনি, ভাই ভাই" ছেড়ে "চীন মুর্‌দাবাদ" ধ্বনি দিচ্ছে।

যদিও কমিউনিষ্ট দল চেষ্টা করবে পশ্চিম বাংলায় আগামী নির্বাচনে সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করতে কিন্তু তা হবে না কারণ কমিউনিষ্ট দলের নেতাগণ জনগণের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারেন নি।

আমরা হলাম বাবু পার্টি। খাই দাই হাইকোর্টে আসি।

সন্ধ্যে বেলায় পার্টি আফিস গরম করি, এ সত্য ভাষণ দান করেছিলেন আমার এক কমিউনিষ্ট বন্ধু।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের গণতান্ত্রিক শাসনের ছায়াতলে আশ্রিত ও বর্ধিত কমিউনিষ্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়ার বিকল্প সরকার গঠন করার স্বপ্ন দেখা যেমন সম্ভব, তেমনি সম্ভব প্রো-রাশিয়া এবং প্রো-চীন ছু' উপদলে বিভক্ত হয়েও নিজেদের ভেতর রক্তপাত না করে শুধু বাক্‌যুদ্ধ করা।

His ( Late Mr. Ajoy Ghose, General Secretary of the CPI ) last two years were spent in grappling with another schism caused by the Chinese encroachment on Indian territory which divided the party into two sections—the nationalists and the pro-Chinese. ( The Statesman, January 14, 1962 )

গণতান্ত্রিক ভারতেই Pro-Chinese হওয়া সম্ভব। হ'তো যদি রাশিয়াতে ?

তবে চিতায় শুলেও খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বের করে আনতো, বললেন কুশল।

সেজদা শুন্‌ছস্‌ ?

কি ?

কাইল যে অরা অত কইয়া গ্যাল যে অগো রাশিয়াতে ভেন-কাট্‌রমনের গুষ্ঠী নাই বা জন্মাতেই পারে না কিন্তু আইজ্‌কার ষ্টেইসম্যান্‌ কাগজ যে অন্য কথা লিখ্‌ছে।

Moscow. Jan, 15—Top Goverment officials are among more than 50 people who will face trial in the Soviet Republic of Kirgiz, charged with the theft of State property involving 30 million rubles (about Rs. 15½ crores), it was reported here today, says Reuter.

The newspaper Soviet Kirgizia which arrived here today said the ringleaders controlled two factories in the republic's capital Frunze, turning out textiles, woollen goods, carpets

and knitwear. They had systematically robbed the State for several years, it declared. (The Statesman, January 16 1962)

ভ্যোন্‌কাইট্টারা তো দেহি অগোর হাডুর নিচে থাহে।

সবাই ওদের কপ্‌চানির কাছে হাটুর নিচে থাকে। উদ্বাস্তুরাও ওদের কপ্‌চানির চোটে হাটুর পেছন পেছন ঘোরে। উদ্বাস্তু দরদী বাগজোলার পতিত জমি, যা' কেউ কোনদিন করে নি চাষ, উদ্বাস্তুরা সেই জমিতে সোনা ফলিয়েছিল। সোনা দেখে মুখোস খুলে গেল দরদীদের। বন্দুক নিয়ে বিতাড়ণ করতে গিয়েছিল উদ্বাস্তু চাষীদের বাগজোলার জমি থেকে। তাদের গুলি বিদ্ধ হয়ে কয়েকজন উদ্বাস্তু চাষী প্রাণ দিয়েছেন।

শত মারি বৈদ্য ভবেৎ
লাখ মারি নেতা ভবেৎ, ছড়া
কাটলেন গুহকদা।

# কেন্দ্রে লড়াই

ঢাল না তলোয়ার না, মেহেরচাঁদ খান্না, কহিলেন গুহকদা।

নেহেরু পাঠিয়েছেন মেহেরচাঁদ খান্নাকে তিন পোয়া মন্ত্রী করে। তাঁর কাজ হ'লো শুধু রেণুকা রে-র সাথে বিতর্ক করা। আর. এফ. এ তাঁর কর্তৃত্বের বাইরে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রণালয়ের অধীন এবং অরুণ-চন্দ্র গুহ সংস্থাটির হর্তাকর্তা।

আবার রাজনীতি। এবার কেন্দ্রে। আর. এফ. এ-র কর্তৃত্ব নিয়ে। এই সংস্থার কর্তৃত্ব নিয়ে লড়াই চলেছে বহুদিন থেকে অর্থ-মন্ত্রণালয়ের সাথে পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের।

এ সংস্থার কাজ হ'লো উদ্বাস্তু পুনর্বাসন করা। যুদ্ধকালীন তৎপরতা ও দূরদর্শিতার সহিত পুনর্বাসন করার জন্য এই সংস্থা স্থাপিত হয়। এ সংস্থা খয়রাতী সাহায্য দেবে না, দেবে জীবন-যুদ্ধে জয়ী হবার হাতিয়ার। যুদ্ধের সময় সব দেশেই স্থাপন করে যুদ্ধ-মন্ত্রণালয় এবং যুদ্ধান্তে হয় বিলোপ, তেমনি ভাবে স্থাপিত হয়েছিল পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়, ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের জীবন-যুদ্ধে সাহায্য করবার জন্যে। পুনর্বাসনান্তে হবে এর বিলোপ।

পশ্চিম পাকিস্তানী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন করবার সময় পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় ঠিক যুদ্ধ-মন্ত্রণালয়ের মত কাজ করেছে। স্বহস্তে করেছে সর্ব কাজ। যুদ্ধের সময় যেমন যুদ্ধ-ঋণ দান করা হয় আবার যুদ্ধান্তে সেই ঋণ করা হয় মকুব। ঠিক সেই ভাবে ঋণ দেওয়া হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানী উদ্বাস্তুদের, আবার ক্ষতিপূরণ দিয়ে সেই ঋণ করা হয়েছে মকুব।

এ হেন যোদ্ধৃ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ছিলেন মেহেরচাঁদ। পশ্চিম বাংলায় এসে হলেন অস্ত্রহীন কারণ এখানে পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় কাজ

করে রাজ্য সরকারের মধ্যমে। অস্ত্রহীন মেহেরচাঁদ, অস্ত্র হেতু চাইলেন আর, এফ, এ,।

বোধহয় ১৯৫৫ সালের ডিসেম্বর মাস। রাজ্য পুনর্বাসন মন্ত্রীদের অধিবেশনে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় আর, এফ, এ-কে পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত করার জন্যে।

বাধা দিলেন অর্থমন্ত্রণালয়। উত্তর এলো যে আই, এফ, সি, যদি অর্থমন্ত্রণালয়ের অধীন থেকে শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দান করতে পারে তবে আর, এফ, এ, কেন পারবে না। কিন্তু দু'টি প্রতিষ্ঠানের কাজ ভিন্ন। একটি ঋণ দেয় সিকিউরিটি রেখে, আর, এফ, এ, ঋণ দেয় সিকিউরিটি তৈরি করবার জন্যে। মেহেরচাঁদ খান্না হেরে গেলেন কিন্তু তাঁর উদ্যম কম্‌লো না।

মেহেরচাঁদ ঠিক যেন বাঙ্গালী উদ্বাস্তু, উদ্যমে ভাঁটা পড়ে না ; বললেন গুহকদা।

## ফুটুন

হেঁপো আর ডেঁপো বাম হ'লো রেফো।

হতাশ, চিন্তান্বিত মেহেরচাঁদ, আর তাঁর যুগ্ম সচিব অবনী চাটার্জি। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রণালয় সন্তুষ্ট নয়। রেণুকা রে কথায় কথায় নেহেরুর কাছে নালিশ করেন। মেহেরচাঁদ প্রাণপণে বাধা দিচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে তাঁবু কেনা আর ড্রাই ডোল বন্ধ করবার জন্যে। কারণ পুনর্বাসনের অর্থ গমনের ড্রেনটি আবিষ্কার করেছিলেন।

প্রতি বছর শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের জন্যে তাঁবু কেনা হয় গড়পড়তা প্রায় এক কোটি টাকার। তাঁবু সরবরাহ করেন বেশীর ভাগ এক অবাঙ্গালী ব্যবসায়ী। তার কিন্তু তাঁবু তৈরীর কারখানা নেই।

সত্যিই যদি সরকার পশ্চিমবঙ্গ ও উদ্বাস্তুদের মঙ্গলাকাঙ্খী হতেন তবে দ্বিতীয় বছরে আর তাঁবু কেনা হতো না। তার পরিবর্তে স্থাপিত হতো কোন উদ্বাস্তু উপনগরীতে তাঁবু তৈরীর কারখানা, আর সেই কারখানায় ডোলখাকীরা প্রথম হতো শিক্ষানবীশ এবং শিক্ষান্তে হতো কর্মী। সাথে সাথে হয়ে যেতো তাদের পুনর্বাসন। কেন্দ্রীয় সরকারের খরচে পশ্চিমবঙ্গ পেত একটি তাঁবু তৈরীর কারখানা।

মেহেরচাঁদ ১৯৫৬ সালে বুঝতে পারেন যে জৈন পরিকল্পনায় শিল্পপতিদের অর্থ দাদন দিয়ে বড় শিল্প স্থাপন করা সম্ভব নয়। যদিও শিল্পপতিদের সুবিধা দেওয়া হয়েছিল সুদের হার কমিয়ে। আরও সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। শিল্পের লোকসান সরকারের। অথচ এই সুবিধা পুনর্বাসন অর্থ সংস্থা দেয়নি বাঙ্গালী উদ্বাস্তু ঋণীদের।

সুবিধা তো দিলেন সরকার তার পেয়ারের শিল্পপতিদের কিন্তু শিল্প স্থাপন করে যদি উদ্বাস্তু কর্মীদের তাড়িয়ে দেয়, তবে সরকারের নীরব দর্শকের ভূমিকায় অভিনয় করা ছাড়া আর কোন ক্ষমতা

থাকবে না। মেহেরচাঁদ আর অবনী চাটার্জ্যি দেড় কোটি টাকা শিল্পপতিদের দাদন দিয়ে মাত্র পনরশ' উদ্বাস্তুর অন্ন সংস্থানের বন্দোবস্ত করে নীরব দর্শকের ভূমিকায় অভিনয় করতে লাগলেন।

আসামের দিকে তাকিয়ে মেহেরচাঁদ হতাশ হলেন। ভারতের কোন প্রদেশই এত সংকীর্ণমনা নয়। ময়মনসিংহের মুসলমান আসামের ব্রহ্মপুত্র ভ্যালি ছেয়ে আছে। আসাম সরকার তাদের জমি দিয়েছে চাষ-আবাদ করবার জন্যে, কিন্তু দেবে না জমি ময়মনসিংহ থেকে আগত আশ্রয়প্রার্থী হিন্দুদের। তারা নিজের চেষ্টায় যদিও বা কোথাও জঙ্গল পরিষ্কার করে গৃহ নির্মাণ করে অম্‌নি আসাম সরকার হাতি দিয়ে দিয়েছে তাদের গৃহ ভেঙ্গে, তাদের কৃষিক্ষেতের সমস্ত ফসল করেছে নষ্ট। ভারত সরকার করেনি প্রতিবাদ।

বাঙ্গালী বিদ্বেষ অসমীয়াদের এত প্রবল যে শ্রীহট্ট জেলাকে তারা দিয়ে দিল পাকিস্তানকে কারণ শ্রীহট্টের অধিবাসী হলেন সব বাঙ্গালী।

অথচ, অসমীয়াগণ সবাই প্রায় বাংলাদেশে শিক্ষিত তাঁদের ভাষা বাংলা ভাষার মতই, উচ্চারণ একটু ভিন্ন প্রকার। কিন্তু তবুও কেন ওরা বাঙ্গালী বিদ্বেষী।

চতুর ইংরেজ! বাংলার বিপ্লববাদকে করতো ভয়। আসাম রাজনীতিতে আমদানি করলো প্রদেশিকতা, আর মুসলমান। নেতা হলেন তৎকালীন কংগ্রেস নেতা বড়দলই। তিনি "বঙ্গাল খেদা" আন্দোলনের নেতা। আন্দোলনের অর্থ যোগাত ইংরেজ ও মারোয়াড়ী ব্যবসায়ী।

আসামের ব্রহ্মপুত্র ভ্যালি ময়মনসিংহের মুসলমানদের কবলে চা এবং পেট্রল শিল্প ইংরেজের কবলে, কাঠ ও অন্যান্য ব্যবসা মারোয়াড়ীর একচেটিয়া অধিকার, আর অসমীয়াদের কবলে হলো "বঙ্গাল খেদা"।

নাগারা করলেন বিদ্রোহ, ফিজোর হ'লো জন্ম নাগাল্যাণ্ড হয়েছে পত্তন।

বিহার বিরূপ। প্রাদেশিকতা বিহার রাজনীতির প্রধান অস্ত্র।

· বিরূপ তো হবেই। বাংলাতে বিহারীদের বৃহৎ শিল্প হ'লো ভিক্ষাবৃত্তি, বললেন গুহকদা।

তবু বিহারে বাঙ্গালী উদ্বাস্তু আশ্রয় পেয়েছে বিনোদানন্দ ঝা প্রমুখ নেতাদের প্রচেষ্টায়।

বিনোদানন্দ ঝা বর্তমানে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী। দেওঘরের বামুন। লেখাপড়া করেছেন কোলকাতায়। জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর গুণমুগ্ধ ছিলেন। রাজেন্দ্রপ্রসাদের আদেশে জ্ঞানদার "দেশের ডাক" বই, যা ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিল, হিন্দিতে অনুবাদ করেন। বোধহয় জগজীবন রাম তাঁকে সাহায্য করেছিলেন।

উড়িষ্যার শাসনযন্ত্র অতি কাঁচা। তবে উড়িয়ারা লোক ভাল। বিশেষত, হরেকৃষ্ণ মহাতব মুখ্যমন্ত্রী হবার পর শাসনযন্ত্রের আরও উন্নতি হয়েছে। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বিজু পট্টনায়ক। তিনি কর্মঠ এবং প্রাদেশিকতার দোষ থেকে মুক্ত।

একমাত্র আশার আলোক দেখা গেল ত্রিপুরাতে। ত্রিপুরা সরকারের উপদেষ্টাগণ ছিলেন যুগান্তর দলের সভ্য। তকলী কাটেন নি। ত্রিপুরা হলো একমাত্র রাজ্য যেখানে উদ্বাস্তুরা পেয়েছে সম্মান, দরদ ও সহানুভূতি। কিন্তু ত্রিপুরার গণ্ডি ছোট। তার আশ্রয় দেবার স্থান সংকীর্ণ।

মেহেরচাঁদ ডাঃ রায়ের কোদল শোনে শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্যে আর নানা রাজ্যে নানা রকম স্কিম করেন। অন্ধ্র, হায়দারাবাদ, বোম্বে, সৌরাষ্ট্র নানা রাজ্যে পুনর্বাসনের জন্যে স্কিম করে অর্থ ব্যয় করা হলো কিন্তু উদ্বাস্তু পাঠান হ'লো না। অর্থ কিন্তু ব্যয় হলো বাঙ্গালী উদ্বাস্তুর খাতে।

রেণুকা রে-র নাচন দেখেন, আর হন অস্থির। সাহস পান না

সমস্ত পুনর্বাসনের শাসনযন্ত্র নিজে গ্রহণ করতে। ভয় প্রদেশ সরকারের অসহযোগিতা। ভাবেন আর টাকে হাত বুলান।

ফুটুন, ফুটুন, ফুটুন, চিৎকার করে উঠলেন গুহকদা।

ফুটুন আবার কি ?

যুদ্ধের সময় ননী গেছে ঘোড়ার দৌড়ে বাজী রাখে টাকা ডবল্ করবার জন্যে। বাজী ধর্‌লো ফনটুন ঘোড়ার উপর। দৌড় তো আরম্ভ হলো, আর ননীর চিৎকার ফুটুন, ফুটুন। ফুটুন তো শেষ সময় হেঁচে দিয়ে ম্যাকে ছোট করে হেরে গেল। আর ননীর কি কান্না !

সবাই শুধায় মশাই কাঁদছেন কেন ? অনেকেই তো হেরে গেছে।

কাঁদবো না, বলেন কি ? পাড়ায় গেলে রক্ষা আছে ? সবাইকে কন্ট্রোল রেটে হর্‌লিক্স দেব বলে বোতল পিছু চার টাকা পনর আনা নিয়ে ডবল কর্‌তে এসেছি। হর্‌লিক্স না নিয়ে গেলে আমি পাড়ায় ঢুক্‌তে পারবো না।

চাঁদেরা ননীর মত নিজেদের ক্যারিয়ার ডবল্ কোরতে এসেছিলেন দিল্লী থেকে কোলকাতায়। তাঁদের ঘোড়াও হেঁচে দিয়ে হেরে গেলো। দিল্লীতে ফিরতে পারেন না প্রশ্নবাণের জ্বালায়। ডাঃ রায়ের চোখের দিকে চেয়ে কথা বলার সাহস তাঁরা হারিয়েছেন। মেহেরচাঁদ তার দুর্বল স্থান মেরামত করতে আরম্ভ করলেন। তাঁর সবচেয়ে দুর্বল স্থান কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান, সেখানে নেই তাঁর কোন আধিপত্য। শরণ নিলেন পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের।

# নতুন শরণার্থীর পুনর্বাসন

ঘষে ঘষে বাংলাদেশটা ক্ষয়ে গেল। সুরেন ঘোষ, অমর ঘোষ প্রফুল্ল ঘোষ গেলেন, কিন্তু নেতাগিরি দিয়ে গেলেন অতুল্য ঘোষকে। ঘোষদের কম্যুন্যালইজিমের জ্বালায় আর নেতা হবার উপায় নেই। ভেবেছিলুম কম্যু হ'য়ে নেতা বনবো, বললেন গুহকদা।

হলেই পারতেন।

সেখানেও আবার এক নন্দ ঘোষের নন্দন গান্ধীরূপে বসে আছেন। যাই কোথা বল্।

আমেরিকার শিবিরে।

সেখানেও আর এক ঘোষ দোর আগলে বসে আছেন। তিনি সুধীর ঘোষ! ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর দান প্রচুর। গান্ধীজীর সহকারী ছিলেন। দৌত্য ক্রিয়া করেছেন। তাকে ডিঙ্গিয়ে নেতা হওয়া যাবে না। ভাবলুম মসীজীবী হয়ে নেতা হব কিন্তু তারও উপায় নেই।

কেন ?

আবার কেন ? এক ঘোষ গোষ্ঠী বাগবাজার আগলে বসে আছে, সেখানে প্রবেশ নিষেধ। এমন কি সাংবাদিকের নেতা হব ময়দান শিবিরে, তারও উপায় নেই। ময়দানের প্রেস ক্লাবের সভাপতি আবার এক ঘোষ নন্দন।

অতুল্য ঘোষ শুধু পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কমিটির সভাপতিই নন, তিনি রাজ্য কংগ্রেসের নেতা।

রাজ্য কংগ্রেসের যখন অতীব দুর্দিন তখন অতুল্য ঘোষ সভাপতি নির্বাচিত হন। এমন দুর্দিনে তিনি হাল ধরলেন যে কংগ্রেস প্রকাশ্য কোন সভা কোলকাতায় করতে পারে নি।

বাংলা কংগ্রেস যখন পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসে রূপান্তরিত হ'লো তখন থেকে অতুল্য ঘোষ পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের নেতা। পিতৃপুরুষের অর্থের সৌজন্যে বা জন্মের কৌলীন্যে তিনি নেতা হন নি। স্বেচ্ছা-সেবক থেকে নিজ গুণে ও অধ্যবসায়ে তিনি নেতৃত্ব লাভ করেছেন। কোলকাতায় আস্তে আস্তে তিনি কংগ্রেসকে পুনর্জীবিত করেন। ময়দানে সভা আহ্বান করে ভাষণ দান করেন।

দিল্লীতে গেলে বোঝা যায় যে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভাপতির সম্মান, লোকচক্ষে কংগ্রেস মন্ত্রীদের অনেক নিম্নে। আমি প্রশংসা করি অতুল্য ঘোষকে। লোকচক্ষে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস নেতার সম্মান মুখ্যমন্ত্রীর নিম্নে তো নয়ই, কোন কোন ক্ষেত্রে বেশী।

অতুল্য ঘোষ ১৯৫৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকারকে লিখেছিলেন যে যদি উদ্বাস্তু পুনর্বাসন না হয় তবে, পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কমিটি বন্ধ করে দেওয়া হউক। যখনই কোন উদ্বাস্তু তাঁর কাছে গিয়েছেন তিনি সাহায্য করেছেন। তারপর তার কর্মীদল প্রায় সবই পূর্ববঙ্গীয়। এ কথা এখানে লিখলুম কারণ রটনা আছে যে অতুল্য ঘোষ পূর্ববঙ্গীয়দের বিরোধী।

মেহেরচাঁদ (অক্টোবর ৩০, ১৯৫৭):হাওড়ার কংগ্রেস অধিবেশনে প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেন যে পূর্ববঙ্গ থেকে আর উদ্বাস্তু আগমন নিষিদ্ধ। খান্না মুছে দিলেন সমস্ত প্রতিশ্রুতি যা দেওয়া হয়েছিল পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের দেশ-বিভাগের সময়।

রাজনীতিজ্ঞ খান্না। লোকসভায় বা রাজ্য-সভায় তাঁর চাই আসন। তিনি হাওড়ার প্যাঁচে কাত করলেন বাঙ্গালীকে। পশ্চিম-বঙ্গ বিধানসভার সদস্যদের ভোটে তিনি রাজ্যসভায় নির্বাচিত হন।

১৯৫৭ সাল পর্যন্ত পার্থিব পুনর্বাসনের খতিয়ান ঘাটলে পাওয়া যায় পশ্চিমবঙ্গে খান্নাই একমাত্র উদ্বাস্তু যিনি অর্থনৈতিক ও রাজ-নৈতিক পুনর্বাসন লাভ করেছেন। অবশ্য তাঁর নিজের আসন ছিল

দিল্লী বিধানসভা থেকে। কিন্তু স্থরেন দের নাম পশ্চিমবাংলার ভোটদাতাদের তালিকায় ছিল না, তার নাম ছিল দিল্লীর তালিকায়। খান্নার নাম পশ্চিমবঙ্গের তালিকাতেও ছিল। তাই খান্নাকে তাঁর দিল্লীর আসন ছেড়ে দিতে হয় স্থরেন দে-কে।

যত কিছুই বল, খান্না উল্টো ল্যাং দিয়েছেন।

উল্টো ল্যাং ?

তবে শোন্ ! দাড়িওয়ালা ভালমানুষ কবিগুরু অনেককে সার্টিফিকেটের জোরে মহাত্মা বানিয়ে দিয়েছেন।

আর সেই সব মহাত্মারা এইসা ল্যাং দিলেন যে সেই সার্টিফিকেটের জোরে তাঁরা সারা জীবন বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে গদি আঁকড়ে বসে রইলেন।

# রেণুকা রে-র বিদায় ও মেহেরচাঁদের পুনরাগমন

রেণুকা রে ১৯৫৭ সালের নির্বাচন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের পুনর্বাসন মন্ত্রী ছিলেন। তাঁকে রাজ্য থেকে বিদায় নিয়ে লোকসভায় যেতে হ'লো। তাঁর নির্বাচন কেন্দ্র মালদহ ও মুর্শিদাবাদের কিছু অংশ।

তাঁর কার্যাবলী তিনি নিজেই লিখেছেন ১৯৫৮ সালের ২৩ শে জানুয়ারী দি ষ্টেটসম্যান কাগজে।

তিনি লিখেছেন যে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় কুড়ি লক্ষ উদ্বাস্তুকে প্রায় চল্লিশ কোটি টাকা পুনর্বাসন ঋণ দেওয়া হয়েছে, গড়পড়তা, মাথা-পিছু দু'শত টাকা। ওদিকে, পশ্চিম পাকিস্তানী উদ্বাস্তুদের দেওয়া হয়েছে তিন শত পঞ্চাশ কোটি টাকার উপর, গড়পড়তা মাথাপিছু চার শত টাকার উপর। তিনি লিখেছেন যে সুষ্ঠুভাবে পুনর্বাসন দিতে হলে তাদের আরও সাহায্য দেওয়া প্রয়োজন।

রেণুকা রে-র বিদায়ের পর প্রথম দেখা যায় কোলকাতার পথে পথে নতুন ভিক্ষুকশ্রেণী—একদার বাঙ্গালী, পরে উদ্বাস্তু, বর্তমানে ভিক্ষুক। একদার কৃষক, পায় না জমি। বাঙ্গালী বলে সর্বত্র ঘৃণিত। কোথাও পায় না সহানুভূতি। ভিক্ষা আজ হয়েছে সম্বল।

নেহেরু পুনরায়, বহাল করলেন মেহেরচাঁদকে। তিনি এবার এলেন সম্পূর্ণ নতুন ব্যক্তি হয়ে। তিনি বদ্ধপরিকর হলেন পুনর্বাসন প্রহসন শেষ করবার জন্যে। প্রথম তিনি ঘোষণা করলেন যে ১৯৬১ সালের মধ্যে তাঁর দপ্তর বন্ধ করে দেবেন। পরে আবার ঘোষণা করেন যে ১৯৫৯-এর জুলাই মাসের ভেতর তিনি পুনর্বাসন সমাপ্ত করবেন।

রেণুকা রে-র আমলের আর একটি হিসেব পাওয়া যায় পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা থেকে। পুনর্বাসনের অর্থ দান করেন কেন্দ্রীয় সরকার। রাজ্য সরকার করেন খরচ। এই খরচটি রাজ্য সরকার সময়মত

করতে পারেন না তাই প্রতি বছর বরাদ্দের অর্থ ফিরে যায় কেন্দ্রীয় তহবিলে। অবশ্য এ অর্থমঞ্জুরের ভেতরও রাজনীতি আছে। ফাইল ঘাট্‌লে পাওয়া যাবে যে মার্চ মাসের প্রথম তারিখে এক কোটি টাকা মঞ্জুর হ'লো, তা খরচ করতে হবে মার্চ মাসের সংক্রান্তির আগে। শিয়রে সংক্রান্তি, রাজ্য সরকার খরচ করতে পারেন নি তাই মঞ্জুরীকৃত অর্থ ফিরে গেছে কেন্দ্রীয় তহবিলে। কেন্দ্রীয় সরকার "প্রেস নোট" ছাপিয়ে জনসাধারণকে জানিয়ে দিলেন যে আরও এক কোটি টাকা মঞ্জুর হ'লো, কিন্তু কোনদিনই ছাপা হয়নি অর্থের জন্য রাজ্য সরকার কবে স্কিম দাখিল করেছিলেন, কতদিন লেগেছিল সেই স্কিম পাশ হতে এবং কতদিনের ভেতর অর্থ খরচ করতে হবে বরাদ্দের শর্তানুযায়ী।

এ হেন রাজনীতির চক্রে পরে ১৯৫৪-৫৫ সালে তিন কোটি টাকা, ১৯৫৫-৫৬ সালে আট কোটি টাকা ব্যয় না হয়ে ফিরে গেছে কেন্দ্রীয় তহবিলে। প্রতি বছর ব্যয় না হয়ে অর্থ যাচ্চে ফিরে অথচ অনাহারে মরছে বাঙ্গালী। এর নাম রাজনীতি।

## সেন রাজত্ব

বল্লাল সেন

লক্ষ্মণ সেন

প্রফুল্ল সেন,—বাংলার ইতিহাসে তিন সেনই অক্ষয়।

রেণুকা রে-র পর প্রফুল্ল সেন হলেন পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসন মন্ত্রী। রাজ্য কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে তাঁর প্রবল প্রভাব যা রেণুকা রে-র ছিল না।

জেল থেকে ১৯৪৬ সালে যে সব রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি পান তাঁদের কাছেই প্রথম প্রফুল্ল সেনের নাম শোনা যায়। তিনি "আরামবাগের গান্ধী" নামে পরিচিত ছিলেন। কোহিনুর ঘোষের নিকট আমি প্রথম প্রফুল্ল সেনের গুণাবলীর কথা শুনি যদিও দু'জন ছিলেন ভিন্ন উপদলে।

মন্ত্রিত্ব তার কর্মক্ষমতাকে বিকাশ করবার সুযোগ দিয়েছে। তিনি সমস্ত নথীপত্র পড়েন, কর্মচারীদের মতামতকে সম্মান দেন। তিনি ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজ থেকে আসেন নি।

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক প্যাঁচে পড়ে তিনি আর গন্নু ভটচাজ খাবি খেলেন।

সত্যেন ভট্টাচার্য—ডাক নাম তার গন্নু। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় "এ্যালি বাই" দিয়ে খালাস পেয়ে বন্দী হন বেঙ্গল অর্ডিনান্সে। গন্নুদের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করেন নি এমন নেতা কমই আছেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সময় গন্নু পড়তেন কোলকাতার মেডিকেল কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে। কারাগারে হলেন বন্দী। লেখাপড়া হ'লো বন্ধ। ছাড়া পেলেন সাত বছর বাদে।

চট্টগ্রামেই রইলেন দেশবিভাগ পর্যন্ত। তারপর এলেন

কোলকাতায়। নাম লেখালেন রিফুউজির তালিকায়। অন্নের জন্যে দ্বারে দ্বারে ঘুরলেন। কিন্তু কোথায় অন্ন ?

এমন সময় দেখা হ'লো ত্রিপুরার শচীন সিংহের সাথে।

গন্নুদা! আপনার এই অবস্থা ? চলেন আমার লগে।

গন্নু এলেন আগরতলায়। শিক্ষকের কর্ম গ্রহণ করলেন। কোনমতে চালাচ্ছিলেন সংসার। তাও ভগবানের সইলো না।

গন্নুর জিহ্বায় হ'লো ক্যান্সার। আগরতলায় নেই কোন চিকিৎসার বন্দোবস্ত। শচীন সিংহ উদ্বাস্তু দপ্তর থেকে সাহায্যের চেষ্টা করে দেখলেন যে গন্নুদা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক প্যাঁচে পড়ে আছেন। ত্রিপুরা সরকারের কোন ক্ষমতা নেই গন্নুকে সাহায্য করবার কারণ তিনি উদ্বাস্তু হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে তালিকাভুক্ত।

শচীন সিংহ তাঁর গন্নুদাকে তো পাঠিয়ে দিলেন কোলকাতায়, আর ত্রিপুরা সরকারের প্রচেষ্টায় তিনি ভর্তি হলেন চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতালে। ত্রিপুরা সরকার লিখলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে গন্নুর উদ্বাস্তু নাম ট্রান্সফার করে ত্রিপুরায় পাঠাতে যাতে তিনি ত্রিপুরা সরকার থেকে আর্থিক সাহায্য পেতে পারেন।

কোলকাতায় এসে হাসপাতালে আউটডোর রুগী হিসাবে তাঁর চিকিৎসা আরম্ভ হয় আর অবসর মত চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁর নাম ট্রান্সফার করবার জন্য।

মন্ত্রীরও ক্ষমতা নেই ট্রান্সফার করে দেবার আদেশ দেবার যে পর্যন্ত না সবগুলি জেলার শাসক লিখে জানাবেন যে গন্নু তাঁদের কাছ থেকে কোন ঋণ গ্রহণ করেন নি। এই নির্দেশ হলো কেন্দ্রীয় সরকারের।

সামলাও ঠ্যালা। ডাক্তার নির্দেশ দিয়েছেন গন্নুর জিভে অপারেসন করতে হবে। অন্ন চিন্তা বড় চিন্তা। নিজের রোগের চিন্তার চেয়েও গন্নুর বড় চিন্তা পরিবারের অন্ন। চোখের জলে, কপর্দকহীন গন্নু ভর্তি হলেন হাসপাতালে। প্রথম ঠেলা সামলালেন

প্রফুল্ল সেন। তিনি ডাকযোগে হাসপাতালে তাকে একশ' টাকা পাঠালেন। সেই টাকা থেকে পঞ্চাশ টাকা গনু ডাকযোগে তাঁর পরিবারকে পাঠান।

তারপর কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী মহাশয় গনুকে অর্থ সাহায্য করেন কিন্তু নিজেদের রচিত আইন বদল করেন নি।

শুধু গনু ভটাচাজ নয় এই প্যাঁচে পড়ে জমসেদপুরের উদ্বাস্তুরা কোন সাহায্য পান নি।

এদিকে নেহেরু একবার বলছেন "কোলকাতা মৃত সহর", আবার বলেছেন "শোভাযাত্রার সহর কোলকাতা", আবার বলেছেন বাঙ্গালী উদ্বাস্তু "অলস ও বোঝাসম"।

নেহেরুর উক্তির অর্থ হ'লো প্রফুল্ল সেন বিধান সভায় যে ভাষণ দিয়েছেন তা' তিনি বিশ্বাস করেন নি।

সেন মহাশয়ের আমলে তাঁর দপ্তর হয়েছে "ট্যাকস্ কালেকটর"। যে সব উদ্বাস্তুরা ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সরকারী সাহায্য পেয়েছিলেন এবং যাঁদের পুনরায় পুনর্বাসন সাহায্য দেবার জন্য তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ, সার্টিফিকেট জারী করে টাকা আদায় করবার মন্ত্রিত্ব এখন তাঁর।

তিনি যদিও কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়েছেন যে সব ঋণ মকুব করা উচিত। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রণালয় জানিয়েছেন যে পাঞ্জাবী উদ্বাস্তুদের কাছ থেকে আদায় হচ্চে শতকরা বাষট্টি ভাগ, আর বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের কাছ থেকে মাত্র চার ভাগ।

এখানে হ'লো রাজনীতির প্যাঁচ। বাষট্টি, পার্সেণ্টের কত আদায় হচ্চে ক্ষতিপুরণের ভাণ্ডার থেকে তা, কিন্তু বলেন নি অর্থমন্ত্রণালয়। খান্নার একটি উক্তিতে জানা যায় যে একশ' পঞ্চাশ কোটি টাকা এ পর্যন্ত (মার্চ, ১৯৬১) পশ্চিম পাকিস্তানী উদ্বাস্তুদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়।

তা' হলে কত পার্সেণ্ট ক্ষতিপূরণ ভাণ্ডার থেকে পরিশোধ করা হয়, আর কত পার্সেণ্ট পশ্চিম পাকিস্তানী উদ্বাস্তুগণ নিজেরা পরিশোধ করেন তাহা উল্লেখ করা হয় নি। শুধু দোষ দেওয়া হচ্চে যে বাঙ্গালী উদ্বাস্তু ঋণের টাকা পরিশোধ করেন না।

# মোরারজী দেশাই কন্‌ফারেন্স

জুলাই তিন ও চার, ১৯৫৮ সাল। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মোরারজী দেশাই কোলকাতায় রাজ্য সরকারের মহাকরণে মিলিত হন ডাঃ রায়ের সাথে এক কন্‌ফারেন্সে। সঙ্গে কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী অশোক সেন ও মেহেরচাঁদ খান্না।

এ মন্ত্রী বৈঠকের আহ্বায়ক কে তা' ঠিক জানা যায় না; তবে অশোক সেনের প্রচেষ্টা ছিল। এ বৈঠকের কোন এ্যাজেণ্ডা ছিল না। তবুও এ বৈঠকে বাঙ্গালী উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের শেষ মীমাংসা হয়ে গেল।

আলোচনা হ'লো প্রধানত শিবিরবাসী পঁয়তাল্লিশ হাজার উদ্বাস্তু পরিবার নিয়ে কারণ তারা কেন্দ্রীয় সরকারের নিজস্ব পোষ্য। প্রতি পরিবারকে মাসিক পঞ্চাশ টাকা করে ডোল দেওয়া হয় রাজ্য সরকারের মাধ্যমে। সিদ্ধান্ত হ'লো যে দশ হাজার পরিবারকে ১৯৫৯ সালের জুলাই মাসের ভেতর পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসন দেওয়া হবে আর বাকী পঁয়ত্রিশ হাজার পরিবারকে কেন্দ্রীয় সরকার পুনর্বাসন দেবেন এক বছরের ভেতর মধ্যপ্রদেশে, বোম্বেতে ও রাজস্থানে। যাঁরা যেতে চাইবেন না তাঁদের একসাথে ছ' মাসের ডোল দিয়ে, অর্থাৎ তিন শত টাকা দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার দায়মুক্ত হবেন।

শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের ইতিহাস আলোচনা করলে জানা যাবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যকলাপ। শিবিরস্থিত পঁয়তাল্লিশ হাজার পবিবার গত পাঁচ থেকে দশ বছর যাবৎ সেখানে বাস করছেন পুনর্বাসনের আশায়।

কেন থাকে শিবিরে ?

কারণ, কেন্দ্রীয় সরকারের পুনর্বাসন নীতির বিফলতা ও অসারতা। শিবিরে যাঁরা আছেন তাঁরা হ'লেন কৃষকশ্রেণী ও নিম্ন মধ্যবিত্ত। এঁরা স্বাস্থ্যবান ও কর্মঠ ছিলেন। যে কোন দেশের সামরিক বাহিনী এঁদের পেলে নিজেদের ভাগ্যবান্ মনে করতেন।

কিন্তু ভারতীয় সামরিক বাহিনীতে এদের কোন স্থান দেবার পরিকল্পনা করা হয়নি। কারণ ইংরেজের রাজনীতির ধারা এখনো প্রচলিত ভারতীয় সামরিক বাহিনীর উচ্চমহলে। তবে তাঁদের গীতা একটু অন্যরকম। বাঙ্গালীর হাতে অস্ত্র ? বলে কি ? ওরা তো সব কমিউনিষ্ট।

যদি শিবিরে নেবার সাথে সাথে এঁদের সামরিক বাহিনীর অঙ্গীভূত করে নেওয়া হ'তো তবে ভারত পেত কয়েক লক্ষ স্বাস্থ্যবান আত্মচেতনা সম্পন্ন নরনারী।

দ্বিতীয় কারণ হলো কেন্দ্রীয় সরকার কখনই মনেপ্রাণে চাননি যে উদ্বাস্তুরা আবার বাঙ্গালী হোক্ এবং পশ্চিমবঙ্গের উন্নতি হোক। তাই কোনরূপ পরিকল্পনা করা হয়নি এদের আর্থিক উন্নতি করবার। ডোল দেওয়া খুব সহজ। বিদ্যাবুদ্ধির দরকার হয় না।

যদি কেন্দ্রীর সরকার সত্যিই শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন চাইতেন তবে ডাঃ রায়ের "ক্যাপিটেলাইজ্ দি ডোল" পলিসি মেনে নিতেন।

কি রকম হ'তো ?

কুপার্স ক্যাম্প, রানাঘাট। সেখানে পঁচিশ হাজার উদ্বাস্তু গত দশ বছর যাবৎ ডোল পাচ্ছেন। ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত আনুমানিক সেখানে আট কোটি টাকা ডোল দেওয়া হয়েছে। এই আট কোটি টাকার ভেতর চার কোটি টাকা দিয়ে ওখানে একটি শিল্প প্রতিষ্ঠা করা হতো ১৯৫৭ সালে, তবে তাঁরা সবাই পেত কর্ম, আর সমগ্র নদীয়া জেলা হ'তো শিল্পে উন্নত।

মন্ত্রী বৈঠকে শিবির তুলে দেবার সিদ্ধান্ত খুবই উপযুক্ত হয়েছে। যে দেশে কুড়ি টাকা চালের মন সেখানে পঞ্চাশ টাকা মাসিক ভাতাতে পাঁচ জন মানুষ যে বাঁচতে পারে না তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের মধ্যে শতকরা তেত্রিশ জন ক্ষয় রোগে আক্রান্ত। বাকী সবাই যে দু' এক বছরের ভেতর আক্রান্ত হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই কারণ ডাঃ রায় ১৯৫৭ সালে নিজে গিয়ে শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুকে দিয়ে ধুবুলিয়া শিবিরে একটি হাসপাতালের ভিত্তি স্থাপন করিয়েছেন।

ধুবুলিয়াতে শ্মশানের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল কিনা সে সংবাদ প্রকাশ হয় নি। তবে এই শিবিরের পাশেই পাঁচ শত একর জমি আছে, মালিক কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা দপ্তর। ধুবুলিয়া শিবিরবাসী উদ্বাস্তু অনেক আবেদন নিবেদন করেছিলেন এই জমি চাষ করবার অনুমতির জন্য কিন্তু সরকার তা দেন নি। জমি সবুজ, তবে ফসলে নয়, আগাছায়। বোধহয়, এই জমিতেই উদ্বাস্তুরা শবদাহ কার্য সমাধা করে এর উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করেছেন।

বেতিয়ার ঘটনার পর বামপন্থীদের শক্তি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের ভেতর। বেতিয়াতে নিরস্ত্র উদ্বাস্তুদের গুলি করলেন শ্রীকৃষ্ণ সিং, উদ্বাস্তুদের পাঠালেন মেহেরচাঁদ খান্না, আর অর্থ দিলেন মোরারজী দেশাই। এ বর্বরতার কৈফিয়ত দেবে কে? কার দায়িত্ব? কোথায় হাঙ্গারীতে কাকে কে ফাঁসী দিয়েছে তা নিয়ে নেহেরু, কংগ্রেস, প্রজা পার্টি, কমিউনিষ্ট সবাই ব্যস্ত, কারও ক্রোধ, কারও কান্না; কিন্তু বেতিয়াতে যে পাঁচ ছয় জন নিরাশ্রয় দেশবাসীকে বিনা বিচারে হত্যা করা হ'লো তার জন্যে এক ফোঁটা অশ্রুও কেউ ফেলেন নি।

শিবিরের বাইরে যে উনত্রিশ লক্ষ উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে আছেন তাঁদের বিষয় কোন স্থির সিদ্ধান্ত মন্ত্রীবৈঠকে করা হয় নি।

কেনই বা করবে ? তাঁরা তো আর কেন্দ্রীয় সরকারের পোষ্য নন, তাই কেন্দ্রীয় সরকারের মাথা ব্যথা নেই। কিন্তু ভুগছে এবং ভবিষ্যতে আরও ভুগবে এদের নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ।

প্রায় দশ লক্ষ গৃহ-নির্মাণ ঋণের আবেদন পত্র পড়ে আছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুনর্বাসন দপ্তরে। এর ভেতর প্রায় এক লক্ষ আবেদন পত্রের অর্থ মঞ্জুর হয়েছিল এবং আবেদনকারীগণ 'লোন বণ্ড' সই করেছিলেন এবং মরেছেন একদম। বণ্ডের নিয়মানুযায়ী এঁরা নিজেদের অর্থ দিয়ে বাড়ীর ভিত পর্যন্ত গেঁথে সরকারী ঋণের আশায় চাতক পাখীর মত তাকিয়ে আছেন। দুকুল গেছে এঁদের। কেন্দ্রীয় পুসর্বাসন মন্ত্রণালয় গৃহ-নির্মাণ ঋণ দেওয়া বন্ধ করেছেন। (অবশ্য ১৯৬০ সালে মঞ্জুরীকৃত কিছু ঋণ দেবার আদেশ হয়েছে)।

উদ্বাস্তুদের শিল্প স্থাপন করবার ঋণ বহু পূর্বে বন্ধ হয়েছে।

জৈন পরিকল্পনা অনুযায়ী শিল্পপতিদের প্রায় এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে মোট আঠারোটি শিল্পকে। কর্ম পেয়েছেন মোট প্রায় পনেরো শত উদ্বাস্তু।

শুনলে অবাক লাগে কিন্তু কথাটি সত্যি। ভারতের এক শ্রেষ্ঠ ধনবান্ অবাঙ্গালী শিল্পপতিকে ঋণ দেওয়া হয়েছে তার রিষড়াতে অবস্থিত একটি মৃত শিল্পকে জীবিত করার জন্যে। এই হ'লো পুনর্বাসন। কিন্তু কার ? মৃত শিল্পের না উদ্বাস্তুর ?

মেহেরচাঁদ খান্না বদ্ধপরিকর কাগজ কলমে দেখাতে যে পুনর্বাসন পর্ব শেষ হয়েছে! "এমারজেন্সী" আর নেই। রাজ্য পুনর্বাসন দপ্তর গুটোবার নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এই দপ্তরের শিল্প পরিকল্পনার শাখাকে তুলে দিয়ে দায়িত্ব আরোপ করা হয়েছে রাজ্যশিল্প অধিকর্তার উপর। কন্‌স্ট্রাক্‌সন্ শাখা তুলে দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য শাখার দায়িত্ব আরোপ করা হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রণালয়ের উপর।

মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাঙ্গালী উদ্বাস্তুর কোন স্থান হবে

না দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনাতে। দণ্ডকারণ্যে "নতুন বাংলা" আর হ'লো না।

কি করে হবে? তোরা যেখানে যাবি সেখানকার পেডিগ্রি ইম্প্রুভ করতে লেগে যাবি।

পেডিগ্রি ইম্প্রুভ্?

কোন এক দূর রাজ্যে তোদের গোটা সত্তর আন্-এ্যাটাচ্ড্ মেয়েকে অতি যত্ন করে পাঠান হয়েছিল; তারা সব হারিয়ে গেল।

হারিয়ে গেল? কিন্তু গেল কোথায়?

পেডিগ্রি ইম্প্রুভ করতে।

# অস্মৃতির প্যাঁচ বনাম আখরোটের খোসা

লন যাই মা'রাজ কইল্কাত্তায়। ঢাকা 'হ্যে আর জুইৎ নাই, বললেন ঢাকার কাকের মহারাজকে তার এক চেলা। মহারাজ তার আস্তানায় বিশ্রামরত।

হঃ, ল যাই, আসত্যারে এ'হানের ভার দিয়া।

এলেন তো ঢাকাই মা'রাজ চেলা-চামুণ্ডা নিয়ে কোলকাতায়। আস্তানা নিলেন বাগবাজারের বড় বটবৃক্ষে। সেই বৃক্ষেই আবার বাগবাজারের বায়সদের সর্দারের আস্তানা। মা'রাজ দ্বন্দ্বে আহ্বান করলেন সর্দারকে।

বৃক্ষের নিচে দিয়ে যাচ্ছিল এক বালক, হাতে তার একটি ছোট মাটির পাত্র এবং তার ভেতর একটি রসগোল্লা।

সর্দ্দার মা'রাজকে রসগোল্লাটি আন্তে বললেন।

মা'রাজ বুলি ছেড়ে, পাখ্না উড়িয়ে যেই না বালকটির কাছে যাওয়া, অমনি সে দিল রসগোল্লাটি মুখে পুরে। ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেলন ঢাকাই মা'রাজ।

পার্লে না তো ?

কি কইরা পারুম ? মুহে যে ঢুকাইয়া দিলো।

যা তো গোপাল রসগোল্লাটি নিয়ে আয়, আদেশ দিলেন সর্দার তার চেলা গোপালকে।

গোপাল কিছু উপরে উড়ে গিয়ে সোজা নিচের দিকে ডাইভ দিলো, যেন জার্মান বোমারু। ডাইভ দিয়ে গিয়ে বালকটির মাথায় মারলো ঠোকা চঞ্চু দিয়ে। অমনি বালকটির চিৎকার এবং মুখস্থিত রসগোল্লাটির ধরণীতলে পতন এবং গোপালের তাহা চঞ্চু দিয়ে ধারণ ও প্রস্থান।

মা'রাজ শিষ্যবর্গ সহ অধোমুখে বসে রইলেন।

বুঝলে হে ঢাকা। এখানে মা'রাজ হয় না। সাগ্‌রেদ্‌ থেকে সর্দ্দার, সর্দার থেকে নেতা। হয় সাগরেদী নেও, নয়তো ফিরে যাও, বললেন সর্দ্দার।

কাকেরা দণ্ডকারণ্যে যাবার জন্যে কা কা করতে লাগলেন।

অশোক সেন ও মেহেরচাঁদ খান্নার রাজনীতির কাহিনী শোনবার আগে ক্ষিতীশ নিয়োগী ও ফ্লেচারের কাহিনী জানা দরকার।

কেন দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনায় স্থান হ'লো না বাঙ্গালী উদ্বাস্তুর ?

প্রথম বাধা আসে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ক্ষিতীশ নিয়োগীর কাছ থেকে। ক্ষিতীশচন্দ্র কেন্দ্রীয় সরকারের একজন ভূতপূর্ব পুনর্বাসন মন্ত্রী। তিনি ১৯৫৭ সালে এক বিবৃতিতে বললেন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নাক গলান চলবে না দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা প্রশাসনিক ব্যবস্থাতে। তাঁর এই উক্তিতে বলীয়ান হ'লেন পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের বাঙ্গালী বিদ্বেষিগণ। ডাঃ রায় হেরে গেলেন দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার প্রধান কর্মকর্তা নিয়োগ নিয়ে। তিনি চেষ্টা করেছিলেন বাঙ্গালী আই, সি, এস্‌ নিয়োগ করবার জন্যে। পশ্চিমবঙ্গের আই, সি, এস্‌ নিলে ডাঃ রায়ের নাক গলান হবে তাই আমদানি করা হ'লো পাঞ্জাব থেকে আই, সি, এস্‌, নাম তাঁর এ, এল্‌, ফ্লেচার।

নাম শুনেই বুঝি মনে করলি ইংরেজ ? আরে না। গায়ের রং দেখলে বুঝবি বিশুদ্ধ স্বদেশী, বললেন গুহকদা।

১৯৫৮ সালে অশোক সেন প্রবেশ করেন রঙ্গমঞ্চে। অশোক সেনের পিতা ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। বাড়ী ছিল ঢাকা শহরে। শিক্ষিত বাঙ্গালী পরিবার। তৃতীয় অগ্রজ সুকুমার সেন আই, সি, এস্‌। মোহিত মৈত্রকে পরাজিত করে কংগ্রেসের টিকিটে অশোক সেন উত্তর কোলকাতা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হন লোকসভায়। এলেন দণ্ডকারণ্যে বাঙ্গালী উদ্বাস্তু পুনর্বাসন করতে।

এলেন তো। রেডিওতে বক্তৃতা দিলেন যে সবাই চল দণ্ডকারণ্যে। সেখানে হবে নতুন বাংলা। যেই না নতুন বাংলা প্যাঁচটি পাকিয়েছেন ঢাকাই অমৃতি অমনি পেশোয়ারী আখরোটের শক্ত খোসায় প্যাঁচ গেল আটকে।

প্যাঁচের পূর্ব ইতিহাস ঃ এই কেন্দ্রীয় কেবিনেটের পুনর্বাসন সাব-কমিটির সভ্য হলেন অশোক সেন। তিনি কেবিনেটের সভ্য। খান্না দেড়পোয়া মন্ত্রী। অশোক সেন সুরু করলেন খবরদারী, তৎসহ মাতব্বরী। খান্না ব্যাক বেঞ্চার হয়ে গেলেন। ফ্রেচার খান্নাকে ছেড়ে অশোক সেনের নির্দেশে কাজ করেন। খান্না গুমরান। কিন্তু প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছিল খান্নার মুঠে। নানা রকম প্রশাসনিক বাধা উপস্থিত হওয়ায় ১৯৫৮ সালে দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনায় কোন কাজই হয় নি। ১ ৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উদ্বাস্তু মোটর চালক চেয়ে দণ্ডকারণ্য কর্তৃপক্ষ পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে লেখেন। রাজ্য সরকার হাজির করেন আটাত্তর জন উদ্বাস্তু মোটর চালক দণ্ডকারণ্য কর্তৃপক্ষের সমীপে, কিন্তু একজনকেও তাদের পছন্দ হ'লো না, কারণ তারা শিবিরবাসী উদ্বাস্তু নন।

রাজ্য সরকার বোঝাতে চেষ্টা করেন যে মোটরই যদি চালাতে জানবে তবে, কেন্দ্রীয় সরকারের আইন অনুযায়ী, রাজ্য সরকার তাকে শিবিরে স্থান দিতে পারেন না।

কে বা শোনে কার কথা !

উত্তর দিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃপক্ষঃ যদি শিবিরের বাইরে থেকে বাঙ্গালী উদ্বাস্তু মোটর চালক দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনায় নিয়োগ করতে হয় তবে অন্য "সোর্স" থেকে নেওয়া হবে। অর্থাৎ দিল্লী থেকে পাঞ্জাবী।

যে আসবে সেই হবে কাত, তার জন্য কি সুন্দর ভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে। বাহাদুর বটে, বললেন গুহকদা।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুনর্বাসন দপ্তরের প্রায় সমস্ত কর্মচারীই

বাঙ্গালী উদ্বাস্তু। পরিবারের একটি ছেলে বা মেয়ের সরকারী চাকরী লাভ পরোক্ষে সেই পরিবারের পুনর্বাসন। কিন্তু দণ্ডকারণ্য পুনর্বাসন দপ্তরকে সেই সাধুবাদ দেওয়া যায় না। যেমন পরিকল্পনার প্রধান কর্মকর্তাকে আনা হয়েছে পাঞ্জাব থেকে, তেমনই প্রায় সমস্ত কর্মচারীই আনা হয়েছে অবাঙ্গালী। অথচ টাকা ব্যয় হয় বাঙ্গালী উদ্বাস্তু পুনর্বাসন খাত থেকে। ইংরেজের রাজনীতিতে পুষ্ট ব্রিটিশ ষ্টিল্ ফ্রেম। ঘৃণা করতে শিখেছে জন্ম থেকে বাঙ্গালীকে। ওরা স্কুল কলেজ ষ্ট্রাইক করেনি। ইংরেজকে গুলি করে নি। করেছে শুধু ইংরেজের কেরানীকুলের শক্তিবৃদ্ধি। তাই তারাই নিযুক্ত হয়েছে পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের দণ্ডকারণ্য পুনর্বাসন পরিকল্পনা দপ্তরে।

তাই বাঙালী কাত হয়েছে প্রথম রাউণ্ডে।

# পটল

মোরারজী দেশাই যে বৈঠকের নেতৃত্ব করেন, সেই বৈঠকে স্থির হয় যে সরকার শিল্প স্থাপন করবেন এবং পরিচালনা করবেন। উদ্বাস্তুরা সেই সব শিল্পে কর্মে নিযুক্ত হবেন। সরকার উদ্বাস্তুদের অর্থ সাহায্য করবেন না শিল্প স্থাপন করতে কারণ তাঁরা মূঢ়।

তবে তো পটল সাহেব নিশ্চয়ই বিদ্যমান সরকারী দপ্তরে, বললেন গুহকদা।

মোরারজীর পুনর্বাসন অর্থসংস্থা মৃত। তিনি খান্নাকে দশ কোটি টাকা দিয়ে রিহ্যাবিলিটেসন ইণ্ডাস্ট্রিস্ করপোরেশন খুলে দিলেন। প্রথম সভাপতি ঘনশ্যামদাস বিড়লা। পরে তিনি পদত্যাগ করেন। বর্তমান সভাপতি সুকুমার সেন।

হিসাবের কারচুপি করেছে এই সংস্থা। পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় যে সব শিল্পীকে ঋণ দিয়েছিলেন তার একাউণ্ট এই সংস্থাকে ট্রান্সফার করা হয়েছে। এঁরা বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন এমন ভাবে যা' পড়লে মনে হবে যেন এঁরাই এত অল্প দিনের ভেতর এত অর্থ ঋণ দিয়েছেন।

পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় এই সংস্থাকে কেন্দ্রীয় শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে পাচার করেছেন।

পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকাকালীন এই সংস্থা ক্ষুদ্র শিল্পকে মোট নিয়োজিত অর্থের শতকরা পঁচাত্তর ভাগ ঋণ দিতেন। বর্তমানে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ঋণ দেওয়া হয়।

এই সংস্থার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না। কারণ আই, এফ, সি, একই শর্তে ঋণ দেয়। রাজ্য এফ, সি-ও একই

সর্তে দাদন করে। তবে কেন নূতন সংস্থা স্থাপন করে বাঙ্গালা উদ্বাস্তুদের উপহাস করা ?

শেষ দিনটির কথা ভেবেই বোধহয় এই সংস্থা স্থাপিত করা হয়।

শেষ দিনটি আবার কি ? শুধালেন গুহকদা।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে কৃষির উন্নতির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। চাই ফারটিলাইজার।

১৯৬২ সালের নির্বাচনের পর পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় পাত্‌তাড়ি হয়ত গুটোবেন, রেখে যাবেন পশ্চিমবঙ্গে বাচ্চা কাচ্চা সহ পঞ্চাশ লক্ষ নতুন ইহুদী ভিখিরি।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময় নতুন ইহুদীরা ধর্মঘট করে মরবে। পশ্চিমবঙ্গে কাঠ এবং ফারটিলাইজার দুই-ই ঘাটতি।

আবার রাজ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ শিল্প লোকশানের কারবার। অন্য দিকে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রণালয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বলেছেন যে পুনর্বাসন ঋণ আদায় না করল তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে পুনর্বাসন খাতে অর্থ কম বরাদ্দ করা হবে।

দারুণ সংকট !

মুস্কিল আশান করবে আর, আই, সি !

অজ্ঞে হ্যাঁ।

কি করে ?

যদি জোনাথান সুইফ্‌ট আজ বেঁচে থাকতেন তবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এই প্রস্তাব দিতেন যে আদিম প্রথা অনুযায়ী কাঠ দিয়ে শব দাহ করা আন্‌-ইকনামক্‌। কারণ শব ভস্ম সবচেয়ে মূল্যবান ফারটিলাইজার। সুতরাং শব দাহের জন্যে বৈদ্যুতিক চুল্লী স্থাপন করা সবচেয়ে ইকনমিক। এবং এটা অতি লাভ-জনক শিল্প। নজীর হয়তো দেখাতেন কেওড়াতলার বৈদ্যুতিক চুল্লী, যা' ডাঃ রায় নিজে উদ্বোধন করেছেন।

তারপর ?

তারপর আর, আই, সি-র কাছে ঋণের জন্যে আবেদন করবার উপদেশ দিতেন। সংস্থা দেখবে যে বেশ লাভজনক শিল্প আর ঋণীও মাত্র একজন। অতি আনন্দে দাদন দেবেন নদীয়াতে দশটি, চব্বিশ পরগনায় দশটি এবং প্রতি জেলায় দুটি বারে বৈদ্যুতিক শব দাহ চুল্লী-শিল্প স্থাপন করবার জন্যে।

তোর মুখে কেউ একটু মধুও দেয় নি, বললেন দাদা গুহক।

# বিষকন্যা

প্রভু তুমি দিয়েছ বিষ, অমৃত পাব কোথা—কালিয়া নাগের উত্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে।

ছোট ছোট ছেলে, মাতৃবক্ষের অমৃত পান করে বর্ধিত হয়েছে ওদের তনু, পিতার অশ্রু দেখে কাতর হয়ে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের থিয়েটার রোডের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে গরল উদ্‌গীরণ করেছিল ১৯৫৯ সালের আগষ্ট মাসে।

অন্য কোন কাগজ নয়, কোলকাতার দি ষ্টেটস্‌ম্যান, যাঁরা অনেক অমৃতবাণী বর্ষণ করেছেন, তাঁরা আগষ্ট ১৪, ১৯৫৯ সালে Missed Target প্রবন্ধে লিখেছেন—

The Ministry of Rehabilitation speaks of difficulties, which are indeed many and formidable. But many of them were foreseeable earlier than is apparently the case. Reference, then, is made of 'teething troubles'. It will soon be time to cut the Ministry's wisdom-teeth, for which the usual time-span is twenty years and the first refugee arrived before 1947. To talk of self-helf and moral among the refugees also seems rather late in the day. Most people have probably resigned themselves to a war of attrition between the frightening problem and the Government. It may be time to think of refugees' next generation so that they may not be the same burden on society as their parents are and, on a long view, it may be greater pity than most that there has been a cut in the educational expenditure of the Rehabilitation Ministry. Unless the money was being wasted, which is not an impossibility, economy here seems the least advisable. Young, angry faces before the Rehabilitation Ministry's

office in Calcutta this week suggests that the Government might be lining up a second ganeration of agitators in West Bengal.

কমুগো জবর জুইৎ বাপগো দলে পাইছিলো, এবার পাইলো পোলাগো, মরিয়া না মরে অরি।

ফল ভুগলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। নিজের নির্বাচনী কেন্দ্র ত্যাগ করলেন।

মেড-ইজি পড়ে যদি পরীক্ষায় প্রথম হওয়া যেত তবে সবাই প্রথম হতো। ষ্টাণ্ট দিয়ে যদি পুনর্বাসন হোত তবে দি স্টেটস্‌ম্যান-এর লেখনীতে গরল বেরতো না।

দি ষ্টেটস্‌ম্যান আগষ্ট: ১৪, ১৯৫৯ "Missed Target" প্রবন্ধে লিখেছেন।

So now we know that July 31 was never seriously meant as the final for closing the last of the refugee camps in West Bengal. It was a stunt that did not work.

পশ্চিমবঙ্গে আর তিল ধারণের স্থান নেই তাই পশ্চিমবঙ্গের বাইরে শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়।

ষ্টাণ্টের চাঁদ কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়। চাঁদের কাজের হিসাব মেঘাচ্ছন্ন। শিবিরে ছিল ১৯৫৫-৫৬ সালে দুই লক্ষ সাতানব্বুই হাজার বাঙ্গালা উদ্বাস্তু। ১৯৫৬ সালে নিয়ে যাওয়া হয় বিভিন্ন রাজ্যে ছয় হাজার কুড়ি জনকে। ১৯৫৭ সালে সাত হাজার, ১৯৫৮ সালে চার হাজার। মোট সতেরো হাজার দুই শত।

তুম্বার গতি মন্থর।

রিহ্যাবিলিটেসন মেড-ইজি আবিষ্কার করে পরীক্ষায় পাশ করলো পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়।

পূর্ববঙ্গের সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়া হ'লো ১৯৫৬ সালে। বন্ধ

হয়ে গেল উদ্বাস্তু আগমন। খাঁচায় রয়ে গেল প্রায় এক কোটি নরনারী।

১৯৫৬ সালের শেষের তিন মাসে তিন লক্ষ উনষাট পূর্ববঙ্গীয় হিন্দু ভারতে প্রবেশ করবার অনুমতি চেয়েছিলেন। এক লক্ষ আশি হাজারকে অনুমতি দেওয়া হয় নি। ১৯৫৭ সালে অনুমতি চেয়েছিলেন তেত্রিশ হাজার। প্রবেশাধিকার দেওয়া হ'লো সাত হাজারকে।'

পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের মতে এই কার্যটি উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়!'

পুনর্বাসন মেড-ইজির দ্বিতীয় অধ্যায় হ'লো ১৯৫৮ সালের মার্চ মাসের পর যাঁরা ভারতে আগমন করবেন তাঁদের উদ্বাস্তু বলে গণ্য করা হবে না।

না করেছে ভালই হয়েছে, তবুও ওরা বাঙ্গালীই থাকবে, রেফো আর হবে না।

মেড-ইজির তৃতীয় অধ্যায় হলো স্ক্রিনিং কমিটি। স্থাপন করেন পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়। কমিটির কাজ হ'লো শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের "প্রাইভেট ইনকাম্" আছে কিনা তার খোঁজ করা।

পঞ্চাশ টাকা মাসিক ডোলে যেমন কোন পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন সম্ভব নয়, তেমনি দিনের পর দিন মানুষ অলস হয়ে বসে থাক্‌তে পারে না, অধিকন্তু যেথায় অভাব। কিন্তু পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের আইন অনুযায়ী শিবিরবাসীদের প্রাইভেট ইন্‌কাম করা অপরাধ।

যুগান্তর কাগজ অনেক সুধা বর্ষণ করেছেন কিন্তু স্ক্রিনিং কমিটির কার্য দেখে তাদেরও গরল উদ্‌গারিত হ'লো।

ডিসেম্বর ২৯, ১৯৫৯, যুগান্তর প্রকাশ করে যে ঘুঘুড়ি উদ্বাস্তু শিবিরের তিনশত পরিবারের খয়রাতি সাহায্য বন্ধ হয়েছে। তাদের ভেতর পিকুল মল্লিকও আছেন। তিনি বিবাহিতা। বয়স

আঠার, যক্ষা রোগে ভুগছেন। স্ক্রিনিং কমিটির অভিযোগ যে শ্রীমতীর স্বামী তার সাথে বাস করেন না। নিশ্চয়ই তার প্রাইভেট ইনকাম আছে। অতএব সাহায্য বন্ধ। শিবিরের বাসিন্দাদের নিকট থেকে যুগান্তরের সংবাদদাতা জানিতে পারেন যে শ্রীমতী মল্লিকের স্বামী কোথাও কাজ করেন না। যক্ষা রোগাক্রান্ত স্ত্রীর সাথে তিনি থাকেন না এবং সেইজন্য কয়েকদিন শিবিরে অনুপস্থিত ছিলেন। এই অপরাধে মরণাপন্ন শ্রীমতী মল্লিকের সাহায্য বন্ধ হ'লো। তিনি ১৬ই ডিসেম্বর বিনা ঔষধে ও পথ্যে মারা গেলেন।

যাক্, মহানির্বান লাভ করেছেন।

একটু আস্তে বল্, ইংরেজ শুনলে লজ্জা পাবে, বললেন গুহকদা।

স্ক্রিনিং কমিটির কার্যে এবং যম রাজার দয়াতে শিবিরবাসীর পুনর্বাসনের হিসাব প্রকাশ করেছেন যুগান্তর নভেম্বর ২৩, ১৯১৯।

স্ক্রিন করে পাওয়া গেল ক্যাম্প উদ্বাস্তদের শতকরা সত্তর জনের প্রাইভেট ইন্কাম আছে, তাদের সাহায্য বা খয়রাতি সাহায্য বন্ধ করা যায়। খান্না বললেন, "ওহে, তোমরা যদি ক্যাম্প ছেড়ে চলে যাও, নগদ টাকা পাবে। ৭।৮ বৎসর যাদের পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নরককুণ্ডের ন্যায় ক্যাম্পগুলিতে আবদ্ধ রাখা হল, কেন্দ্রীয় সরকার যাদের পেছনে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করলেন, তাদের মধ্যে কুড়ি হাজার নরনারীকে '৫৮ সালে নিঃশব্দে ক্যাম্প থেকে বিদায় দেওয়া হ'ল। "বায়না নামা" টাকার লোভ দেখিয়ে। স্ক্রিনিং এর অছিলায় আট বৎসর পরে বিতাড়িত হলেন আরও প্রায় ৫।৬ হাজার নরনারী ও শিশু। কি ভয়ানক ও নির্মম এই পরিসংখ্যান। '৫৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের ১৯০১৩ জন নরনারী পুনর্বাসন লাভ করেছে, তার পাশাপাশি দেখুন? "মৃত্যু ও বিতাড়নের" (Death and Discharge) দ্বারা সমস্যা চুকেছে ২৬৮৪১ জনের। '৫৮ সালে পুনর্বাসন ২৫৯৫৫ জন, ডেথ্ এবং ডিস্চার্জ ১৩৬০০ জন। আরও একটি তুলনা দেওয়া যায়: '৫৭ সালে ক্যাম্পে নতুন ভর্তি ৮৩০০, ডেথ্

এণ্ড ডিস্‌চার্জ ২৬৮৪১। '৫৮ সালে নতুন ভর্ত্তি ৫৩৯, ডেথ্‌ এণ্ড ডিস্‌চার্জ ১৩৬০০ নরনারী।

আরও কত ডেথ্‌ এণ্ড ডিস্‌চার্জ হবে তার হিসাব লিখবেন ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকগণ। আইখ্‌ম্যানের বিচার হচ্ছে বহুদিন পর, কেবা জানে পুনরায় আবার পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের আইখ্‌ম্যানদের বিচার হবে কিনা?

ওরা চালাক ছেলে। কাগজ ঠিক রেখেছে। রাজ্য সরকারের উপর দোষ চাপিয়েছে।

ডিসেম্বর ২৯, ১৯৫৯ সাল। কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব ধরম ভীর কোলকাতায় এক বিবৃতি প্রকাশ করেন। দি ষ্টেটস্‌ম্যান বলেন:

Mr Dharam Vira said that the State Government was as much responsible, for the issue of the notices as the Centre. The decision to issue notices was taken at a meeting on August 18 at which the State Rehabilitation Minister, Mr P. C. Sen was present. All notices were issued by the State Government according to that decision, the Union Rehabilition Ministry only dictating from time to time who should be served with notices.

নিজেদের দায়িত্ব মোচনকল্পে পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা দিয়ে রাজ্য সরকার এবং বাঙ্গালীকে স্টাণ্ট দিলেন।

ষ্টাণ্ট শব্দটির মানে কিরে?

ষ্টাণ্টের অর্থ? যুদ্ধের সময় সমস্ত খাদ্যদ্রব্য, কাপড় কণ্ট্রোল ছিল। এক ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকের কন্যার বিবাহ। তিনি এলেন সিভিল সাপ্লাই অফিসে দু' জোড়া সাড়ীর পারমিটের জন্য। আবেদনপত্র নিয়ে দেখা করলেন কণ্ট্রোলারের সাথে।

আরে ভট্টাচার্য মশাই, আপনার মেয়ের বিয়েতে মাত্র দু' জোড়া সাড়ী? তা' হবে না। এই বলে কণ্ট্রোলার তাকে

আড়াই মন চিনি, দু-মন সরষের তেল, চার জোড়া সাড়ী ও চার জোড়া ধুতির পারমিট দিলেন।

পারমিট পেয়ে ভট্টাচার্য যেন: গলে গেলেন আনন্দে, আর মনে মনে কণ্ট্রোলারকে করলেন আশীর্বাদ।

কতক্ষণ পর এক কেরাণী এসে কণ্ট্রোলারকে বললেন যে চিনি, তেল বা কাপড় কিছুই নেই ষ্টকিষ্টদের কাছে।

তা' কি আর আমি জানি না। উনি তো আমাকে গালাগাল দেবেন না, দেবেন ষ্টকিষ্টদের। এর নাম হচ্চে মোলাসেস্ অন্ দি এল্‌বো। বুঝলে?

কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় The Dandakaranya Project and the resettlement of displaced persons from East Pakistan নামে একটি বই ছেপেছেন। খুব ভাল কাগজে ছাপা হয়েছে। কত সুন্দর সুন্দর ছবি আর কত ভাল ভাল লেখা। সতের পাতায় লেখা আছে only those may reap the harvest who are, at the same time prepared to shoulder the burden of work.

ক্ষেপে গিয়েছিলেন দণ্ডকারণ্যে গিয়ে কাজ করবার জন্যে নারায়ণগঞ্জের চৌধুরী বাড়ীর বড় ছেলে হাসিময় সেন। অর্থের অভাব ছিল না। চিরকাল দেশ স্বাধীন কোরবার স্বপ্ন দেখেছেন, ফল লাভ কারাবাস। ঢাকা জেলা কংগ্রেস কমিটির সচিব ছিলেন। দেশ ত্যাগ করেন ১৯৫৪ সালে।

কাজ পাগ্‌লা হাসিময়। দণ্ডকারণ্যে গিয়ে কাজ কোরবার বাসনা হোলো। সরকারী চাকুরী গ্রহণ করবেন না কারণ, তার মতে, সরকারী চাকুরীয়া হয়ে দেশবাসীর সেবা করা যায় না। হাসিময় গান্ধীবাদে বিশ্বাসী। পরিকল্পনা করলেন সমবায় ভিত্তিতে নতুন সমাজ গড়্‌বেন দণ্ডকারণ্যে।

সচ্ছলতায় প্রতিপালিত, তাই কল্পনাবিলাসী। কল্পনা করলেন যে নিজে এবং কয়েকজন বন্ধু সমবায় সমিতির ছক্ তৈরী করবেন। প্রথম তারা হবেন সমিতিগুলির অর্গানাইজার। পশ্চিমবঙ্গের শিবিরে শিবিরে গিয়ে তাদের পূর্বতন জেলাবাসীদের খুঁজে বার করে দণ্ডকারণ্য যাবার জন্য অনুপ্রাণিত করবেন, সাহস দেবেন। তাদের সমবায় সমিতির সভ্য করে নিয়ে যাবেন দণ্ডকারণ্য। যারা ছিলেন প্রথম অর্গানাইজার তারা হবেন সমিতিসমূহের প্রথম সভাপতি। কত কল্পনা! সভ্যগণ জঙ্গল পরিষ্কার করবেন, ইট তৈরী করবেন, রাস্তা বানাবেন, গৃহ নির্মাণ করবেন, শিল্প স্থাপন করবেন, জমি চাষ করবেন।

বয়ে গেছে ভদ্রলোকের জমি চাষ করতে।

শুধু ভদ্রলোকের ছেলেরাই নয়, কৃষকপুত্র লেখাপড়া শিখলে লাঙ্গল ধরেন না। কারণ সমাজে চাষীর সম্মান নেই। লাঙ্গলকে কৌলিন্য দেবার কল্পনা করেছিলেন হাসিময়। দামোদর ভ্যালি করপোরেশনের জমি বাংগালী শিক্ষিত ভদ্রলোকের ছেলেরা চাষ করেছেন, দুটি আধমরা হেলে গরু আর কাঁধে লাংগল দিয়ে নয়, ট্রাক্টর দিয়ে। রাশিয়াতে পাওয়া যায় ছোট ছোট ছোট ট্রাক্টর, তার দামও কম।

ডোল খেয়ে খেয়ে ওদের গতরে বাত হয়ে গেছে। ডাক্লেও ওরা যাবে না।

যাবে না? জ্বলে উঠ্লেন হাসিময়। তার ডাকে হাজার হাজার নরনারী গৃহ ছেড়ে, সম্পদ ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে স্বাধীনতার যুদ্ধে, আর যাবে না তার সাথে নতুন গৃহে? ডাকার মত ডাকলে ভগবান সাড়া দেন, মানুষের তো মহৎ কাজে সারা দেওয়াই ধর্ম।

কল্পনা শুধু কল্পনাতেই রয়ে গেল, বাস্তবে আর পরিণত হ'লো না। কঠিন রাজনীতি।

দি স্টেটস্‌ম্যান নভেম্বর ২৩, ১৮৫৯, "দণ্ডকারণ্য" নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেই প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত করছি।

Very nearly nothing has been done in Dandakaranya and it could scarcely be otherwise with Minister and Administrator at loggerheads. Various dates have been set from time to time by which the Ministry of Rehabilitation is to be wound up, and on Thursday the Lok Sabha was told that "no definite period can be fixed." There have been reports that the Prime Minister wants an inquiry into Dandakaranya affairs. There should be one, but action need not await it. The first thing to do is to take the Dandakaranya project away from the Rehabilitation Ministry, and place it in other hands. Once the area is developed, which it is unlikely to be by the rufegess who have been workless from years, the Rehabilitation Ministry can send families there to live.

ফ্লেচার-বধ কাব্যের সমাপ্তিতে দি স্টেটস্‌ম্যান "দণ্ডকারণ্য" প্রবন্ধটি লেখেন। প্রধান কর্মকর্তা বিতাড়িত হলেন। জনসন, আই, সি, এস্ তার স্থলে অভিষিক্ত হলেন। কোন কাজ হয়নি সেখানে, হয়েছে কেবল রাজনীতি, যার চক্রে পড়ে ফ্লেচারকে বিদায় নিতে হলো।

দি স্টেটস্‌ম্যানের সাথে আমি একমত। দণ্ডকারণ্য উন্নয়নের দায়িত্ব অন্য কোন মন্ত্রণালয়ে আরোপ করা বিধেয়। এই পরিকল্পনার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে কেন্দ্রীয় সমাজ উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়। মন্ত্রী হলেন সুরেন্দ্রকুমার দে।

সুরেন দে। বাড়ী ছিল তার শ্রীহট্ট জেলায়। কর্মী পুরুষ। কাজ-পাগলা লোক। সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার উৎপত্তি হলো তার নিলোখেড়ী উপনগরী থেকে। নেহেরু বলেছেন পশ্চিম পাকিস্থানী উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের দায়িত্ব নিয়ে তিনি

কুরুক্ষেত্র, নিলোখেড়ী উপনগরী স্থাপন করেন। বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের জন্য তিনি ফুলিয়া উপনগরী স্থাপন করেছিলেন। স্বাধীনতার পূর্বে তিনি লাহোর সহরে কোন এক বিদেশী শিল্প-সংস্থার কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। ভারত সরকারের অধীনে চাকুরীতে নিযুক্ত থাকাকালীন কোন পারিশ্রামিক গ্রহণ করতেন না। সমাজ উন্নয়ন মন্ত্রণালয় যখন স্থাপিত হয় তখন তিনি তার মন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিনি রাজনীতির উর্দ্ধে। তিনি হয়তো পারেন দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত কোরতে।

কর্মীপুরুষ, তাই পশ্চিমবাংলা থেকে আগামী নির্বাচনের আসন সংগ্রহ করতে হয়নি। তিনি বেছে নিয়েছেন রাজস্থান। সেখানকার নাগোর জেলায় সাত একর অনুর্বর জমি ক্রয় করে স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছেন। তিনি নাগোর জেলা থেকে লোকসভার আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মুখ দিয়েও গরল উঠেছিল। পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় মার্চ ৯, ১৯৬০ সালে তিনি বলেন, "Inspite of a

previous understanding all actions relating to Dandakaranya Project were taken without consulting the West Bengal Government. This was an unsatisfactory position......The West Bengal Government had all along been urging the Centre to associate Bengalis more closely with the refugee rehabilitation in Dandakaranya. I had written again to the Centre in this connection. But I do not know how far I shall be successful in making it see reason."

ডাঃ রায়ের গরল দেখে সাময়িক চৈতন্য উদয় হয়েছিল, তাই ফ্লেচার বধের পর দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন সংস্থার সভাপতি নিযুক্ত হলেন সুকুমার সেন, কিন্তু প্রশাসনিক দায়িত্ব রয়ে গেল পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের।

শুধু হাসিময়ই দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনাতে বিশ্বাসী ও উৎসাহিত হয়েছিলেন তা' নয়, কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের বাঙ্গালী কর্মচারীগণও উৎসাহিত হয়েছিলেন। একজন তো উৎসাহের চোটে রামায়ণ কিনে দণ্ডকারণ্যের বিবরণ পড়লেন এবং সবাইকে শোনালেন।

সবাইরই শুধু 'ইচ্ছা' আর 'ফু' রয়ে গেল!

ইচ্ছা আর ফু?

বন্ধুবর সুধীন প্রথম পুত্রের জনক হলেন। ওর স্ত্রীর বড় ইচ্ছা ছেলেকে রূপোর বাটিতে গরম দুধ সোনার চামচে দিয়ে আস্তে আস্তে ফু দিয়ে ঠাণ্ডা করে খাওয়ায়।

আমি বললুম, খাওয়ালেই পারিস্।

ও বল্লে, "ভাই, ইচ্ছা আর ফু-টুকুই আছে, সঙ্গতি নেই।

ইচ্ছা আর ফু-টুকু সম্বল করে বসে আছে শিবিরের বাইরে যারা বাস করেন। কেরেলা থেকে আণ্ডার-এমপ্লয়েড সারপ্লাস কৃষক স্থান পাবে দণ্ডকারণ্যে, কিন্তু স্থান হবে না পশ্চিমবঙ্গের "আন-এমপ্লয়েড একস্ট্রা সারপ্লাস" জনসংখ্যার দণ্ডকারণ্যে। এর নাম রাজনীতি।

সারা বিশ্বে সঞ্জয় প্রচার করেছেন যে বাঙ্গালী উদ্বাস্তু দণ্ডকারণ্যে যেতে চায় না। বিশ্ববাসীকে একথা বলা হয়নি যে দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা শুধু ক্যাম্পবাসীদের জন্য। এই না বলার নাম রাজনীতি।

বিশ্ববাসীকে শুধু তাই বলা হয়নি, আরও বলা হচ্চে সে দিন আগত যেদিন কোলকাতার রাস্তায় কোন অবাঙ্গালী চলাফেরা কোরতে পারবে না, বললেন দাদা গুহক

সিন্ধি উদ্বাস্তু হাসমৎ রমানী ভালবেসে ফেলেছেন বাঙ্গালীকে। তিনি তাঁর Delhi to Calcutta via Santiniketan প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ

and that gave a lie to Big Lie, spread by a Big Business paper in Delhi that there are days when no non-Bengali can walk the streets of Calcutta.

( Hindusthan Standard, September 19, 1961 )

সব যেন ঠিক এক সূত্রে গাঁথা। তাই সুকুমার সেন খাবি খাচ্চেন, বললেন গুহকদা।

খাবি শুধু সুকুমার সেনই খাচ্চেন না, খাচ্চেন কোলকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট শম্ভুনাথকে নিয়ে। শম্ভুনাথ শিবিরে বাস করেন না, কোলকাতার পথে হকারী করতে পারেন না, রক্ত দান করে উপার্জন করতে গিয়ে হল্লার অপরাধে আসামী।

প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীশিবকুমার খান্না পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত ২৮ বৎসর বয়স্ক উদ্বাস্তু শম্ভুনাথ বারিককে মুক্তি দিয়ে এ'রূপ মন্তব্য করেন যে ক্ষুধা মিটাইবার উপযুক্ত উপায় উদ্ভাবন এবং অর্থ রোজগারের উপায় হিসাবে রক্ত বিক্রয় বন্ধ করার জন্য সমগ্র সমাজের পক্ষে সচেতন হইবার সময় আসিয়াছে। গত ৮ই জানুয়ারী কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রক্ত ভাণ্ডারের নিকট রক্তদাতাদের যে দীর্ঘ লাইন হয়, উক্ত যুবকটিকে সেই লাইনে দাঁড়াইয়া উচ্ছৃঙ্খল আচরণের জন্য গ্রেপ্তার করা হয়। প্রকাশ, যুবকটি চীৎকার করিয়া গণ্ডগোল সৃষ্টি করে এবং কলিকাতা পুলিস আইনের বিধান লঙ্ঘন করে।

অপরাধ অস্বীকার করিয়া আসামী নিজের জীবনের এক করুণ কাহিনী বর্ণনা করে। আসামী বলে যে, সেই একমাত্র তাহার পরিবারের মধ্যে রুজিরোজগার করে। বাবা, ছোট ভাই ও ভগিনী এই তিনজনকে লইয়া তাহার সংসার। কিছুকাল সে ফুটপাতে ফিরি করিয়া বেড়াইত, কিন্তু পুলিসের ক্রমাগত হয়রানির ফলে তাহাও তাহাকে ত্যাগ করিতে হয়। অন্য কোন পথ না দেখিয়া রক্ত বিক্রয় করিয়া ১০২ টাকা উপায় করার জন্য তাহাকে রক্ত ভাণ্ডারের ঐ দীর্ঘ লাইনে দাঁড়াইতে হয়। গত ৮ই জানুয়ারী ভোর

৪ টার সময়ে হাড়কাপুনে শীতে তাহাকে লাইনে দাঁড়াইতে হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত রক্তদাতাদের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়া যাওয়ায় কর্মরত পুলিস তাহাকে ও আর কয়েকজনকে পিছনে ঠেলিয়া দিয়া অন্যান্য কয়েকজনকে তথায় স্থান করিয়া দেয়। ফলে এই হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়। (আনন্দবাজার পত্রিকা, জানুয়ারী ১৪, ১৯৬২)

শম্ভুনাথদের দণ্ডকারণ্যে স্থান দেবার জন্য সুকুমার সেনও চেষ্টা করছেন কিন্তু তিনি এখনও সফল হতে পারেননি। মনেহয় শম্ভুনাথ কেন, কোন বাঙালী উদ্বাস্তুরই স্থান হবে না ওখানে। নির্বাচনের পরে সেখানে যাবে ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত ধনী পশ্চিম পাকিস্থানী উদ্বাস্তুগণ। এই বোধহয় বর্তমান কেন্দ্রীয় রাজনীতি।

একটা হাড়্‌ড়া-ফাড়্‌ড়া লাগিয়ে দেওয়া যায় না? জিজ্ঞাসা করলেন সত্য বিশ্বাস।

কি করে হবে। সুকুমার সেনের অবস্থা হয়েছে পারাঞ্জাপির মত।

কি রকম?

ক্যাপটেন কুমার পারাঞ্জাপি ছিলেন গত যুদ্ধের সময় আমাদের সহরের রেল স্টেশনের আর, টি, ও। তার অধীনে ছিলেন মাদ্রাজী খৃশ্চিয়ান, লেফ্‌টেনান্ট ইগ্‌নেসাস্। ইগ্‌নেসাস্‌কে আবার ডবল ডিউটি দেওয়া হলো। উপ-আর, টি, ও এবং জগন্নাথগঞ্জের আর, টি, ও। ইগ্‌নেসাসের একবারে চৈৎপরব। একদিন রেগে পারাঞ্জাপি চিঠি লিখলেন তার উপরওয়ালাকে, I cannot control half of Ignatious.

সুকুমার সেনও cannot control half of Dandakaranya. দণ্ডকারণ্য-এর মালিক তিন রাজ্য। শাসন ক্ষমতা ও দায়িত্ব তিন রাজ্যের। সেখানে দণ্ডকারণ্য অথরিটির কোন ক্ষমতা নেই। এমনকি যদি কোন ঠিকাদার মাল নিয়ে পালিয়ে যায় তবে দণ্ডকারণ্য

অথরিটির রাজ্য সরকারের কাছে ধর্ণা দিতে হবে পুলিসের সাহায্যের জন্যে। অথচ উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের দায়িত্ব সুকুমার সেনের।

তাই বলি বিষ কি আর সাধে উঠে। দণ্ডকারণ্যের শাসন ক্ষমতাও যদি আরোপিত হ'তো সুকুমার সেনের উপর তবে নিশ্চয়ই অমৃত বর্ষন হতো বাংগালীর কণ্ঠ থেকে।

তার উপর আছে পেশোয়ারী দাপট।

দণ্ডকারণ্য পুনর্বাসন পরিকল্পনার প্রশাসনিক ব্যবস্থা পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের হাতে। দিল্লী ও নানা রাজ্য থেকে কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়েছে। বাঙ্গালী কর্মচারীর সংখ্যা অতি নগণ্য। অথচ তারা সবাই মাহিনা পান বাঙ্গালী উদ্বাস্তু পুনর্বাসন খাত থেকে।

পশ্চিমবঙ্গ পুনর্বাসন দপ্তরের প্রায় সমস্ত কর্মচারীই ছিলেন বাঙ্গালী উদ্বাস্তু। পুনর্বাসনের সবচেয়ে সহজ পন্থা হ'লো সরকারী চাকুরী। পরিবারের একজন চাকুরী লাভ করলে সমস্ত পরিবার অন্নচিন্তা থেকে মুক্ত হয়।

> "তোরা চাইবি রেলওয়ে স্টেশনের কাছে থাকতে, তোরা চাইবি লেকের কাছে জমি। তোদের কে নেবে!"

অর্ধ শিক্ষিত কতগুলি কৃষক পরিবারকে নিয়ে গেছে জলবিহীন স্থানে আর রেলওয়ে স্টেশন থেকে শত মাইল দূরে। অথচ লাখ, লাখ একর অনাবাদি জমি পরে আছে রেলওয়ে স্টেশনের সন্নিকটে। বহু সরোবর আছে বিশাল দণ্ডকারণ্যে। সেই সরোবরের সন্নিকটে স্থান দেওয়া হয়নি উদ্বাস্তু চাষীদের। তাদের জন্য নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে।

> "অন্ধ্র, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশ সরকার রেলওয়ে ষ্টেশনের ও সরোবরের সন্নিকট জমিতে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন না করার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়েছেন"।

রাজনীতি থেকে উদ্বাস্তুর জন্ম। দ্রোণাচার্য হলেন কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়। বাধা এবং সম্বর্ধনা দুই রাজনীতি।

আমার তো ঢোরা সাপের বিষ। আমি আগামী দিনের কথা ভেবে শিউরে উঠি। তখন সব কেউটে সাপের বিষ নিয়ে নিজেরা হানাহানি করবে।

আমার ভাগ্নে তাপস, মুর্শিদাবাদের অধিবাসী, অন্নের জন্যে তাকে তীব্র প্রতিযোগিতা করতে হবে আমার পুত্রের সাথে।

কত বড় গ্লানির কথা, আমি ভাগ বসিয়েছি আমার ভগিনীর অন্নে, আমার পুত্র আমার ভাগ্নের অন্ন কেড়ে নিতে বাধ্য হবে। অথচ লাখ, লাখ বাঙ্গালী উদ্বাস্তু দণ্ডকারণ্যে বসতি স্থাপন করতে ইচ্ছুক।

যুগান্তর কাগজে প্রকাশ যে ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনার রিপোর্ট দিয়েছেন যে পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের বাস করা সম্ভব নয় এদের ভারতে প্রবেশের অনুমতি দীর্ঘকাল প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব নয়। ভারত সরকারের তরফ থেকে মাইগ্রেসন সার্টিফিকেট দেওয়ার ব্যবস্থা আরও উদার না করলে এবং অদূর ভবিষ্যতে ভারতে প্রবেশের পথ আরও প্রশস্ততর করা না হলে, পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের জীবনে একটি বিরাট ট্রাজেডিকে স্বীকার করে নেওয়া হবে। ডেপুটি হাইকমিশনারের এই রিপোর্ট এতদিনে ভারত সরকার "বাস্তব" বলে স্বীকার করে নিয়েছেন? এবং একথাও নীতিগতভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে পূর্ববঙ্গের বর্তমান সত্তর লক্ষ হিন্দুকে অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে আসার পথ ছেড়ে দিতেই হবে।

ধ্যানী ঋষির মত বসে আছে ভারত সরকার। অর্থ মন্ত্রণালয়ের কর্মচারীগণ বলেছেন যে রাজ্য সরকার যদি পুনর্বাসন ঋণ আদায়

করে না দেন তবে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পুনর্বাসন খাতে অর্থ বরাদ্দে কার্পণ্য করা হবে।

তারা বলেন যে পশ্চিম বঙ্গে পুনর্বাসন ঋণ আদায় হয় শতকরা চার পার্সেণ্ট, আর পাঞ্জাবে আদায় হয় শতকরা বাষট্টি পার্সেণ্ট।

রাজনীতির প্যাঁচটা কোথায় বুঝলেন ?

বলেননি কত পার্সেণ্ট আদায় হয়েছে ক্ষতিপূরণ ভাণ্ডার থেকে। পুনর্বাসন মন্ত্রী বলেছেন যে এযাবৎ একশত পঞ্চাশ কোটি টাকা পশ্চিম পাকিস্থানী উদ্বাস্তুদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। তা' হলে আদায়ী অর্থের শতকরা আটানব্বই ভাগ আদায় হয়েছে ক্ষতিপূরণ ভাণ্ডার থেকে।

তোরা বুঝিস্ না। কুকুরকে মারবার আগে বদনাম দিতে হয়।

কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী মে ২, ১৯৬১, লোকসভায় বলেন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পুনর্বাসন ঋণ আদায় করবার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা করছেন না। একথা কিন্তু বলা হয়নি যে রাজ্য সরকার ঋণীদের আরও অর্থ সাহায্য দেবার জন্য অর্থ চেয়েছেন।

হিসাবে দেখান হয়েছে যে বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের জন্য একশত তিরানব্বই কোটি টাকা খরচ হয়েছে। এ টাকার ভেতর প্রায় সত্তর কোটি টাকা খরচ হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে। বম্বে, রাজস্থান, হায়দরাবাদ, অন্ধ্র, মহীশূর, সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যে যে সব অর্থ পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় ব্যয় করেছেন, তা সে সব রাজ্যের "এ্যাসেট" হয়েছে কারণ কোন বাঙ্গালী উদ্বাস্তু সেখানে পাঠান হয়নি।

ধ্যান ভঙ্গ হবে ঋষির অতি শীঘ্র, বোধহয় নির্বাচনের পরেই, তখন ঝাপিয়ে পরবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপর। সুদ সমেত সমস্ত টাকা আদায় করে নেবে।

যদি না দিতে পারে ?

তবে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে যে অর্থ প্রতিবছর দেয় উন্নয়ন খাতে, তা থেকে কেটে নেবে।

রাবণের স্বর্গের সিঁড়ি আর হলো না, গড়িমসি করতে করতে তার শেষের দিনটি এসে গেল। ডাঃ রায়কে কেন্দ্রীয় সরকার খুবই সম্মান করে, তাই তিনি যা বলেন তা মেনে নেয়। যদিও তিনি বলেছেন যে উদ্বাস্তুদের দেওয়া ঋণের টাকা তার সরকার আদায় করতে পারবে না, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারকে দিয়ে সমস্ত ঋণ এখনও "রাইট-অফ্" করান হয়নি। আগামী ছয় মাসের ভেতর যদি মকুব করান না হয় তবে এ ঋণ চাপবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপর।

দি ষ্টেটসম্যান সংবাদপত্রে নভেম্বর ৯ তারিখ, ১৯৬১ সালে প্রকাশ :

The failure of West Bengal Government to classify and send data about the types and number of East Pakistan refugees, the amounts of loan they have taken, and their present economic condition, is stated to be the main factor standing in the way of the Centre arriving at a decision on the proposal to write off loans given to certain categories of these refugees.......

The States in the western region have now been given power to write off 'irrecoverable' advances ( granted to West Pakistan refugees ), not exceeding Rs. 2,000 in individual cases, without reference to Centre.

ওরে তোরা মজা দ্যাখ্! শুধু দেখে যা! ৯' তারিখের ষ্টেটসম্যান রাজ্য সরকারের জবানী ছেপেছে, বললেন গুহকদা।

The West Bengal Governments Relief and Rehabilitation Ministry finds it difficult to understand what prevents its counterpart in the Union Government from formulating certain principles concerning the writing off of loans given to certain categories of East Pakistan refugees.

A spokesman of the West Bengal Government said on Wednesday that the data regarding the amounts of loans under different heads and the number of families who obtained them and other details already given to Union Ministry before the Pujas, should have enabled it to decide the principles governing the writing off of loans. He said the details on which the Union Ministry is insisting, were for too complicated to be worked out immediatly.

For rehabilitation in rural areas, Rs 500 was given as a house-building loan and Rs 75 for land to each family. The amount given to each family of small traders was Rs 500. The amount of loans given under these heads is considered by the State Government as hopelessly insufficient for rehabilitation. It feels that the Union Rehabilitation Ministry should immediatly accept in principle the proposal to write off the loans given under these heads without insisting on the submission of highly complicated and elaborate data.

( The Statesman, November 9, 1961 )

ভাগ্যবান পশ্চিমপাকিস্থানী উদ্বাস্তুগণ! তাদের আমি ঈর্ষা করি না। ভাবি, পুনর্বাসনের দায়িত্ব একই ভারত সরকারের, তবে কেন এই বৈষম্য?

পশ্চিম পাকিস্থানী উদ্বাস্তুগণ প্রথম পেলেন সাহায্য, তারপর গৃহ বাঁধবার ঋণ, শিল্প ও ব্যবসায়ের জন্য ঋণ, তারপর ফেলে আসা সম্পত্তির জন্য ক্ষতিপূরণ, তারপর বাদ্‌বাকীর ঋণ মকুব করে করা হ'লো অঋণী।

কি করে হ'লো ?

কারণ ভারত সরকার সরাসরি তাদের পুনবাসনের দায়িত্ব পালন করেছে। আর বাঙ্গালী উদ্বাস্তু পুনবাসনের ইতিহাস আলোচনা করলে মনে হবে হিট্লার দোষী কারণ তিনি তার দেশীয় ইহুদীদের হত্যা ও বিতাড়ণ করেছেন ; ষ্টালিন দোষী কারণ তিনি তার দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের হত্যা করেছেন ; পূব ভারতের বর্তমান ইতিহাস যখন লেখা হবে তখন হয়তো খুশ্চেভের মত কেউ বলবেন যে,

নিরীহ গৃহহারা বাঙ্গালী হিন্দু আশ্রয় নিয়েছিলেন ভারত সরকারের আসাম নামক একটি রাজ্যে। তথায় ভারত সরকার অর্থ ব্যয় করে তাদের পুনবাসন দিয়েছিল। আবার ১৯৬০ সালে আসাম রাজ্যে সরকারের সাহায্যে ছদ্মবেশে কংগ্রেস, প্রজাদল ও কমিউনিষ্ট কর্মীগণ সেই বাঙ্গালী হিন্দুদের হত্যা করেছে, তাদের গৃহদাহ করেছে, তাদের নারীর সতীত্ব নষ্ট করেছে এবং তাদের বাসভূমি ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে। ভারত সরকার নিরীহ, অস্ত্রহীন বাঙ্গালী হিন্দুদের রক্ষা করবার কোন ব্যবস্থা করেনি, যদিও আসাম রাজ্য সরকারের পুলিসের সর্বাধিক বড পূর্বেই আসামে বাঙ্গালা নিধনের ষড়যন্ত্রের বার্তা ভারত সরকারকে প্রদান করেছিলেন।

তখন হবে নরেন্দ্রনাথ পালের পুনবাসন, বললেন দাদা গুহক।

শিলিগুড়ি, ৭ই নভেম্বর—নরেন্দ্রনাথ পাল আর ইহলোকে নাই। দীর্ঘ দিন চরম অভাব অনটনে দিন যাপনের পর গত রবিবারে নরেন্দ্রনাথ মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিয়াছেন।

অন্ন, বস্ত্র, পুনর্বাসনের আকুতি নিয়ে আর তিনি সরকারের দ্বারস্থ হবেন না। স্ত্রী কন্যার অনশনক্লিস্ট বিশীর্ণ মুখের করুণ চাহনি আজ তাঁকে দেখতে হবে না। ...তাঁর আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক

কিন্তু যারা আজও রয়েছেন রাণীডাঙ্গায়—রাণীডাঙ্গায় আসাম শরণার্থী শিবিরে—তারা? তাদের কী হবে?

সংখ্যায় সেই হতভাগ্যরা আজ দুই সহস্রাধিক। আজ তারাও নরেন্দ্রনাথের সহযাত্রী হতে চলেছেন।

মাস ছয় সাত হ'ল সরকারের খয়রাতি বন্ধ হয়ে গেছে। আসামে বাঙ্গালী অধ্যুষিত কোন অঞ্চলে অথবা দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসনের কাতর আবেদন-নিবেদনও নিষ্ফল হয়েছে, তবে উপায়?

পেটের জ্বালায় ছিন্নমূল উদ্বাস্তু মেয়ে-পুরুষরা বেছে নিয়েছিল সাময়িক পাথর ভাঙ্গার কাজ—কেউ কেউ চা বাগিচার পাতা তুলত। সামান্য রোজগার। তবুও কোনমতে দিনটা চলে যেত। কিন্তু কিছুদিন ধরে তাও বন্ধ। ভাগ্য অপ্রসন্ন। এখন তারা সম্পূর্ণ বেকার—দুই হাজার নারী-পুরুষ অন্নহীন, বুভুক্ষু।

দেওয়ালীর রাত্রিতে আকাশে যখন আতস বাজীর রোশনাই—সমগ্র সহর আলোর মালায় ঝলমল্—উৎসবমুখর ঘরে ঘরে আনন্দের হিল্লোল, তখন হিমালয়ের পাদবর্তী সমতল ভূমির বিজন প্রান্তরে রাণীডাঙ্গার উদ্বাস্তু শিবির অমানিশার গাঢ় অন্ধকারে অচেতন। এই প্রেতপুরীর কঙ্কালসার মানুষগুলো আজ ধুকছে ক্ষুধার তাড়নায়। প্রত্যাসন্ন মৃত্যুর বিভীষিকা তাদের চোখে মুখে।

ওরা নরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর কথা ভাবছে। সাত নম্বর ব্লকের সেই নরেন্দ্রনাথ পালের কথা। একদিন আসামকে জন্মভূমি বলেই জেনেছিল এবং শরীরটা খাড়া থাকতে থাকতেই যার আবার সেখানে ফিরে যাওয়ার বাসনা ছিল—অন্ততঃ এটুকু আশা তার ছিল—আসাম ফিরে না গেলেও দুবেলা দুমুঠো খাবার নিশ্চয়ই সে এখানে পাবে।—তাঁর নিজের দেশে পশ্চিম বাংলায়। কিন্তু ভাগ্যের এমনি পরিহাস, রাণীডাঙ্গার শিবিরেই শেষ পর্যন্ত তার প্রাণস্পন্দন স্তব্ধ হ'লো।

রাণীডাঙ্গার দুহাজার মানুষ গত রবিবার যেন স্বপ্ন দেখে উঠল। বিভীষিকাময় স্বপ্ন। নরেন্দ্রনাথ গেল। —এবার না জানি কার পালা?—খাবার তো কারও ঘরেই নেই!

( আনন্দবাজার পত্রিকা, নভেম্বর ১০, ১৯৬১ )

"শুধু নরেন্দ্রনাথ পালেরই পুনর্বাসন তখন হবে না, তখনই পুনর্বাসন হবে পুনর্বাসন অর্থ সংস্থার খাতকদের," বললেন গুহকদা।

পশ্চিম পাকিস্থানী উদ্বাস্তুগণ যারা আর. এফ. এ থেকে ঋণ পেয়েছিলেন, তাদের ঋণ ক্ষতিপূরণ ভাণ্ডারের অর্থ থেকে প্রদত্ত করে তাদের অঋণী করা হয়েছে, এবং তারা বর্তমানে সরকারের নানা শিল্প-অর্থ-সাহায্য ভাণ্ডার থেকে অর্থ লাভ করে শিল্প প্রসার করছেন।

আর বাঙ্গালী উদ্বাস্তু ঋণীদের উপর সার্টিফিকেট জারি করে তাদের সবস্ব নিলামে বিক্রয় করে টাকা আদায় করা হচ্ছে। প্রতিকার নেই। অর্থ মন্ত্রণালয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিবাদ সত্ত্বেও নির্বিকার হয়ে তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। অথচ কুড়ি হাজার বাঙ্গালী উদ্বাস্তু কোনরকমে সুদিনের আশায় প্রাণপাত করছিলেন। পশ্চিম বাংলার পথে ঘাটে তাদেরও প্রাণস্পন্দন স্তব্ধ হবে।

"কিন্তু রবিঠাকুর নিয়ে তো খুব নাচানাচি করছেন ভারত সরকার। সারা ভারতে জন্মশতবার্ষিকী পালিত হচ্ছে।"

এ হচ্ছে শ্রাদ্ধশতবার্ষিকী। বৃষোৎসর্গ করে ঘটা করা হচ্ছে। ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকগণ বোধহয় লিখবেন যে ভারত সরকার ও রাজ্যসরকার সমূহ যখন কবিগুরুর জন্মশতবার্ষিক উৎসব পালন করছিলেন এবং ১৯৬১ সালের মে মাসের উনিশ তারিখে ভারতবর্ষের আসাম রাজ্যের শৈলশিখরস্থিত রাজধানী, শিলং সহরে নেহেরু যখন উপস্থিত ছিলেন, তখন আসামেরই শিলচর নামক নগরে বাঙ্গালীগণ রবীন্দ্রনাথের মাতৃভাষা বাংলাকে আসাম রাজ্যের

অন্যতম ভাষারূপে গণ্য কোরবার জন্য শান্তিপূর্ণভাবে শোভাযাত্রা করছিলেন।

শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রা! নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির নির্দেশে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীসঞ্জীব রেড্ডী ও ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী কাছাড়ের ভাষা আন্দোলনে কংগ্রেস কর্মীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নিকট এক যুক্ত রিপোর্ট দাখিল করে মন্তব্য করেছেন যে,

"কাছাড়ে বাংলা ভাষার জন্য সংগ্রাম পরিষদের অন্দোলন শান্তিপূর্ণ ছিল। ইহা গণ-আন্দোলনের রূপ ধারণ করিয়াছিল এবং নারী পুরুষ এমন কি বালক বালিকারা পর্যন্ত উহাতে যোগ দিয়াছিল।" (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫শে অক্টোবর ১৯৬১)

এই শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রীদের উপর ভারত সরকার ও আসাম সরকারের সৈন্য ও পুলিস গুলি বর্ষণ করে এগারজনকে হত্যা করে।

কবিগুরুকে সম্মান প্রদর্শনের নবতম নীতি।

"এ নীতি নতুন নয়, প্রাচীনতম। তৃতীয় পাণ্ডবের শরে বিদ্ধ হয়ে শরশয্যায় শায়িত পিতামহ ভীষ্ম। শিরে বিদ্ধ হয়নি কোন শর, তাই মস্তক দোদুল্যমান। শোকাতুর দুর্যোধন উপাধান আনবার আদেশ দিলেন। পিতামহ তাকে নিবৃত্ত করে পার্থকে উপযুক্ত ব্যবস্থা করবার আদেশ দিলেন। অর্জ্জুন মাটিতে শর বিদ্ধ করে তদুপরি পিতামহের মস্তক স্থাপন করেন। উপযুক্ত ব্যবস্থার জন্য ভীষ্ম অর্জ্জুনকে আশীর্বাদ করেন।"

"রবীন্দ্রনাথের জাতি ও ভাষা আজ শরশয্যায় শায়িত। মালা, চন্দন তাদের জন্য নয়। আধুনিক যুগে শর অচল, তাই বুলেটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পিতামহ ভীষ্মের মত নিশ্চয়ই

রবীন্দ্রনাথ আশীর্বাদ করেছেন তার বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যকে", বললেন গুহকদা।

প্রাদেশিকতা! আসাম! স্বাধীনতার মূল্য দেয়নি আসামের কোন অসমীয় লোক, তিনি নেতাই হউন আর রাজকর্মচারীই হউন। তাই অদূর ভবিষ্যতে সেখানে কাশ্মীর নাটকের পুনরায় অভিনয় হবে।

নাগা সম্প্রদায় অসমীয় নেতা ও তাদের হিন্দি উক্ত ভাষী অনুচরদের নাগপাশ থেকে মুক্ত হবার জন্য সংগ্রামে লিপ্ত। গরুড় পাখীর আবির্ভাবের জন্য শুধু অপেক্ষা।

পাকিস্থানী মুসলমান অনুপ্রবেশ করছে। মুসলমান নেতা ও মুসলমান সরকারী কর্মচারীর অনুগ্রহে তারা আশ্রয় পাচ্ছে তাদের স্বজাতির গৃহে।

অনুপ্রবেশ করলো এক জোড়া ময়মনসিংহা মুসলমান আর এক জোড়া মুরগী, বললেন গুহকদা।

তারপর কি হলো?

তিন বছরেই সারা জঙ্গল পিল্ পিল। তারপর আদমসুমারীতে অসমীয়া মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি।

ফক্কড়ের কেইসা ফক্কড়ামী!

এবারের নাটকে গরুড় পাখীর রং কি হবে? পীত বর্ণ? আসামী কমিউনিষ্ট নেতা বলেছেন যে চীনের সাথে তারা হাত মেলাবেন বাঙ্গালীকে উচ্ছেদ করবার জন্য।

বল দূত বল, ত্বরায় বল, কি বার্তা বয়ে এনেছ অহম রাজ্য থেকে?

জাহাঁপনা! দৌত্যক্রিয়া ব্যর্থ হয়েছে।

ব্যর্থ হয়েছে! ক্ষুদ্র অহম্! আপোষ মীমাংসায় হলো না রাজী অহম্ প্রধান?

জাহাঁপনা! অহম্ প্রধান বোধহয় মোসাদ্দেকের মত তৈলবিলাসী, তাই শাজাহানাবাদকে তৈল উত্তোলনের অনুমতি প্রদানে অস্বীকৃত হয়েছেন।

অস্বীকৃত হয়েছেন? কিন্তু আমার আন্তর্জাতিক সম্মান! আন্তর্জাতিক উত্তমার্ণগণ! বিদেশী বণিকের সাথে আমার চুক্তি! সব কি ধূলায় মিশে যাবে? অহম্ এত অহং?

জাহাঁপনা! যদি অভয় প্রদত্ত হয় তবে প্রত্যাবর্তনকালে অধীনের কর্ণে চুপি চুপি একটি বাণী কয়ে গেল তা' নিবেদন করতে পারি।

অভয় দান করা হলো।

Lie heavy on him, earth, for he
Laid many heavy loads on thee.
Vanbrugh, Vanbrugh অসহ্য।

নয়াদিল্লী, ২৫শে জানুয়ারী—আসাম সরকার অয়েল ইণ্ডিয়া লিমিটেডকে তৈল উত্তোলনের লাইসেন্স মঞ্জুর করিতে অস্বীকার করিয়াছে। এই হেতু আসামে তৈল নিষ্কাশনের কর্মসূচী রূপায়ণের কাজ একবছর পিছাইয়া গিয়াছে।

আসাম গভর্ণমেণ্ট তৈলের প্রাপ্যাংশের (রয়্যাল্টি) পরিমাণ বাড়াইবার দাবি করিয়াছিল। কিন্তু তাহা অয়েল ইণ্ডিয়া লিঃ-এর পক্ষে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয় নাই। ইহাই লাইসেন্স মঞ্জুর না করার হেতু।

প্রকাশ, আসাম সরকারের কাজের ফলে তৃতীয় যোজনায় তৈল উৎপাদনের লক্ষ্য ব্যাহত হইবে।

ভারত সরকার ও বর্মা অয়েল কোম্পানীর যৌথ (আধা আধি হারে) উদ্যোগে অয়েল ইণ্ডিয়া লিঃ গঠিত।......

এ হেন অবস্থায় আসামের এই মনোভাবকে ভারতীয় ও বৈদেশিক

তৈল বিষয়ক পর্যবেক্ষকগণ 'মীমাংসাবিমুখ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

( আনন্দ বাজার পত্রিকা, জানুয়ারী ২৬, ১৯৬২ )

না, না, জাহাঁপনা, অধৈর্য হবেন না।

তবে কি করবো ?

নতুন তৈলনীতি অবলম্বন।

কি সেই নীতি ?

দাও তেল, আরও তেল, আরও আরও আরও তেল, সেই তেলে মিলিবে তেল।

কিন্তু ওখানকার শাসনে বিশৃঙ্খলতা, আর অরাজকতা ? দিল্লী সরকারের উচিত হবে না তৈলরাজের কার্যকলাপে নাক গলান।

প্রতিকার হ'লো না। বাঙ্গালী মারণযজ্ঞের দোষীদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের জন্য ভারত সরকার একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছিলেন। কিন্তু ফক্কড়ের চালবাজীতে ত্রিপাঠী হয়ে ভারত সরকার তদন্ত কমিটির বিলোপ করেছেন।

বাঙ্গালীর প্রতিকারহীন বেদনার কথা লিখতে লিখতে আমার মনে এলো রহমান মাষ্টারের কথা।

রহমান মাষ্টারের বাড়ী ছিল হুগলী জেলার ভদ্রকালী গ্রামে। অতি সজ্জন ব্যক্তি। মাষ্টার মহাশয়ের এক পুত্র ডাকঘরের কেরাণী ছিলেন। তিনি পাকিস্থান 'অপট্' করেছিলেন এবং ঢাকা সহরের ডাকঘরে 'পোষ্টেড্' হয়েছিলেন।

উত্তর ভারত ও পশ্চিম পাকিস্থানের পাঞ্জাব প্রদেশের দাস ভাষা উর্দ্দু। উর্দ্দু যখন বাঙ্গালী মুসলমানের রাষ্ট্র ভাষা করতে চেয়েছিল পাঞ্জাবী মুসলমান, তখন 'ভাষা-অত্যাচার' রোধ কল্লে ঢাকায় বাঙ্গালী মুসলমানগণ আন্দোলন করেন। আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন রহমান মাষ্টারের যুবক পুত্র, সরকারী ডাকঘরের কেরাণী। হুগলীর ছেলে, নিজ মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য ঢাকা সহরের পথের ধুলায় পশ্চিম পাকিস্থানী পাঞ্জাবী পুলিশের গুলি বিদ্ধ হয়ে শহীদ্ হলেন।

"মৃত্যু! সে তো আসবেই। তবে দুঃখ যে শেষ-দেখা দেখতে পেলুম না", বলেছিলেন রহমান মাষ্টার আমাকে, যখন তার সাথে দেখা করতে গিয়েছিলুম।

আজকের এই প্রতিকারহীন বেদনাকে কি শত্রু মনে করবো? অশ্রুর পর কি অমৃত উঠবে না?

মহাবীর পাতালপুরী জয় করেছেন। চণ্ডী উদ্ধার হয়েছে।

মহাবীর ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, যাঁর বাংলাকে সেবা করা ভিন্ন অন্য কোন রাজনীতি নেই, পাতাল জয় করে এসেছেন।

ডাঃ রায়ের আমেরিকা বিজয় পর্ব দেখে আমার 'Cyclonic Hindu' স্বামী বিবেকানন্দের কথা মনে পড়ে।

বাঙ্গালীর অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য আমেরিকা সাহায্য ভাণ্ডার নিয়ে এগিয়ে এসেছে। কিন্তু?

কিন্তু অতীত অভিজ্ঞতা আনে প্রাণে ভয়।

ইংরেজ আমলে বাংলার সমস্ত অর্থ কোলকাতাকে সুন্দর কোরবার জন্য ব্যয় হয়েছে। সচল অর্থকে সিমেণ্ট কংক্রিটে রূপান্তরিত করে নিশ্চল করা হয়েছে।

বাঙ্গালী মরেছে অনাহারে, রোগে, শোকে আর "কোলকাতা

ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট” গড়ে নতুন নতুন রাস্তা ও অট্টালিকায় বাংলার অর্থকে কবরস্থিত করা হয়েছে।

বাঙ্গালী তার প্রতিকারহীন বেদনার মধ্যেও তার নিজস্ব সাম্যবাদের স্বপ্ন দেখে।

স্বপ্ন দেখে আমেরিকা থেকে হাজার হাজার শিল্পের যন্ত্র এসেছে। প্রতি গৃহে তা' হয়েছে স্থাপিত। মহাবীর চান্‌নি কোন সিকিউরিটি, যন্ত্র দেবার সময়। বিশ্বাস করেছেন মানুষকে। মনের তাই হুস্ হয়েছে। দিবারাত পরিশ্রম করছে নরনারী মহাবীরের মহত্ব রক্ষার জন্য। কোথাও অর্থ নিশ্চল হয়ে যায়নি কংক্রিট বা মোসেক ফ্লোরে। বাঙ্গালী বলেছে আমাদের শিল্প থেকে প্রদত্ত রাজস্ব থেকে করা হবে রাস্তা ও অট্টালিকা। প্রয়োজন নেই পাতালপুরীর থেকে প্রাপ্য অর্থ দিয়ে ঘর 'এয়ার- কণ্ডিসন্' করার। যাদবপুর, শিবপুর কলেজের সব ছেলেরা উৎসাহে লেগে গেছেন নতুন বাংলা গড়বার জন্য। কেজরীওয়াল, বিড়লা গোষ্ঠী বাংলার রাজনীতি ও অর্থনীতি থেকে বিদায় নিয়েছে। সাথে সাথে খাদ্যে ও ঔষধে ভেজাল বন্ধ হওয়াতে বাঙ্গালী ফিরে পেয়েছে তার স্বাস্থ্য। সমস্ত ভারত এগিয়ে এসেছে রামানুচরের কাছে স্বাধীনতার পাঠ নিতে।

কল্পনাবিলাসী বাঙ্গালী। তাই ইতিহাস পড়িস্ নে তোরা, বললেন গুহকদা।

তাই তো?

In flat contradiction is the ostentatious and lavish programme of building to which some Governments have committed themselves. When heavier taxation is being levied on even the poorest, architectural extravagance more than ever offends eye and mind. If taxpayers are to be saddled with bigger loads, they can ask that no part

of it will be due to the squandering of funds on unnecessary bricks and mortar.

(Palatial Waste, The Statesman, June 1, 1957)

আমাদের নন্দদুলাল আবার আদর্শবাদী গান্ধীবাদী। বেলঘরিয়ার বস্তিতে বাস করে গান্ধীর বাণী—

স্বাধীন ভারতবর্ষে নয়াদিল্লীর সুরম্য প্রাসাদ ও দরিদ্র শ্রমিকের জীর্ণ কুটির—এই দুই বিসদৃশ জিনিস একদিনও থাকতে পারে না—

আঁকড়ে স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছেন।

গান্ধীর বাণী আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল 'মথুর ভবন'।

কেন ?

মথুরবাবুর ছেলে আমার সহপাঠি ছিলেন। বন্ধুর অনুরোধে এক ছুটিতে তাঁর গাঁয়ের বাড়ীতে বেড়াতে যাই। বিরাট প্রাসাদ। ফটকের দেয়ালে সিমেন্ট দিয়ে বড় বড় করে লেখা 'মথুর-ভবন'। কিন্তু এ কি নেহারি! কালপ্রবাহের কাছে নতি স্বীকার করে নামফলকের 'থু' গেছে ভেঙ্গে, দাঁড়িয়ে আছে শুধু 'ম-র'।

আচ্ছা! তোরা বল্‌তো গান্ধীর আকার এবং ঈকার ভেঙ্গে ভেঙ্গে গেলে কি দাঁড়ায় ?

কি দাঁড়ায় ? কি দাঁড়ায় ?

ভেবে নে। দূরমুশের ঘা-এ শুধু গান্ধীর আকার ঈকার ভেঙ্গেই কুৎসিত গন্ধ বাড় করেনি, গৃহহীন কিন্তু প্রাণবন্ত বাঙ্গালীর কলিজা চূর্ণ করে তাজা রক্তগন্ধ দেশময় ছড়িয়েছে। প্রাসাদের প্রাণহীন প্রস্তরের আর্তনাদ শুনে যেমন হাসে দূরমুশ, তেমনি গর্বিত হাসি হাসে 'ধনীকুল গৃহহীনের গৃহের লাগি' আর্তনাদ শ্রবণে,—বললেন দাদা গুহক।

কোন্ প্রাসাদ, দাদা ?

এই জন্য তোদের সাথে কথা বলে সুখ নেই। 'আ' কইলে যদি আখাউড়া না বুঝিস্ তবে কেন আসিস্ কপ্ চাতে ?

নির্বোধ আমি। করুন মার্জনা।

শান্ত হলেন দাদা গুহক। তারপর বললেন, তবে শোন্। জীবনবীমা প্রতিষ্ঠান কিনেছিল দ্বারভাঙ্গা প্রাসাদ। তর্ তাজা প্রাসাদটি দিল গুড়িয়ে। পয়সার এত দেমাক।

এত পয়সা পেল কোথা থেকে ?

ব্যাংক রান্ হয় কিন্তু জীবনবীমা প্রতিষ্ঠানে রান্ নেই। আর আমাদের দেশের বড়লোকেরা ধর্মঘট করে মরে না। সবার উপর তোরা সত্যি।

আমরা ?

ঐ প্রতিষ্ঠানের পূর্ব বাংলায় একটি শাখা কার্যালয় ছিল। তোরা অনেক জীবনবীমা করেছিলি।

তা' তো করেছিলুম।

এখন ক'জনের পলিসি জীবিত আছে ?

বেশীর ভাগই হয় ল্যাপস্, নয়তো পেড্-আপ। পলিসির কাগজগুলি দেখে নয়ন সার্থক করছেন।

তোদের এই ল্যাপস্ ও পেড-আপ পলিসির টাকা পেয়ে দম্ভভরে গুড়িয়ে দিলো দ্বারভাঙ্গা প্রাসাদ। অঙ্ক কষে কি দেখেছিস্ কত কোটি টাকা তোদের গেছে জীবনবীমার গহ্বরে ?

না তো।

তা দেখবি কেন ? শুধু সজল নয়নে তাকিয়ে তাকিয়ে অর্থনীতির ফরমূলা আউড়িয়ে ভাববি যে দ্বারভাঙ্গা প্রাসাদ না ভেঙ্গে, এবং তদুপরি সৌধ নির্মাণ করে জাতীয় অর্থ কবরস্থিত না করে, গৃহহীনদের জন্য ছোট ছোট গৃহ নির্মাণ করে 'গৃহ-

পলিসি' চালু করলে জাতীয় অর্থনীতির কাঠামো হত দৃঢ়। প্রশান্ত মহলানবিশের কাছে গিয়ে Statistic বের কর।

তাই তো।

আর বোধহয় দাবীও করিস্নি তোদের ল্যাপসড্ পলিসি-র টাকা ফেরত পাবার জন্য ?

না তো।

তা করবি কেন ? তবে যে পিতৃপুরুষের পিণ্ডে জলদান হ'তো।

এখনও তো পারা যেতে পারে! জীবনবীমা এখন কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবসা।

তোর আশা আকাশচুম্বী। এদের চিনিসনি ? ওরা হ'লো ন্যাশন্যালাইজ ব্যুরোক্র্যাটস্।

এদিকে দূরমুশ, ওদিকে ন্যাশন্যালাইজ হাঙ্গর। আমরা যে 'হাক্রাইন্' হ'য়ে গেলুম !

তোদের চির-সংক্রান্তি।

নন্দদুলাল বুঝি স্টেটস্‌ম্যানের বাণীও শোনেননি, বললেন কুশল।

As a city of palaces—which it has long ceased to be—Calcutta is being outstripped by New Delhi. Parliament Street has lost its former semi-rural appearance and is developing a skyscraper complex. Colossal piles are up or going up, in other parts of the capital, in such a variety of styles, that what the final pattern will look like, can only be conjectured. Unless economy is imposed, the end is no where in sight, fresh proposals constantly come to view, such as, one to construct a 'multi-storeyed' office building, after demolishing one of the bunglows in Queen Victoria Road. Authority with proliferating activity must

undoubtedly have a roof over its head ; but must the roof be so expensive ?......At any rate, a halt should now be called......

( 'Palatial Waste', The Statesman, June 1, 1957 )

স্বপ্ন, শুধু স্বপ্নই রয়ে গেল তোদের, বললেন গুহকদা।

শ্রীমতী রেণুকা রে-র সেই প্রবন্ধটি আবার মনে এলো। তিনি লিখেছেন,

In the earlier years there was a feeling in some quarters that this was a temporary problem and the migrants would go back, with the consequent result that the rehabilitation was postponed till a later date......At the end of 1952 a two year plan of settlement was drawn up......But again all the schemes and plans were seriously affected when, from the beginning of 1954 to the middle of 1956, the rate of influx went up tremendously, adding another million to the refugee population......

During the first five-year period there was no attempt to integrate either the budget or the work of rehabilitation with the Plan. In the budget of Second Plan rehabilitation has been included.

একটা জাতিকে নিশ্চিহ্ন করবার কি সুন্দর পরিকল্পনা। কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী বলেছেন যে একশত তিরানব্বুই কোটি টাকা বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের জন্য খরচ হয়েছে। কত টাকা শিল্প স্থাপনের জন্যে খরচ হয়েছে দু' পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে ?

আর, এফ, এ দিয়েছে প্রায় তিন কোটি টাকা, আর পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় প্রায় এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা, মোট চার কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। বাকী টাকা ?

সরকারী কর্মচারীর বেতন, টি, এ, আর ডোল। অতি সামান্য ব্যয় হয়েছে শিক্ষা ও গৃহ ঋণের খাতে।

তাই বলি পাতালপুরীর টাকাও যদি কর্মচারীর বেতন, টি, এ, অলিখিত ডোল আর রাস্তা ঘাটে ব্যয় হয়ে যায়? বললেন গুহকদা।

বাঙ্গালী আশ্চর্য হবে না। পাঠান, মোগল ও ইংরেজ শাসকগণের নীতি ছিল শাসিতকে নির্জীব করা, তার প্রাণশক্তি ধ্বংস করা। ইংরেজের শাসন নীতি দিল্লীর শাসন দপ্তরে প্রচলিত। কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন নীতি হ'লো বাঙ্গালীর initiative-কে খর্ব করা।

আবার শ্রীমতী রে-র প্রবন্ধটিতে ফিরে যেতে হয়।

তিনি লিখিছেন,

> As the population in the transit camp was a direct charge on the Government, the tendency had always been, and more especially upto 1954, to give priority of rehabilitation to them···The result was that the earlier arrivals who had shown initiative in finding temporary dwellings, or even acquiring land on their own, had to wait indefinitely for assistance from the Government. This not only encourages later arrivals to enter camps in larger numbers but also had the injurious effect of crippling all initiative.

আজও, ১৯৬১ সালেও একই নীতিতে কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত হচ্ছে। শ্রীমতী রে-র উক্তি থেকে পাওয়া যায় দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার সরকারী নীতির সিক্রেট।

ক্যাম্পবাসীগণ কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব। তাই তাদের স্থান দেওয়া হবে দণ্ডকারণ্যে। ক্যাম্পের বাহিরে যে ত্রিশ লক্ষ বাঙ্গালী উদ্বাস্তু আছেন তাদের cripple all initiative এর নাম রাজনীতি।

ভবিষ্যতের ক্রুশ্চেভ কি বলবেন অতদিন আর অপেক্ষা করতে হ'লো না, আমাদের ক্রুশ্চেভ কি বলেছেন তাই পড়ে ছাখ, বললেন গুহকদা।

তাই তো! প্রধানমন্ত্রী গত ১৯৬১ সালের ৩০শে অক্টোবর বলছেন,

An analysis of the position would show that while some parts of India had gone ahead with the movement, other parts were lagging behind. This kind of backward movement was extraordinary......while the third were the States of Rajasthan, U. P, M. P., Kerala and Jammu and Kashmir. Assam, Orissa, Bihar and West Bengal came last. There has been no progress at all—almost a state of death—in the co-operative sector in these States.

( The Statesman, October 31, 1961 )

•

"কভু কালী, কভু বনমালী" রূপে বিরাজমান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমবায় দপ্তর, তাই কোপারেটিভ আন্দোলনে জনগণের মনে উৎসাহ আনতে পারেনি; কিন্তু নতুন নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী "টেক্‌নিকাল-এক্সপার্ট" আমদানী করা হয়েছে বেসরকারী শিল্প সংস্থা থেকে। কোন উচ্চ শ্রেণীর যন্ত্রবিদ্ সাধারণত বেসরাকারী চাকুরী ছেড়ে সরকারী চাকুরী গ্রহণ করেন না, কারণ বেসকারী চাকুরীতে সুযোগ, সুবিধা ও অর্থ-প্রাপ্তি অনেক বেশী। যারা বেসকারী শিল্প সংস্থার চাকুরী ছেড়ে সরকারী চাকুরী গ্রহণ করেন তারা তৃতীয় শ্রেণীর যন্ত্রবিদ্, অর্থাৎ "ঘষে, ঘষে" যন্ত্রবিদ্।

ম্যাট্ মার্কা বল্, বললেন গুহকদা

ম্যাট্ আবার কি?

অনিলের দাদা, বৌদি সবাই M. A পাশ। অনিল তার নামের পেছনে লেখে M. A., আর ছোট্ট করে লেখে T, দেখা যায় কি না যায়। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'কিরে অনিল M. A-র পেছনে আবার ছোট করে T লিখিস্ কেন? জবাব দিল, "ম্যাট্রিকুলেসন্। যদি কেউ T না দেখে তবে M. A, দাদা বৌদির সমান বিদ্বান ভাববে'।

সমবায় সমিতির কি রূপ? হয় সরকারী কর্মচারী সভাপতি হবেন, নয়তো কোন সরকারী কর্মচারী 'Executive Officer' হয়ে সমিতি পরিচালনা করেন। আর তথাকথিত ম্যাট্ মার্কা কর্মচারীগণ বলেন,

দপ্তরের কেউ কোন কাজ করে না, সব আমাকে করতে হয়। ভোর আটটায় আসি, আর রাত দশটায় বাড়ী ফিরি"।

ভাগ্যিস্ লর্ড কর্জন নেই, তা, না হ'লে জবাব পেত যে তোমাকে কাজ করবার জন্যে সময় দেওয়া হয়েছে সকলে দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত। তুমি কাজ শেষ কোরতে পার না কেন? হয় তুমি মিস্ফিট, নয়তো এত রাত পর্যন্ত সরকারী দপ্তরে থাকার অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে," বললেন গুহকদা।

পরিণাম হয়েছে, কোন উদ্যমশীল ব্যক্তি যদি সমবায় সমিতির মাধ্যমে কোন শিল্প স্থাপন করবার প্রচেষ্টা করেন, তবে প্রথম বাধা আসবে সমবায় দপ্তরস্থিত ম্যাট্ মার্কাদের কাছ থেকে, কারণ যার উদ্যম আছে, তিনি কখনই সরকারী কর্মচারী executive officer দিয়ে সমিতি পরিচালনের পক্ষপাতী হবেন না। এবং পক্ষপাতী হবেন না বলেই সমবায় ভিত্তিতে পশ্চিম-বঙ্গে কোন মাঝারি বা বৃহৎ শিল্প স্থাপিত হয় নি। তাই লোকের

বিশ্বাস জন্মেছে যে সমবায় সমিতির মাধ্যমে কাজ করতে গেলে initiative নষ্ট হয়, এবং সমবায় সমিতি পরিণত হয়েছে—

By the Government, for the Government officers, and the losses are to be borne by the state, out of its vast impersonal resources, obtained by compulsion from the people.

ওরা হ'লো ন্যাশনেলাইজড্ ব্যুরোক্রাট্স, বললেন গুহকদা।

সেটা আবার কোন জীব ?

বাচ্চা ছেলেরা কলেজ থকে বেরিয়ে এসে চাকুরীর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে চাকুরীতে ঢুকে, হয় শুধু ব্যুরোক্রাট। আর বুড়ো বয়সে তদ্বির-এর জোরে বিনা পরীক্ষায় ন্যাশনাল লীডারদের খুটির জোরে যারা চাকুরী পান তারা হ'লেন ন্যাশনালাইজড ব্যুরোক্রাটস্।

তারপর ?

মন না রাঙায়ে কি ভুল করিলি গো, শুধু কাপড় রাঙায়ে যোগী, আবৃত্তি করলেন গুহকদা, তারপর বললেন, লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন।

তাই তো! "ত্রুটিপূর্ণ পরিকল্পনা রচনা, অনুমানভিত্তিক ব্যয় বরাদ্দ এবং যথা সময়ে কর্তব্যবিমুখ কর্মচারিগণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন না করার জন্য পাবলিক একাউণ্টস কমিটি তাহাদের রিপোর্ট দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশনের কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন।

১৯৫৯-৬০ সালের ডি. ভি. সি-র হিসাবপত্র সংক্রান্ত পাবলিক একাউণ্টস্ কমিটির রিপোর্ট আজ লোক সভায় পেশ করা হয়।"
( আনন্দবাজার পত্রিকা, ডিসেম্বর ৭, ১৯৬১ )

অনুমানভিত্তিক ব্যয়বরাদ্দ সম্পর্কে কমিটি তাহাদের রিপোর্টে বলিয়াছেন যে একটি দফায় কার্যত যে ব্যয় হইয়াছে, তাহা আনুমানিক ব্যয়বরাদ্দের ৫১ গুণের অধিক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ছয় গুণ ব্যয় হইয়াছে। কর্পোরেশন স্বীকার করিয়াছেন যে, সংশ্লিষ্ট এঞ্জিনীয়ার বাস্তব ব্যয় বরাদ্দ সম্পর্কে প্রাথমিক ব্যবস্থাও অবলম্বন করেন নাই।

তারপর কি হ'লো, জিজ্ঞাসিলেন দাদা গুহক।

টেক্‌নিকাল এক্সপার্ট সেরেফ্ হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

হাওয়ায় মিলিয়ে গেল! বলিস্ কি?

The committee said that since timely action was not taken by the Corporation some of the delinqueut officials had escaped punishment. In certain cases, officers with questionable record had joined other public undertakings, ( The Statesman, December 7, 1961 )

তা হ'লে পাতালপুরীর অর্থও যদি দামোদরী হয়ে যায়?

তবে সমস্ত জাতির কাশী হবে ফাঁসী।

কাশী হবে ফাঁসী! সে কি রে?

এক ডাকাতকে এক জ্যোতিষী বলেছিলেন যে কাশীতে মৃত্যু হবে। জ্যোতিষীর বাক্য বিশ্বাস করে ডাকাত তো কাশী ভিন্ন সমস্ত স্থানে ডাকাতী, খুন, লুট সুরু করলো পুরোদমে। ভুলেও কাশীতে আসে না। একদিন ডাকাত তো পড়ল ধরা। মহা আনন্দে সে জেলে আছে। কাশী ভিন্ন হবে না তার মৃত্যু। বিচার হয়ে গেল বিচারে ফাঁসির আদেশ হ'লো। তবুও তার আনন্দ কমে না। ফাঁসির দিন এলো ঘনিয়ে। জেলার জানতে চাইলেন তার কোন বাসনা আছে কিনা? সে জানাল যে জ্যোতিষীর সাথে দেখা করতে চায়।

জ্যোতিষী তো এলেন। ডাকাত তার কর রেখা তাকে দেখ্‌তে দিয়ে বলে যে আপনি বলেছিলেন কাশীতে আমার মৃত্যু, কিন্তু এরা যে আমায় এখানে ফাঁসি দিয়ে মৃত্যু ঘটাতে চায় ?

জ্যোতিষী অনেকক্ষণ কর-রেখা দেখে বললেন, "ক-এর মাথাটা একটু ফাঁক হ'য়ে গেছে"।

বাঙ্গালীর 'ব'-এর মাথায় শুড় গজিয়েছে, তাই বাঙ্গালী তার ত্যাগের, তার দানের ইতিহাস ভুলে গিয়ে বাঁচবার জন্যে দাবী করতে লজ্জিত হন, ঠিক যেন কাঙ্গালী। ভাবেন তিনি নিঃস্ব, বোঝাসম হয়ে আছেন কেন্দ্রীয় সরকারের উপর। কিন্তু তা' নয়।

গত কয়েক বছর বাঙ্গালীর দান তার পূর্ব গৌরবের ঐতিহ্য বজায় রেখেছে।

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ। স্যার জন উডহেড কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী পনর লক্ষ বাঙ্গালী মাত্র কয়েক মাসে অনাহারে মারা গিয়েছে। ইংরেজ, ও অবাঙ্গালী মুসলমান ও হিন্দু শ্রেষ্ঠকুল, তদন্ত কমিটি লিখেছেন, অতিরিক্ত মুনাফা করেছে প্রতি শবে এক সহস্র মুদ্রা। অবশ্য নেহেরু বলেছেন মৃত্যুর সংখ্যা ত্রিশ লক্ষ। স্যার উডহেডের মতে মুনাফাকারীগণ খাদ্য দ্রব্যের ব্যবসাতে কয়েক মাসে অতিরিক্ত মুনাফা করেছে দেড়শত কোটি টাকা।

দে-ড়-শ-ত-কো-টি-টা-কা ! মনে এলো লখ্‌নৌতে ৫ই অক্টোবর ১৯৫৪ সালে দরদী দেশনেতা জবাহরলাল নেহেরুর উক্তি—

There is much talk about war-criminals. The time is not far off when we shall prepare one list of anti-national criminals, those who mercilessly crushed the spirit of our

patriots, who opened fire on them, who accepted bribes and sucked the blood of the poor, We shall never forget them.

"Sucked the blood of the poor" উক্তি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল নন্দলাল সিংহের বড় ছেলের কাহিনী।

নন্দলাল সিং বিরাট জোতদার। তিনি অতি নিম্ন অবস্থার থেকে ধনী হয়েছিলেন। তার ব্যবসা ছিল তেজারতী লোককে চক্রবৃদ্ধি সুদে টাকা ধার দেওয়া। ঋণ পরিশোধে অসমর্থ কৃষকদের গ্রাস করে তিনি বিরাট জোতদার হয়েছিলেন।

এক মধ্যাহ্নে সিং মহাশয় বিরসবদনে, চিন্তান্বিত মনে তার বৈঠকখানায় বসে আছেন, এমন সময় প্রবেশ করলেন তার এক খাতক, বৃদ্ধ রমেশ ঢালি।

আইজ যা'গা রম্‌শা। আইজ আমার মনজ খরাপ, কথাবার্তা হইবো না।

কি হইল্ কত্তা ?

বড় পোলাডার গলা দিয়া রক্ত বাইর হইতেছে।

হঃ! রাইজ্যে তামাম খুন একা শুইস্‌ছুইন্, কিছু তো বাইর হইবোই।

ইংল্যাণ্ড যখন ভারত সরকারকে তার পাওনা স্টার্লিং-এর পরিমান হ্রাস করতে বলেছিল, কারণ যুদ্ধে ভারতের বিশেষ ক্ষতি হয় নি, তখন ভারত সরকার বলেছেন যে বংলার ভীষণ ক্ষতি হয়েছে। দুর্ভিক্ষে মৃত ব্যক্তিগণ হলেন বাংলার ক্ষতি। এই ক্ষতি ইংল্যাণ্ডকে স্বীকার করে নিতে হয়েছিল, এবং ভারত লাভ করেছেন প্রভূত স্টার্লিং।

প্রমাণ ?

বাঙ্গালীর কোন সংবাদপত্র নয়, কারণ দিল্লী সরকারের মতে বাঙ্গালীর সংবাদপত্র প্রাদেশিকতার দোষে দোষী। তাই ইংরেজের সংবাদপত্র দি স্টেটসম্যানএর গত মে ৩, ১৯৫৩ সালের সম্পাদকীয় মন্তব্য থেকে উদ্ধৃত করছি।—

Mr Nehru is reported to have told an audience at Jalgaon on Sunday that India did not suffer much from the war. Yet, earlier the some day, speaking at Parola, he mentioned the Bengal Famine in which he is reported to have said, 3,500, 000 people died. At the time, estimates of the number who perished were smaller; the Woodhead Commission's figure was 1,500,000. But that was terrible enough and though lack of foresight and administrative shortcomings were largely to blame, nobody doubted, in Bengal at least, that the war was the underlying cause and in his 'Discovery of India' Mr Nehru himself has pointed to it. When it was later argued that the sterling balances should be scaled down because these might be regarded as India's contribution to a war from which she has suffered little, it was strongly emphasized in this country that Bengal has suffered very heavily indeed.

তারপর স্বাধীনতার মূল্য দিতে বাঙ্গালী নিজ বাসভূমে হ'লো পরদেশবাসী।

শুধু তাই নয়। আয়কর, আবগারী শুল্ক, কাষ্টম শুল্ক ইত্যাদি রাজস্ব আদায় করেন কেন্দ্রীয় সরকার।

পশ্চিমবাংলা ক্ষুদ্র, কিন্তু কেন্দ্রীয় তহবিলে আয়কর, আবগারী শুল্ক বাবদ তার দান সর্বাপেক্ষা অধিক।

পশ্চিমবাংলার ছেলেমেয়েরা ভাল বিদ্যালয়ে পড়তে পারে

না, কারণ অর্থাভাব, কিন্তু তাদের দেওয়া রাজস্ব খরচ হচ্ছে উত্তর-প্রদেশে, হিন্দিকে সর্বভারতীয় ভাষা করবার জন্য।

আসাম সরকারের নিজস্ব রাজস্ব কোলকাতার করপোরেশনের রাজস্বের সমান। আসামের ঠাট বজায় রাখবার জন্য কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে প্রতি বছর অর্থ সাহায্য নিতে হয়।

মনভোলা বাঙ্গালী, তাই ভুলে যায় শলচরে গত উনিশে মে যে এগারটি বাঙ্গালী আসাম সরকারের গুলিতে হত হন, যাঁদের আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভ্যগণ দুর্গাপুর অধিবেশনে গত আটাশে মে তারিখে দশ মিনিট মৌন হয়ে দণ্ডায়মান ছিলেন, সেই এগারটি বুলেটের মূল্যও বাঙ্গালী দিয়েছেন।

অবশ্য পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী এবার কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে মোটা অংশ দাবী করেছেন ফাইনান্স কমিশনের কাছে।

ডাঃ রায় কি পারবেন অযোধ্যাওয়ালাদের সাথে?

ভগবানকে পর্যন্ত ল্যাং দিয়েছে।

ভগবানকে ল্যাং?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

নররূপী নারায়ণকে চোদ্দ বছরের জন্য বনবাসে পাঠিয়ে চোখের জলে নাকের জলে এক কোরে ছেড়েছে।

সীতা হলেন হরণ। রাম রাবণে যুদ্ধ। কিন্তু অযোধ্যাবাসী যায় নি লঙ্কায় সীতা উদ্ধার কোরতে।

রামচন্দ্র ফিরে এলেন সীতা উদ্ধার করে। নানা স্তব স্তুতি করে অযোধ্যাবাসী স্বপদে বহাল রইলেন। সেনাপতি হনুমান জাম্ববান সব গাছে গাছে চড়তে লাগলেন।

সীতার বোধহয় একটু সহানুভূতি জেগেছিল হনুমানের জন্য, অমনি অযোধ্যাবাসীরা এইসা ল্যাং দিল যে মা জানকী পাতালে প্রবেশ করতে বাধ্য হলেন।

কিন্তু এই ল্যাং-এর বাহাদুরী ছাখ্। নো-শোক, অশোক। ল্যাং খেয়ে রামের শোক করবার কোন অধিকার ছিল না। কি রকম মিলে গেছে ছাখ্। বাঙ্গালীদের যখন আসামে ঠেঙ্গালো তখন অযোধ্যাবাসিগণ নো-শোক অশোক সেনকে পাঠালো আসামে।

কিন্তু এত গরল উঠেছিল যে রামচন্দ্রকে সরযূর জলে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছিল।

একটু আশার আলো কি দেখা যায় ?

১৯৬১ সালের ৩০শে অক্টোবর অতুল্য ঘোষ আবার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন।

সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ বলেন যে অতুল্য ঘোষ কংগ্রেসের আদর্শ বোঝেন এবং তিনি, বিনোদানন্দ ঝা ও বিজু পট্টনায়ক এক যোগে কাজ করতে পারবেন এবং পূর্ব ভারত থেকে প্রাদেশিকতার বিষ নির্মূল করতে সক্ষম হবেন।

লেকিন্ যদি বামুন মার না খায় কায়েতের কাছে।

এত মার খেয়েও বাঙ্গালী হিন্দু কমিউন্যাল হয় নি। আজও ফজলুর রহমানের ডাকে নদীয়াতে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু বাঙ্গালী কংগ্রেসের পতাকাতলে উপস্থিত হন, আবার মহম্মদ ইস্‌মাইলকে ভোট দেন ডাঃ রায়ের বিরুদ্ধে। এখনও মনে হয় নুরনবী চৌধুরী যদি দণ্ডকারণ্য শাসন ব্যবস্থার সর্বময় অধিকর্তা নিযুক্ত হতেন, তবে

ইংরেজের দেওয়া প্রশাসনিক নিয়ম কানুন বিদায় নিত নৈমিষারণ্য থেকে।

কিন্তু অন্য প্রদেশে ?

That congressmen......continue to retain their orthodox inhibitions was frankly conceded by Mr Sastri the other day. Addressing sweepers' meeting in Delhi, he disclosed that as late as 1926 Pandit Pant was a firm believer in untouchability and would not allow anyone except a Brahmin to cook his food. ( Women's place in the Indian political scene, by P. C. Chaudhri. The Statesman, September 18, 1961 )

উত্তর প্রদেশ, বিহার, পাঞ্জাব, রাজস্থান, মাদ্রাজ, অন্ধ্র, গুজরাট, মহারাষ্ট্র সমস্ত রাজ্যগুলিতে নির্বাচনী রাজনীতি রাজনৈতিক দলের মনোনয়ন বা আদর্শের উপর নির্ভর করে না। নির্ভর করে সাম্প্রদায়িকতা এবং হিন্দুর কাষ্টইজিমের উপর।

তাই ভয় হয়। অমৃতকন্যা হয়ে গেল বিষকন্যা। চিন্তাশীল রাষ্ট্রনেতাগণ আগামী দিনের কথা ভেবে নিশ্চই শঙ্কিত হয়েছেন। জাতিভেদ, প্রাদেশিকতা, হিন্দু মুসলমানের ধর্মান্ধতা মূলধন করে বর্তমানের রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সর্বোপরি অর্থপিশাচ বণিক শ্রেণীর অর্থ। যিনি ইাতহাসের ছাত্র তিনি নিশ্চয়ই বুঝবেন যে আঠারটি পাঠান সেনার অভ্যুত্থান ও লক্ষ্মণ সেনের রাজনৈতিক নেতৃত্বের অবসান।

শুধু রাজনৈতিক নেতৃত্বই ঘুচে যাবে না, ভারতবর্ষের ঐক্যও ঘুচে যাবে, হয়তো আরব দেশের মত হবে এদেশের অবস্থা।

আরব দেশের নাম শুনে আমার মনে হলো স্বামী বিবেকানন্দের ছোট গল্প "হায় হাসান, হায় হোসেন।" সেই রকম হয়তো একশ বছর পরে দুটি নাগা যুবক ভিসা নিয়ে দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে উপস্থিত হবেন দিল্লী সহরে। দেখবেন সবাই বুক চাপরাচ্ছেন, আর "হায় বাপুজী" "হায় বাপুজী" বলছেন। ওরা বোকার মত জিজ্ঞাসা করবেন, "আপনাদের রাজ্যের কেউ বুঝি আজ গত হয়েছেন?"

কোন্ দেশের লোক তোমরা ?

জাননা আজ বাপুজীর মৃত্যুশতবার্ষিক দিবস ?

একশত বর্ষ পূর্বে আজকের দিনে আমাদের জাতির জনককে এক বিদেশী হত্যা করেছিল। আজ হ'লো আমাদের জাতীয় শোক দিবস। চল বাপুজীর মন্দিরে যাই, সেখানে প্রার্থনা হবে।

বাপুজীর মন্দিরের দ্বারদেশে থাকবে গড্সের বিরাট মূর্ত্তি। সবাই মূর্ত্তির গণ্ডস্থলে চপ্পলাঘাত করে মন্দিরে প্রবেশ করবেন।

যুবকদ্বয় বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করবেন, "এ কার মূর্তি ?

এই তো সেই নরাধম গড্সে যে আমাদের বাপুজীকে হত্যা করেছিল।

যুবকদ্বয় গড্সের মূর্ত্তির পদতলে নতজানু হ'য়ে প্রণাম করে গদগদ স্বরে বলবেন, "বাবা গড্, সার্থক তোমার নামকরণ! ওদের এমন মার মেরেছে যে এক শ' বছরেও ভুলতে পারেনি।"

## উপসংহার

সত্য সেলুউকাস! কি বিচিত্র এ দেশ! দিল্লীশ্বরের তাপ-নিয়ন্ত্রিত আশ্রয়ে আশ্রিত হয়ে চির বসন্ত ঋতুতে বসতি পশ্চিম সীমান্ত থেকে আগত শরণার্থীকুল, আর! বিড়ম্বণা ও লাঞ্ছনা হয়েছে ললাটের লিখন পূর্ব সীমান্ত থেকে আগত শরণার্থীদের, বিরস কণ্ঠে কহিলেন দাদা গুহক।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী আগষ্ট পনর, ১৯৪৭ সালে নতুনদিল্লী থেকে বেতার ভাষণ দিয়েছিলেন—

Long years ago we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. The service of India means the service of the million who suffer. It means the ending of poverty and ignorance and desease and inequality of opportunity, The ambition of the greatest man of our generation has been to wipe out every tear from every eye,

অশ্রু মোছায়ে দেবে প্রতি আঁখি হ'তে—যেন বেদের অমৃত-বাণী। বাঙ্গালীর দেহের কোষে কোষে বাজে কান্নার ঐক্যতান। ইতিহাস বলে যে তাঁর অশ্রু মুছিয়ে দেয়নি ভারত, তাই কাতর কণ্ঠে নিবেদন করেছেন দৌবারিক কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী সমীপে, —'ওদের বাঁচতে দিন', যদিও রাজনীতির যূপকাষ্ঠে উৎসর্গিত ছাগ শিশু ওরা।—

কেন্দ্রীয় পুনর্বাসনমন্ত্রী

সমীপেষু—

লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অপ্রীতিকর আলোচনা আর নয়, আজ পুনর্বাসনদপ্ত

গুটিয়ে ফেলার আগে আপনার কাছে শুধু এই অনুরোধ করছি, দেশ বিভাগের বলি পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তুদের ওপর দয়া করে আর হামলা চালাতে দেবেন না, উত্তমর্ণ কাবলীওলার ভূমিকা নিয়ে ওদের জীবন আর অতিষ্ঠ করে তুলবেন না।

আমি জানি, আপনার 'মেহেরবাণীতে অনেক কাজ হয়, তাই নিবেদন কেন্দ্রীয় অর্থদপ্তরের ঋণ নিয়ে আজ পর্যন্ত যাঁরা সুখের সংসার গড়ে তুলতে পারেননি, যাঁরা এখনও এখানে সেখানে ছন্নছাড়ার জীবন কাটিয়ে চলেছেন, তাঁদের পরিবারে নতুন বিড়ম্বনা আর ডেকে আনতে দেবেন না। দীর্ঘ পনের বছর যা দেখাতে পারেননি, আজ উদ্বাস্তু জীবনের এক অধ্যায় সমাপ্ত করার প্রাক্কালে সেই সহানুভূতি যৎসামান্য দেখিয়ে এঁদের আর-এফ-এ ঋণ মকুবের ব্যবস্থা অবিলম্বে করে দিন এবং আপনারই সহকর্মী অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাইর কাছে দরবার করে মানবিক দৃষ্টি-কোণ থেকে বিষয়টি আবার বিবেচনা করে দেখুন। নইলে মড়ার গায়ে খাঁড়ার ঘা মারার দায়ে আপনাদের সবাইকে চিরকাল অপরাধী হয়ে থাকতে হবে।

## পূর্ব ও পশ্চিমে গরমিল

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে দুই-এক দিনের মধ্যে আপনি এক বৈঠকে মিলিত হচ্ছেন এবং জানতে পেরেছি এই আর-এফ্-এ ঋণ আদায়ের প্রশ্নও ঐ বৈঠকে আলোচিত হবে। কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন শ্রীখান্না, কেন্দ্রীয় অর্থদপ্তরের সৃষ্ট এই রিহ্যাবিলি-টিশন ফিনান্স অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন (সংক্ষেপে আর-এফ-এ) মারফৎ পূর্ব ও পশ্চিমের উদ্বাস্তুদের ঋণ দেওয়ার যে ব্যবস্থা

হয়, তাতে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুরা তেমন লাভবান হননি, লাভের ষোল আনা পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তুরা ভোগ করেছেন।

বাঙ্গালীর উদ্যোগহীনতার দোহাই পেড়ে আপনারা সব দোষ এ অঞ্চলের উদ্বাস্তুর ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা বরাবর করে এসেছেন; কিন্তু আর একটু চক্ষুষ্মান হলেই দেখতে পেতেন, এই ব্যাপারে উত্তমর্ণের গাফিলতি বড় কম নয়।

একথা সত্যি যে, ক্ষুধার জ্বালায় কিছু উদ্বাস্তু ঋণের টাকা শিল্প বা ব্যবসায়ে সময়মত না লাগিয়ে উদরসাৎ করতে বাধ্য হয়েছেন, কিন্তু ঋণ বিলির ব্যাপারে সরকারের ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের প্রতি, আপনাদের অপরিসীম পক্ষপাতিত্ব কে অস্বীকার করবে?

## ঋণ দানের উদ্দেশ্য ব্যর্থ

আর-এফ-এ ঋণের জন্যে প্রায় ৪০ হাজার পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তু আবেদন করেন। ঋণ মঞ্জুর হয় প্রায় ছ হাজারের এবং দেয় মোট টাকার পরিমাণ ৪ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা। এই টাকা প্রয়োজনের তুলনায় কমতো বটেই, তদুপরি, সময়মত কখনও পাওয়া যায় নি। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কেটে গিয়েছে, টাকা মেলে নি। যখন মিলেছে, টাকা খাটানোর উপযুক্ত সময় কবে উত্তীর্ণ। অসময়ে যেটুকু পাওয়া গিয়েছে, তাও আবার কিস্তিতে কিস্তিতে।

ফলে ঋণদানের উদ্দেশ্য পুরো সফল হয়নি। উলটে এখন আবার এই টাকাই নতুন অনর্থ ডেকে এনেছে। অধমর্ণদের প্রায় সবাই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। সরকারী ঋণ

সময়মত না পাওয়াতে হাতের সামান্য মূলধন দৈনন্দিন খরচের চোটে কোথায় উবে গেছে এবং অন্য কোন সূত্র থেকে ব্যবসাঋণ আদায়ের পথও তাঁদের কাছে বন্ধ হয়ে যায়। বীমা পলিসি, ক্যাশ সার্টিফিকেট বা অন্য সম্বল ততদিনে সরকারের বন্ধকীতে।

আগেই বলেছি, ১৯৫৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের ঋণ দেওয়া হয়েছে মোট ৪ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা। পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তুরা পেয়েছেন তার প্রায় দ্বিগুণ—৭ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা। পশ্চিমের উদ্বাস্তুদের ঋণের টাকা ফেরৎ দিতে হয়নি। ফেলে আসা সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্ত টাকা দিয়েই তাঁদের অনেকের এই ঋণের টাকার কাটাকাটি হয়ে গেছে। পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তুদের কপালে তা জোটেনি, তাদের নগদ দিতে হবে। কারণ ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে এদের জন্যে যে পৃথক ব্যবস্থা। আর-এফ-এ সংস্থার অষ্টম বার্ষিক বিবরণীতেই লেখা আছে,

About 70% of the loans in the Western Region are secured against compensation claims whereas there are no claims in the Eastern Region.

## কাবুলিওলার ভূমিকা

এখন পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তুদের কাছ থেকে ঋণ আদায়ের পালা। অর্ধ পুনর্বাসিত অসংখ্য উদ্বাস্তুর পেছনে পেয়াদা লেলিয়ে তাঁদের আবার এক অসহায় অবস্থার মুখে ঠেলে দেওয়ার কাজ চলেছে। পাওনাদারদের জ্বালায় অনেক ব্যবসা ইতিমধ্যে উঠে গেছে, সার্টিফিকেট মামলা রুজু

হয়েছে প্রায় ৩ হাজার সম্পত্তি ক্রোকের পরিমাণও বড় কম নয়।

আর-এফ-এর উদ্দেশ্য ছিল ঋণের টাকা দিয়ে হতভাগ্য উদ্বাস্তু সমাজকে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। অন্তত এ প্রান্তে তা সম্ভব হয়নি। এই ব্যর্থতার ইতিহাস বিশদ বিশ্লেষণ না করে, আমি শুধু আপনার মারফৎ জানতে চাই, শুধু ক্ষতিপূরণ বাবদ পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের প্রায় ১০০ কোটি টাকা দেওয়া যে সরকারের পক্ষে সম্ভব হল, সেই সরকারই পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের মাত্র ৪ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা ঋণ জবরদস্তিতে আদায়ের জন্যে এত বদ্ধপরিকর কেন? যে অল্প টাকা এঁরা ঋণ হিসেবে পেয়েছেন, তারও বেশি টাকার সম্পত্তি এঁদের অনেকেও যে পূর্ববঙ্গে ফেলে এসেছেন একথা তো সরকারের অজানা নয়।

### ঋণের বদলে সাহায্য দাবি

এই ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে আপনার তেমন কিছু করণীয় নয় বলে দায়িত্বক্ষালনের চেষ্টা আপনার পক্ষে শোভা পায় না। কারণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের চূড়ান্ত দায়িত্ব আপনারই হাতে। আর-এফ-এ সংস্থা অর্থদপ্তরের অধীন ছিল, বলে উদাসীন বসে থাকাও উচিত কাজ হবেনা। কারণ আপনি নিজেই স্বীকার করেছেন সরকারী ঋণ বা সাহায্য পেয়েও বহু পরিবার সম্পূর্ণ পুনর্বাসিত হতে পারেনি, যথার্থ পুনর্বাসনের জন্য এই সকল অর্ধ পুনর্বাসিতের আরও সাহায্যের দরকার।

তাই যদি সত্যিসত্যি আপনার মনের কথা হয়ে থাকে,

তাহলে আর-এফ-এর দেওয়া এই ঋণ মকুব করার কাজে আপনাকেই উদ্যোগী হতে হবে। প্রয়োজনবোধে ঋণের টাকাকে সাহায্য হিসাবে ধরে নেবার জন্যে যথাবিহিত ব্যবস্থাও আপনাকেই করতে হবে। আর কিছু না পারেন, সার্টিফিকেট মামলাগুলি প্রত্যাহারের কাজে অবিলম্বে আপনাকে হাত দিতে হবে এবং আর-এফ-এর কাছে যাঁরা ঋণী, তাঁদের বর্তমান আর্থিক অবস্থাটা তলিয়ে দেখার জন্যে অবিলম্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠনের জন্যে চাপ দিতে হবে। তদন্তে যাঁদের দেখতে পাবেন, ঋণ ফেরৎ দেবার সামর্থ্য আছে, মুষ্টিমেয় তাঁদের কাছ থেকে টাকা আদায় করুন আপত্তি নেই ; কিন্তু যাঁদের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত এবং যাঁরা সংখ্যায় বিপুল, তাঁদের প্রশ্নটি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে দেখার প্রয়োজন অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে।

পুনর্বাসন দপ্তর থেকে আপনার বিদায় নেবার দিন আসন্ন। দপ্তর গোটানোর আগে উদ্বাস্তুদের অন্তত এই উপকারটুকু যদি করে দিয়ে যেতে পারেন, তাহলে হয়ত মন্ত্রীজীবনে আপনার বহু ভুলভ্রান্তি উদ্বাস্তুরা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখতে পারবে এবং সব ভাল যাঁর শেষ ভাল বলে আমরাও প্রসন্নমনেই আপনাকে বিদায় দিতে পারব।

দৌবারিক

সম্পাদকীয় ও বিশেষ নিবন্ধ

আনন্দবাজার পত্রিকা, জানুয়ারী ১৫, ১৯৬২

হে ভারত ! ভিক্ষা মাগি। তব
শ্রবণেন্দ্রিয়কে কর একটু জাগ্রত।
কুৎসা ! করি ঘৃণা।

'কুৎসা। করি ঘৃণা।'—লম্বা লম্বা বুলি কপ্‌চাচ্ছিস্, ওদিকে বোম্বাই-এর নারীদের পত্রিকা তোদের কুৎসা রটিয়ে কুৎসিৎ হয়ে বেসাতি করে আখের গুছিয়ে নিচ্চে।

বাঙ্গালীর কুৎসা রটিয়ে?

পড়ে ছাখ্‌!

## বোম্বাইয়ের পত্রিকায় বাংলার কুৎসা

### জাতি, বরেণ্য মনীষী ও নেতার অপমান

বাঙালীদের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচারের আর একটি নমুনা মিলিয়াছে। কলিকাতা শহর, বাঙালী জাতি এবং দেশবরেণ্য কয়েকজন মনীষী সম্পর্কে এত কুৎসিত ও এত অবমাননাকর মন্তব্য আর শোনা যায় নাই।

এই অপপ্রচারের কেন্দ্র বোম্বাই এবং ক্ষেত্র একটি ইংরাজি সাপ্তাহিক,—নাম—Women's Own Weekly.

গত ১৩ই জানুয়ারী ঐ কাগজের দশম পৃষ্ঠায় এক "যুগান্তকারী" প্রবন্ধে লেখক আবিষ্কার করিয়াছেন, বাঙালীরা নাকি দাবি করে, তাঁহারা ভারতের নেতা এবং বাঙালীরা বলিয়া থাকে, "আজ বাঙলাদেশ যাহা করে, বাকি ভারত কাল তাহা নকল করে।"

প্রবন্ধটির সুরু এইভাবে।—

The Bengalis claim that Bengal leads in India—in culture, in all that is most progressive. "What Bengal does today," they say, "the rest of India will copy tomorrow."

পত্রিকাটি তো মহারাষ্ট্রের রাজধানী হইতে প্রকাশিত হয়, সম্পাদক বা লেখক কি জানেন না, ঐ ধরনের উক্তি কোন বাঙালীর নয়—গোখলে নামক একজন দেশপূজ্য মহারাষ্ট্রী নেতার ?

লেখক অবশ্য পরবর্তী অনুচ্ছেদেই গোখলের যুক্তি নাচক করিয়া দিয়াছেন। কেননা তাঁহার মতে কলিকাতার মত নোংরা শহর ভারতে আর নাই।—

"I sincerely hope that this is not true! For a filthier more slovenly city than Calcutta will not find in India."

পরের মন্তব্যটি আরও সাংঘাতিক। লেখকের মতে বাঙালীরা নাকি মনে করে, "ভারতের একমাত্র বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে" :তাহারাই দিয়াছে। বাঙালীদের দ্বিতীয় গর্বের বস্তু নাকি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। এই নেতাজী কে? লেখক বলিয়াছেন, তিনি "বিশ্বাসঘাতক এবং জাপানী কুইস্‌লিং।"

—There proud 'assertion' is, I think, based on the fact that Bengal produced India's only world poet—Tagore. The only other Bengali 'hero' is Netaji Subhas Chandra Bose, the traitor who was a Japanese quisling but who nevertheless is honoured annually on the anniversary of his death, as a martyr."

এই জঘন্য অনৃতবদন সম্পর্কে কোন মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

কলিকাতা শহর সম্পর্কে লেখকের ধারণাও অত্যদ্ভুত। শহরটা নাকি পূতিগন্ধময়, আদিম এবং ন্যক্কারজনক। রাজপথে কুষ্ঠরোগী আর উলঙ্গের ভিড়, ট্রাফিক পুলিস অভদ্র, ইত্যাদি ইত্যাদি।

কয়েকটি মন্তব্য তুলিয়া দিই—

"......With no inhibitions, the lower class Bengali crawls from his house and relieves himself, bladder or bowel, a few feet from where he lives"

"......Nowhere in India—or I think in the whole world—is driving so dangerous, discourteous and disgraceful as in Bengal. Traffic policeman turn a

blind eye to it—in fact quite a number of them spend half their 'point duty' in the nearest tea shop."

"—I have seen three state buses in one week, knock down pedestrians in Calcutta and leave them dead or dying beside the road."

লেখকের "নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভার" বিশদ পরিচয় দিয়া আর লাভ নাই, তাহার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কেই আমাদের সন্দেহ জাগিতেছে। ·········কী না বলে।'

আনন্দবাজার পত্রিকা, ফেব্রুয়ারী ২, ১৯৬২

কিরে? মনে আঘাত পেলি? ভগীরথের ইতিহাস পাঠ কর। মন সতেজ হবে, জড়তা দূর হবে, বললেন গুহকদা।

ভগীরথের ইতিহাস?

সাম্যবাদের গুরু ভগীরথ। ধরণীতলে মুক্তিধারা প্রবাহিত করে পবিত্র করেন জনগণকে ভগীরথ। শিবজটাজালে বন্দিনী মাতা গঙ্গের। আবার ভগীরথের তপস্যা এবং মুক্তিধারার মুক্তি। উল্কার বেগে সাম্যের গান গেয়ে সমস্ত অশিব নাশ করে যখন ধেয়ে আসছিলেন তখন তাঁকে রোধ করেন ক্রুদ্ধ জহ্নুমুনি।

যৌবন জল তরঙ্গ কে রোধিবে রে, কে রোধিবে রে?

হরে মুরারে, হরে মুরারে।

হরে মুরারে। তবুও মোহাচ্ছন্ন আধুনিক জহ্নুমুনিগণ নিজেদের যজ্ঞস্থান প্লাবিত হওয়ায় পবিত্র বারিধারা রুধিবার তরে নানা তাকতুক করেন, যেমন সেদিন গুজরাটি জহ্নুমুনিবর মোরারজী দেশাই ক্রোধম্বিত হয়ে নানা তাকতুক করে কালের গতি রোধকল্পে মন্ত্র উচ্চারণ করলেন।

মন্ত্রটি কি?

কংগ্রেস যারাই পরিত্যাগ করেছে তারা পরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, যার দৃষ্টান্ত নেতাজী সুভাষচন্দ্র।

( আনন্দবাজার পত্রিকা, ফেব্রুয়ারী ৬, ১৯৬২ )

তারপর ?

ঐতিহাসিক নেহেরু। তিনি জানেন যে জহ্নুর কর্ণরন্ধ্র বিদরিয়া মুক্ত হয়ে মাতা গঙ্গে হলেন জাহ্নবী, তাই বলেছেন,—

২৩শে জানুয়ারী পবিত্র দিন। ভারতের এই সাহসী নেতার জন্মোৎসব পালন করা আমাদের কর্তব্য। আজাদ হিন্দ ফৌজ-এর অধিনায়ক সুভাষচন্দ্র বসু অতিশয় বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন এবং ভারতের স্বাধীনতা আনয়নের সাহায্য করিয়াছেন। ভারতের এই বীর সন্তানকে স্মরণ ও তাহার জন্মবার্ষিকী পালন অবশ্যই যথার্থ ও সঙ্গত।

( আনন্দবাজার পত্রিকা, জানুয়ারী ২৪, ১৯৬২ )

কিন্তু তবু আমি গাইব না বাঙ্গালীর প্রশস্তি।

গাইবি না ? তবে আমি গাই—

হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে,
ময়ূরের মত নাচে রে, হৃদয় নাচেরে।—

পূর্ব গগনের দিকে তাকিয়ে ছাখ্

গুরুগুরু মেঘ গুমরি গুমরি গরজে
গগনে গগনে, গরজে গগনে।—

শশাঙ্কের কৈবর্ত্তশক্তি গুমরি গুমরি গর্জন করছেন। তাঁরা হক্ কথা বুঝেছেন যে তাদের পূর্ববাংলা হয়েছে উর্দু ভাষীদের কলোনী, তায় 'কুলায় কাঁপিছে' কুলিনকুল, আঁয়ুবি 'ডাকিছে সঘনে,' তায়ে 'হরষ আমার দিয়েছি বিছায়ে।'

কিন্তু সজল মেঘের নীল অঞ্জন আমার নয়নে লাগেনি, তবুও আমার নয়ন সজল। তাই আমি নিবেদন করবো শুধু ভগবান যীশুর মৃত্যুর পর এক হাজার নয় শত ছেচল্লিশ বছর থেকে এক হাজার নয় শত বাষট্টি সালের ভারতীয় সাধারণ নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত ইংরেজের সংবাদপত্রে লিখিত বাঙ্গালী শরণার্থীদের ইতিহাস।

হে ভারত! ভিক্ষা মাগি একটু ধৈর্য, একটু সহানুভূতি।—

## উদ্বাস্তু পুনর্বাসন যে তিমিরে সেই তিমিরে

## দুই অঞ্চলের পুনর্বাসন কার্যের তুলনামূলক পর্যালোচনা

নয়া দিল্লী, জানুয়ারী ২৮, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় হয়ত অচিরেই বন্ধ হইয়া যাইবে; কিন্তু কতকগুলি জরুরী সমস্যা এখনও অমীমাংসিত রহিয়া গিয়াছে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদিগকে প্রদত্ত কতিপয় বিশেষ ধরণের ঋণ মকুব করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি প্রস্তাব রহিয়াছে। যদিও দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসন কার্য পূর্বাপেক্ষা অনেক সুনিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, তথাপি ইহাকে বাস্তব রূপ দিতে হইলে এখনও বহু কাঠখড় পোড়াইতে হইবে।

পূর্বাঞ্চলে পুনর্বাসন কার্য একরূপ কিছুই হয় নাই। পশ্চিমাঞ্চলেও এমন বহু জায়গা রহিয়াছে যেখানে নির্ভরযোগ্য পুনর্বাসন সাধিত হয় নাই।

তিন বৎসর পূর্বে পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় দাবী করিয়াছিলেন যে পশ্চিমাঞ্চলে পুনর্বাসন কার্যতঃ সম্পন্ন হইয়াছে। Parliamentry Estimates Committeeও তাঁহাদের

১৯৫৯-৬০ সালের রিপোর্টে স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন, বেশীর ভাগ কার্যই সম্পন্ন হইয়াছে।

পূর্বাঞ্চল সম্বন্ধে তাঁহারা মন্তব্য করিয়াছিলেন যে পুনর্বাসন ঢিমে তালে অগ্রসর হইতেছে এবং পূর্বাঞ্চলের সমস্যার বিশেষ প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া বিশেষ ধরণের ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।

পুনর্বাসনের চিত্রটি পূর্বের মতই বিষাদময়। এই তিন বৎসরে অধিকাংশ রিলিফ ক্যাম্পগুলি তুলিয়া দেওয়া ছাড়া আর কোন অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয় না।

পূর্বাঞ্চলের এই অপ্রীতিকর অবস্থার জন্য বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদিগকে সাধারণতঃ দোষী বলিয়া গণ্য করা হয়। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা এই যে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের নীতি এবং ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের ফল প্রসব করিয়াছে।

## উদ্বাস্তু আগমন

১৯৪৭-৪৮ সালে ৪৭ লক্ষ উদ্বাস্তু (আনুমানিক ১১ লক্ষ পরিবার) প্রায় একযোগে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে ভারতে প্রবেশ করে। পূর্বাঞ্চলে উদ্বাস্তু আগমন সুরু হয় আরও আগে। ১৯৪৬ সালে নোয়াখালির দাঙ্গার সময় হইতে সুরু হইয়া ১৯৫৬ সালে 'মাইগ্রেসন সার্টিফিকেট প্রথা' চালু হওয়া পর্যন্ত উদ্বাস্তু আগমন অব্যাহত চলিতে থাকে। ঐ সময়ের মধ্যে ৪১ লক্ষ পূর্ববঙ্গের অধিবাসী বিভিন্ন সীমানা অতিক্রম করিয়া আসেন এবং নিজেদের নাম 'উদ্বাস্তু'রূপে পঞ্জীকৃত করেন। আরও অনেকে নিজেদের নাম পঞ্জীকৃত করেন নাই। সরকারী কাগজপত্রে দুই অঞ্চলের উদ্বাস্তুদের সংখ্যায় তেমন

বড় রকমের পার্থক্য নাই। সরকার স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন যে পশ্চিমাঞ্চলের উদ্বাস্তুগণ চির-কালের জন্য ভারতে চলিয়া আসিয়াছেন এবং তাহারা ভারতে পৌঁছিবামাত্রই তাহাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাহাদের এক বৃহৎ অংশ পুনর্বাসনের ব্যাপারে নিজেরাই অগ্রণী হইয়া ভারতে মুসলমান পরিত্যক্ত জমি, বাড়ী, দোকান ইত্যাদি দখল করিয়া লইলেন। সরকার পরে এই সব বেদখলীকরণকে বিভিন্ন উপায়ে আইনানুগ করিয়া লন এবং তাহাদিগকে আরও অধিক সহায়তা দান করেন। ইহা সম্ভব হইয়াছিল ভারতে উদ্বাস্তু আগমন ও ভারত হইতে উদ্বাস্তু নির্গমন সমানভাবে অগ্রসর হইয়াছিল বলিয়া। কিন্তু পূর্বাঞ্চলে এইরূপ ঘটে নাই। প্রকৃতপক্ষে ভারত ত্যাগ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানে কেহ যায় নাই বলিলেই চলে। এই কারণে পূর্বাঞ্চলের সমস্যা বহুগুণ কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে এবং সমস্ত উদ্বাস্তুদের জন্যই নূতন করিয়া ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন দেখা দেয়।

এই প্রসঙ্গে Estimates Committee বলিয়াছেন, অবশেষে ১৯৫৫ সালের কোনও এক সময়ে অথবা তৎ-পরবর্তীকালে পূর্ববঙ্গ আগত উদ্বাস্তুদিগের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিবার সিদ্ধান্ত সরকার কর্তৃক পাকাপাকিভাবে গৃহীত হয়।

পরিতাপের বিষয় যে শেষ ধাপে পৌঁছিয়াও সরকার পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের ন্যায় পূর্ববঙ্গ আগত উদ্বাস্তুদিগের পুনর্বাসনের কার্যে সমান গুরুত্ব আরোপ করিতে পারিলেন না।

## ক্ষতি পূরণ

পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের সাফল্যের মূলমন্ত্র হইল পাকিস্তানে পরিত্যক্ত স্থাবর সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ প্রদান। 'স্বীকৃত ও প্রমাণিত দাবী' অনুসারে পশ্চিমাঞ্চলে পাকিস্তানে হিন্দুর পরিত্যক্ত সম্পত্তির পরিমাণ ভারতে মুসলমান পরিত্যক্ত সম্পত্তির তুলনায় অধিক এবং আগত উদ্বাস্তুদের ক্রমবর্ধমান হারে ক্ষতিপূরণ দানের পরিকল্পনা কার্যকরী করা হয়।

মুসলমানদিগের পরিত্যক্ত সম্পত্তির পরিমাণও কম নয়—পাঞ্জাব এবং রাজস্থানে ষাট লক্ষ একর কৃষি জমি (শস্যোৎপাদনের ভিত্তিতে যাহা ত্রিশ লক্ষ ষ্ট্যাণ্ডার্ড একরের সমান), শহরাঞ্চলে ৩০০,০০০ বাড়ী ও দোকান এবং পল্লী অঞ্চলে ৭০০,০০০ বাড়ী।

পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক রিপোর্টে জানা যায় কৃষকগণ ২৯ লক্ষ একর জমি পাইয়াছেন। তন্মধ্যে ২৩॥ লক্ষ একর জমি কেবলমাত্র পাঞ্জাবেই অবস্থিত। প্রায় এই সকল জমি হইতে ৫৭০,০০০ পরিবারকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। সরকার একর প্রতি গড়ে ৪৪৫৲ টাকা করিয়া মূল্য ধার্য করিয়াছিলেন। ইহা অবিশ্বাস্য রকমের নিম্ন দর। এই নিম্ন মূল্যের হিসাবের উদ্বাস্তুদিগের মধ্যে বিতরিত জমির মোট মূল্য ১২০ কোটি টাকার ও অধিক।

শহরাঞ্চলে উদ্বাস্তুদিগের পুনর্বাসনের জন্য ৫০০,০০০ বাড়ী প্রয়োজন ছিল। তন্মধ্যে ভারতত্যাগী মুসলমানদের পরিত্যক্ত বণ্টনযোগ্য বাড়ী ও দোকান পাওয়া গিয়াছে ৩০০,০০০টি।

অবশিষ্টদের আশ্রয়ের ব্যবস্থার জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার ১৯৫৭-৫৮ সালে ৬২ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া একটি বৃহদাকার গৃহ-নির্মাণ পরিকল্পনা চালু করেন। এই সম্পত্তি সমূহ এবং পূর্বে যে কতিপয় বিশেষ ধরণের ঋণ দেওয়া হইয়াছিল তাহা শহরাঞ্চলের উদ্বাস্তুদের ক্ষতিপূরণ খাতে ধরা হইয়াছে। ১৯৬১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত শহরাঞ্চলের উদ্বাস্তুদিগকে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ ১৭৯ কোটি টাকা। তন্মধ্যে ৬০ কোটি টাকা নগদ এবং সম্পত্তি হস্তান্তর বাবদ ৭০ কোটি টাকা। এবং সাধারণের প্রাপ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য বাবদ ২৪ কোটি এবং হিসাব তালিকা বাবদ ২৫ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে। অদ্যাবধি ৪৯০,০০০ জন শহরাঞ্চলের উদ্বাস্তু ( সম্ভবতঃ ইহারা প্রত্যেকেই পরিবারের প্রধান ব্যক্তি ) ক্ষতিপূরণ লাভ করিয়াছেন। এবং আরও ১১,০০০ দাবীদারকে ক্ষতি পূরণ দিতে হইবে।

## বাজেট

গ্রামাঞ্চলের বাড়ীগুলির কথা ছাড়িয়া দিলেও শহরাঞ্চল ও পল্লীঅঞ্চলের উদ্বাস্তুগণ এইভাবে টাকার হিসাবে মোটামুটিভাবে তিন শত কোটি টাকা ক্ষতি পূরণ হিসাবে পাইয়াছেন। জানা যায় যে এই প্রদত্ত ক্ষতি-পূরণের প্রধান অংশই পুনর্বাসনের মন্ত্রণালয়ের বাজেটের অন্তর্ভুক্ত নহে। উহাতে ১৯৬০-৬১ সাল পর্যন্ত খরচ দেখান হইয়াছে ১৮৪৯·২৯ কোটি টাকা পশ্চিমাঞ্চলের বাবদ এবং ১৭৮·১০ কোটি টাকা পূর্ববঙ্গ আগত উদ্বাস্তুদের বাবদ। কিন্তু পূর্ববঙ্গ আগত উদ্বাস্তুদিগকে কোনরূপ ক্ষতি পূরণ

দেওয়া হয় নাই। বাজেটে উল্লিখিত অর্থের মধ্যে প্রদত্ত ঋণের অর্থও ধরা হইয়াছে। পশ্চিমাঞ্চলে প্রদত্ত ঋণকে ক্ষতি পুরণ হিসাবে ধরিয়া লইয়া ঋণ মকুব করা হইয়াছে। কিন্তু ঐ ঋণ পূর্ববঙ্গ আগত উদ্বাস্তুদিগকে নগদ অর্থে পরিশোধ করিতে হইবে।

ক্ষতি পূরণ ছাড়িয়া দিয়াও দেখা যায় যে পশ্চিমাঞ্চলের জন্য পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের ব্যয় পূর্বাঞ্চলের জন্য ব্যয়িত অর্থ হইতে ১১·১৯ কোটি টাকা বেশী।

সাম্প্রতিক এক সিদ্ধান্ত হইতে জানা যায় যে পাক-অধিকৃত জম্মু ও কাশ্মীর হইতে আগত উদ্বাস্তুদিগকে কোনরূপ ঋণ দেওয়া হয় না। ঋণের পরিবর্তে এককালীন দান হিসাবে কৃষকদিগকে ১০০০৲ টাকা ও অন্যান্যদিগকে ৩০০০৲ টাকা হইতে ৩৫০০৲ টাকা দেওয়া হইতেছে।

পশ্চিমাঞ্চলের উদ্বাস্তুগণ তাঁহাদের স্থাবর সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ; পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুগণ তাঁহাদের স্থাবর সম্পত্তি সঙ্গে আনিতে পারেন নাই। কিন্তু ক্ষতিপূরণ বা 'বিশেষ পুনর্বাসন সাহায্য' পূর্ববঙ্গ আগত উদ্বাস্তুদিগকে দান করা সম্ভবপর বলিয়া বিবেচিত হয় নাই।

## ভিত্তিহীন অভিযোগ

পশ্চিমবঙ্গের শিবিরবাসী উদ্বাস্তুগণ দণ্ডকারণ্যে যাইতে চাহে না—এইরূপ কথা গত কয়েক বৎসর ধরিয়া অনেক বলা হইয়াছে। উভয় অঞ্চলের উদ্বাস্তুদের বিভিন্ন রাজ্যে গমণের প্রতি লক্ষ্য করিলে এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলিয়া গণ্য হইবে।

পূর্ব পাকিস্তান আগত চল্লিশ লক্ষাধিক উদ্বাস্তুর মধ্যে প্রায় দশ লক্ষ উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে আশ্রয় লইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে মাত্র ১২০,০০০ জন ব্যতীত অবশিষ্ট সকলেই নিজেদের উদ্যোগে অন্যত্র গমন করিয়াছেন. পশ্চিমবঙ্গ ব্যতীত আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্যেই তাহাদের যাইবার সুযোগ ছিল। তাঁহাদের মধ্যে ৪৮৭০০০ জন আসাম ও ৩৭৪,০০০ জন ত্রিপুরা রাজ্য নির্বাচন করিয়া লইয়াছেন।

পশ্চিম অঞ্চলের অধিকাংশই পাঞ্জাব এবং দিল্লীতে ভিড় জমাইয়াছিলেন। আর কিছু সংখ্যক গিয়াছিলেন উত্তর প্রদেশে। সিন্ধু প্রদেশ হইতে আগত উদ্বাস্তুগণ প্রাক্তন দ্বিভাষিক রাজ্য বোম্বাই ও রাজস্থানে গিয়াছিলেন।

এই অঞ্চলের ৪৭ লক্ষ উদ্বাস্তুর মধ্যে পাঞ্জাব ও দিল্লীতে ৭,১৩৮,০০০ জন উদ্বাস্তুর আশ্রয় মিলিয়াছে। প্রায় সকল পাঞ্জাবী কৃষকগণ পাঞ্জাবেই আশ্রয় লাভ করিয়াছেন। বোম্বাইয়েতে ৪১৫,০০০, রাজস্থানে ৩৭৩,০০০, এবং মধ্য প্রদেশে গিয়াছেন ২০০,০০০ জন উদ্বাস্তু। মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, মহীশূর এবং—অন্ধ্র আশ্রয় দিয়াছে যথাক্রমে মাত্র ৯০০০, ৭০০০ ও ৪০০০ জন উদ্বাস্তুকে।

সরকারী উদ্যোগে ১২২,০০০ বাঙ্গালী উদ্বাস্তু বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, আন্দামান ও রাজস্থানে পুনর্বাসিত হইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে Parliamentery Estimates Committee বলিয়াছেন, ১৯৫৫ সাল হইতে অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। ঐ সময় হইতে বাঙ্গলাদেশে বা বাহিরে যেখানেই সুষ্ঠু ও পরিকল্পিত

উপায়ে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সেখানেই উহা ফলপ্রসূ হইয়াছে এবং কোন উদ্বাস্তুই পলাতক হন নাই।

## দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন সংস্থায় সঙ্কট

দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন সংস্থা গঠিত হয় ১৯৫৮ সালে। এই সংস্থার কাজ স্থুরু হইতে না হইতেই ( Estimate Committeeর মতে ) গুরুতর সঙ্কট উপস্থিত হয়। ১৯৬০ সালে উক্ত সংস্থা পুনর্গঠিত না হওয়া পর্যন্ত এই সঙ্কট চলিতে থাকে।

দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার মত অন্য লোক পুনর্বাসন পরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গে সমাদৃত হয় নাই। কিন্তু এই সংস্থার গুরুতর আভ্যন্তরীণ সঙ্কটের দরুণ শীঘ্রই ইহার তুর্নাম রটিয়া যায়।

পশ্চিম অঞ্চলের মানের তুলনায় পূর্বাঞ্চলের পুনর্বাসন সমস্যা এখনও সমাধানের নিকটবর্তী হয় নাই। উদ্বাস্তু-দিগকে কেবলমাত্র বাঁচিয়া থাকিতে সাহায্য করা হইয়াছে। কিন্তু সুষ্ঠু পুনর্বাসনের কোন ব্যবস্থা হয় নাই। সমগ্র উদ্বাস্তু সমস্যার তুলনায় শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের সমস্যা অকিঞ্চিৎকর। তৃতীয় পরিকল্পনার উল্লেখ অনুযায়ী আংশিকরূপে পুনর্বাসন প্রাপ্ত হইয়াছেন এইরূপ উদ্বাস্তু-দিগের সংখ্যা স্বীকৃত হইয়াছে ২০০,০০০টি পরিবার। সরকার কর্তৃক উন্নয়ন:সাধিত জমির পরিমান অল্প, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জমি সংগ্রহের দায় উদ্বাস্তুদের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। কিন্তু পূর্বাঞ্চলে জমি পাওয়া তুষ্কর। উদ্বাস্তুগণ জমি সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইলে পরে তাহা-দিগকে জমি ক্রয় করিতে ঋণ দেওয়া হইয়াছে। উদ্বাস্তু-

দিগের নিজেদের যত্ন ও পরিশ্রমের ফলে পশ্চিমবঙ্গ আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্যের অনেক অনাবাদী জমি চাষের যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। আসামে বাঙ্গালী উদ্বাস্তুগণ নিজেরা যে জমির উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, সেই সকল জমি হইতেও তাহাদিগকে উৎখাত করা হইয়াছে। তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে তাহারা জমিগুলির বেআইনী দখলকার।

সরকার দাবী করেন যে ৩১০,০০০ উদ্বাস্তু পরিবারকে জমি দিয়া পুনর্বাসিত করিয়াছেন। কিন্তু কি পরিমাণ জমি তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই। কিন্তু ইহা স্পষ্ট যে উদ্বাস্তুদের উপর ২৯.৫২ কোটি টাকার ঋণের বোঝা চাপান হইয়াছে। সরকার পশ্চিমাঞ্চলের তুলনায় পূর্বাঞ্চলের জন্য মাত্র একটি বিষয়ে বেশী অর্থ বরাদ্দ করিয়াছেন। সেইটি হইল গৃহ-ঋণ ব্যতীত অন্যবিধ ঋণ বাবদ। পূর্বাঞ্চলের জন্য ১৯৫০-৬০ সাল পর্যন্ত ৩৯.৭২ কোটি টাকা আর পশ্চিমাঞ্চলের জন্য ১৯৫৮-৫৯ সাল পর্যন্ত ৩২.৩১ কোটি টাকা।

পশ্চিম অঞ্চলে কৃষক পরিত্যক্ত দশ লক্ষাধিক খালি বাড়ী পাওয়া গিয়াছিল কিন্তু পূর্বাঞ্চলে অনুরূপ একটি বাড়ীও পাওয়া যায় নাই। পশ্চিম অঞ্চলে গৃহ-নির্মাণ ইত্যাদি বাবদ ৬১ কোটি টাকা ( ১৯৫৮-৫৯ সাল ) ব্যয় করা হইয়াছিল। এই টাকার অধিকাংশ আবার ক্ষতি পূরণ খাতে ধরা হইয়াছিল। পূর্বাঞ্চলে ব্যয়িত হইয়াছে ৩৪.৮৩ কোটি টাকা। পূর্বাঞ্চলের বেলায় এই সম্পূর্ণ টাকাটাই আবার ঋণ বাবদ ধরা হইয়াছে। পশ্চিমাঞ্চলে সরকার নিজে নির্মাণ করিয়াছেন ১৬৬,০০০ বাড়ী ও ভাড়া বাড়ী এবং উদ্বাস্তুদিগকে সাহায্য করিয়াছেন আরও

২৭,০০০ বাড়ী তৈয়ার করিতে। পূর্বাঞ্চলে সরকার নির্মিত বাড়ীর সংখ্যা ১১,০০০ এবং উদ্বাস্তুদিগকে ৪৩২,০০০ টাকা বাড়ী নির্মাণ করিবার জন্য ঋণ দেওয়া হইয়াছে। পশ্চিমাঞ্চলের আশ্রয় শিবিরগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় ১৯৪৯-৫০ সালে। পূর্বাঞ্চলের সমস্ত শিবিরগুলি যদিও এখন পর্যন্ত বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় নাই, তথাপি পূর্বাঞ্চলের তুলনায় পশ্চিমাঞ্চলের শিবিরগুলির জন্য ব্যয় করা হইয়াছে অধিক টাকা। পূর্বাঞ্চলের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে যে টাকা ব্যায়িত হইয়াছে; সেই টাকাও উক্ত অর্থের সমতুল্য হইবে না। রিলিফ খাতে 'এককালীন দান' হিসাবে পূর্বাঞ্চলের উদ্বাস্তুদিগের জন্য ব্যায়িত অর্থের পরিমাণ ৭৭·৫৯ কোটি টাকা (১৯৫৯-৬০ সাল পর্যন্ত) এবং পশ্চিমাঞ্চলে ব্যয় করা হইয়াছে ৮৫·১৫ কোটি টাকা (১৯৫৮-৫৯ সাল পর্যন্ত)। পরিচালন খাতে ব্যয় হইয়াছে পশ্চিমাঞ্চলে ২·২০ কোটি টাকা আর পূর্বাঞ্চলে মাত্র ৬৭ লক্ষ টাকা।

যে সকল বাঙ্গালী উদ্বাস্তু সরকারী সাহায্য লইয়াছে, তাহাদিগের প্রত্যেকের উপর বিরাট করভার চাপিয়াছে (দণ্ডকারণ্যের ক্ষেত্রেও এইরূপ ঘটিয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ১৯৫৫ সালের পূর্বেই ইহা ঘটিয়াছে)। এই সব প্রদত্ত ঋণ শুধু অপ্রতুল নয়; দেওয়াও হইয়াছে ছোট ছোট কিস্তিতে। ফলে যে কারণে ঋণ গ্রহণ করিতে উদ্বাস্তুগণ অগ্রসর হইয়াছিলেন, সেই উদ্দেশ্যটিই বানচাল হইয়া গিয়াছে। প্রায় দশ লক্ষ ব্যক্তি সরকারের নিকট হইতে সাহায্য প্রার্থনা করেন নাই।

## কর্মসংস্থান ও শিক্ষানবিশী

পশ্চিমাঞ্চলে 'এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ'-এর মাধ্যমে ২০৪,০০০ জন উদ্বাস্তুকে কাজ দেওয়া হইয়াছে এবং ৯২,০০০ জনকে কারিগরী শিক্ষা প্রদান করা হইয়াছে। পূর্বাঞ্চলে দেওয়া হইয়াছে যথাক্রমে ৬৫,০০০ ও ৪৬,০০০ জনকে।

দিল্লীতে প্রকৃতই যদি ৫০০,০০০ জন পশ্চিম অঞ্চলের উদ্বাস্তু ভীড় করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও সেই তুলনায় বৃহত্তর কলিকাতায় অনেক বেশী উদ্বাস্তু আস্তানা গড়িয়াছেন। দিল্লীতে সরকার ৭৩টি নূতন কলোনীতে ৫৯,০০০টি বাড়ী, ভাড়া বাড়ী ও দোকান ঘর তৈয়ার করিতে ব্যয় করিয়াছে ২৩ কোটি টাকা। ইহা ছাড়াও ২০০,০০০ জন পরিত্যক্ত বাড়ীতে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। কলিকাতায় উক্ত অর্থের ছয় ভাগের এক ভাগও ব্যয় করা হইয়াছে কিনা সন্দেহ।

পূর্বাঞ্চলের একটি বিরাট ত্রুটি যে বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার যে সামান্য পরিমাণ অর্থ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে ন্যস্ত করেন, রাজ্য সরকার সেই অর্থেরও সদ্ব্যবহার করিতে সক্ষম হন না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ১৯৫৯-৬০ সালে কেন্দ্রীয় সরকার ২·৭৩ কোটি টাকা ঋণ অনুমোদন করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৯৬১ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৮৪ লক্ষ টাকার অধিক বণ্টন করিতে অসমর্থ হন। কয়েক বৎসর পূর্বে 'টালীগঞ্জ উন্নয়ন পরিকল্পনা' অনুমোদিত হয়। যাহার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ২ কোটি টাকা আংশিক খরচ হিসাবে দান করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, সেই

পরিকল্পনার ব্যাপারেও রাজ্য সরকার স্পষ্টতই গাফিলতি করিতেছেন।

গত চৌদ্দ বৎসর ধরিয়া পশ্চিমাঞ্চলে পুনর্বাসন কার্য চলিতেছে। ইহাতে ব্যয় হইয়াছে মোট ৪৫০ কোটি টাকা (উদ্বাস্তুদের জমি ও বাড়ীর মূল্য সমেত)। সেখানে পুনর্বাসনের কার্য খুবই সন্তোষজনক হইয়াছে। পূর্বাঞ্চলে পুনর্বাসনের গুরুত্ব সরকার উপলব্ধি করিলেন মাত্র ১৯৫৫ সালে এবং ১৯৬০-৬১ সাল পর্যন্ত পুনর্বাসন কার্যে ব্যয়িত হয়েছে মাত্র ১৭৮·১০ কোটি টাকা।

পশ্চিমাঞ্চলের তুলনায় অর্ধেকের কম সময়ে অর্ধেকের কম টাকায় পূর্বাঞ্চলে প্রায় সমান সংখ্যক উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন কার্যে সমান পরিমান সুফল পাওয়া যাইবে, এইরূপ কল্পনা করা সম্পূর্ণ অবাস্তব।

—দি স্টেট্‌সম্যান, জানুয়ারী ২৯, ১৯৬২

'কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে,'
আবৃত্তি করলেন গুহকদা।

দয়ার সাগর দিল্লীশ্বর! ঋণভারে
করেনি জর্জ্জরিত তাঁর গ্রীষ্মাবাস
থেকে আগত শরণার্থীদের।

দিল্লীশ্বরবা জগদীশ্বরবা! 'ফিরায়ে
আনিব তোরে'—'কহি
উর্ধ্বশ্বাসে' নিশ্চয়ই নির্বাচনের পরে
পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় বিলোপ সাধন করে

নিজ কর্তব্য
সমাধান করে ফর্মান্ জারী পূর্বক
দিল্লীশ্বর 'মুহূর্ত-মাঝে ঝাঁপ দিল'
আত্মতৃপ্তিজলে। কিন্তু শরণার্থী
'আর উঠিল না। সূর্য গেল অস্তাচলে'।
তাই সজল নয়নে ইংরেজ সাংবাদিক
লিখেছেন্।—

## উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ঋণ

পূর্ববঙ্গ আগত উদ্বাস্তুদিগকে প্রদত্ত কতিপয় বিশেষ ধরণের ঋণ মকুব করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, আশা করা যায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-সভা এই সপ্তাহেই সেই বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন। এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট বিলম্ব করা হইয়াছে। প্রায় তিন মাস পূর্বে বিবৃতি দেওয়া হইয়াছিল উক্ত ঋণের শতকরা তিন ভাগ অর্থাৎ মোট টাকার পরিমানে ২৯৷৹ কোটি টাকা মাত্র আদায় হইয়াছে। এই টাকাও বেশীর ভাগ আদায় করা হইয়াছে আধা সরকারী শিল্প সংস্থা হইতে; ব্যক্তি বিশেষের নিকট হইতে নয়। রাজ্য সরকারের প্রস্তাব কার্যকর করিতে বিলম্ব হওয়ার কারণ একটি যুক্তি সম্মত কর্মপন্থা গ্রহণ করিবার মত করিয়া পরিসংখ্যান রচনা করা সম্ভব হয় নাই!

অতঃপর আমাদের নিজস্ব অনুসন্ধান হইতে ইহাই প্রতীয়মান হইয়াছে যে সম্ভবতঃ উক্ত ঋণের অধিকাংশই আর আদায় করা যাইবে না। বস্তুতঃ এই ঋণদানের নীতি উদ্বাস্তুদের কাঁধে যাঁতার পাথরের মত চাপিয়া বসিয়াছে। আঞ্চলিক সমস্যাগুলির সমাধান কল্পে ঋণদানের এই বিলম্বিত ভ্রান্তনীতি বেদনাদায়ক অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে।

পশ্চিমাঞ্চলের উদ্বাস্তুগণ দেশ বিভাগের অনতিকাল পরেই অল্প

সময়ের মধ্যে ভারতে প্রবেশ করে। পূর্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তু আগমন শুরু হয় ১৯৪৬ সালে নোয়াখালির দাঙ্গার সময় হইতে এবং দশ বৎসর পরে 'মাইগ্রেসন সার্টিফিকেট প্রথা' চালু হওয়া পর্যন্ত এই আগমনের স্রোত অব্যাহত চলিতে থাকে। অধিকন্তু Estimates Commitee বলিয়াছিলেন, প্রথম পাঁচ বৎসর ধারণা করা হইয়াছিল যে শেষ পর্যন্ত উদ্বাস্তুগণ তাঁহাদের নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া যাইবেন। ১৯৫৫ বা তাহার কিছু পরে এই ধারণা এতদুর পর্যন্ত পরিত্যক্ত হইয়াছিল যে কেন্দ্রীয় সরকার প্রকৃতই এই সমস্যার একটি যুক্তিসম্মত সমাধানের জন্য মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে পশ্চিমাঞ্চলের বহু পরিত্যক্ত জমি ও সম্পত্তির সুযোগ পাওয়া যায়, কিন্তু তুলনায় পূর্বাঞ্চলে পরিত্যক্ত সম্পত্তি সামান্যই পাওয়া গিয়াছে কারণ উদ্বাস্তু-গণের গতি ছিল একমুখী—পশ্চিমবঙ্গের দিকে। তাহা সত্ত্বেও পশ্চিমাঞ্চলে সরকারের ব্যয় হইয়াছিল অনেক বেশী যদিও ঐ ব্যয়ের কিছু অংশ বাজেটে ক্ষতিপূরণ খাতে ব্যয় বলিয়া দেখান হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুগণের অধিকাংশই ক্ষতিপূরণ পাইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হন নাই। এমন কি কাশ্মীরের যুদ্ধ বিরতি রেখার অপর দিক হইতে যে সকল উদ্বাস্তু আসিয়াছেন, তাহাদিগকে সম্প্রতি যে এককালীন খয়রাতী অর্থ দেওয়া হইয়াছে, পূর্ববঙ্গ আগত উদ্বাস্তুগণ তাহার যোগ্য বলিয়াও বিবেচিত হন নাই। হিসাব-নিকাশ করিয়া আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি দেখিয়াছেন যে পশ্চিমাঞ্চলের জন্য ব্যয়িত হইয়াছে ৪৫০৲ কোটি টাকা ( পরিত্যক্ত সম্পত্তির মূল্য সহ ) আর পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের জন্য ১৭৮ কোটি টাকা। যদিও দুই অঞ্চলের উদ্বাস্তু সংখ্যার মধ্যে বিরাট কোন পার্থক্য নাই।

এমন কি উভয় অঞ্চলের খয়রাতী ব্যয়ের মধ্যেও ১১ কোটি টাকার পার্থক্য নজরে পড়ে। পূর্বাঞ্চলে খয়রাতী সাহায্যের বেশীর ভাগ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় করা হইয়াছে। পুনর্বাসন খাতের ব্যয়ের পরিমাণের অনেক কম। এই কারণে পুনর্বাসনের জন্য

উদ্বাস্তুগণ শেষ পর্যন্ত ঋণের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গোড়াতে উদ্বাস্তু সমস্যাটিকে 'সাময়িক' বলিয়া ধারণা হওয়ায় এই ঋণ আবার ছোট ছোট কিস্তিতে দেওয়া হইয়াছিল। সমস্যাটিকে 'সাময়িক' বলিয়া ধারণা করাটা অবশ্যই ভুল হইয়াছিল। এই ঋণের অর্থে সামান্য ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হওয়া তো দূরের কথা, ঋণ গ্রহীতাকে কার্যকরী মূলধন হিসাবে যে টাকা হাতে রাখা উচিত ছিল সেই টাকা উপস্থিত দাবী মিটাইতে ব্যয় করিতে হইয়াছে, যেমন জমি বা বাড়ী বা মেসিনারীর মূল্য বা অন্য কিছু বাবদ অগ্রিম কিস্তি হিসাবে। পরবর্তী কিস্তিগুলি তাহারা দিতে পারিত কিনা সে বিষয়ে কোন নিশ্চয়তাই ছিল না, ঋণের সুদ দেওয়া তো দূরের কথা। অনেক ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত ঋণের টাকা জীবিকা নির্বাহেই ব্যয় হইয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারের পুনর্বাসন দপ্তরের কার্যও দক্ষতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হইয়া উঠে নাই। তাঁহারা পুনর্বাসন খাতে বরাদ্দ অর্থের বিরাট অংশ নির্দিষ্ট মাত্রায় খরচ করিতে সক্ষম না হওয়ায় অনেকবার বাতিল হইয়া গিয়াছে। পূর্বাঞ্চলে উদ্বাস্তুদের নিজেদের পুনর্বাসন প্রচেষ্টার কথা পশ্চিম অঞ্চলের উদ্বাস্তুদের তুলনায় অনেক ছোট করিয়া দেখান হইয়াছে। তথাপি এইরূপ প্রচেষ্টার পরিমাণ কম নহে। তবুও দেখা যায় যে তৃতীয় পরিকল্পনায় দেখান হইয়াছে যে প্রায় ২০০,০০০ পরিবার মাত্র "আংশিকভাবে পুনর্বাসন প্রাপ্ত" হইয়াছে। সরকারী কর্তৃপক্ষ কিন্তু কেবলমাত্র শিবিরবাসী উদ্বাস্তু সম্পর্কেই মাথা ঘামাইয়াছেন।

অবশ্য শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের সমস্যাই কঠিনতম সমস্যা, প্রায় নৈরাশ্যব্যঞ্জক সমস্যা। অনেকে আশ্রয় শিবিরে দীর্ঘদিন বাস করিয়া নিতান্ত হতাশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ইহাদের সমস্যা অচলায়তন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অবশ্য এই সব পরিবারের মধ্যে দুই একজন যে সামান্য পরিমাণে উপার্জনের সংস্থান করে নাই এমন নহে। কিন্তু তাহা জীবিকা নির্বাহের পক্ষে যথেষ্ট নয়।

সরকারী ডোল-এর সহিত সেই আয় যোগ করিয়া বাঁচিবার সংগ্রাম করিতেছে। তাহাদের এই জীবন যাত্রা-ই তাহাদিগকে দণ্ডকারণ্যে প্রেরণের বিরোধী করিয়া তুলিতেছে।

( অধিকাংশ পাঞ্জাবী উদ্বাস্তু কৃষকগণকে এমন জমিতে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছিল, যে সকল জমি মূলতঃ তাহাদের নিজেদের জমি হইতে ভিন্ন ধরণের নয় ) তথাপি ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে পশ্চিমাঞ্চলের ন্যায় পূর্বাঞ্চলেও বহু উদ্বাস্তু, সম্ভবতঃ সংখ্যায় শেষোক্তরা অধিক, সরকারী কৃপাদৃষ্টি ব্যতিরেকে নিজেরাই নিজেদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছিলেন। যদি সরকারী নীতি আরও বাস্তবধর্মী হইত, তবে আরও অধিক সংখ্যক শিবিরবাসী বা শিবির বহির্ভূত উদ্বাস্তুগণ নিজেদের চেষ্টায় স্বাবলম্বী হইয়া উঠিতে পারিত। কতকগুলি অদ্ভুত যুক্তি দেখাইয়া শিবির বহির্ভূত উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

বর্তমানে মনে হইতেছে যে সরকারী নীতির একমাত্র লক্ষ্য হইল পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় এবং আশ্রয় শিবিরগুলি বন্ধ করিয়া দিবার জন্য পর্যায়ক্রমে কয়েকটি তারিখ ঠিক করা। অবশ্য সঙ্গত কারণেই এই তারিখগুলি বার বার পরিবর্তিত হইয়াছে।

—দি স্টেটস্‌ম্যান, জানুয়ারী ৩০, ১৯৬২

'প্রতি অঙ্গ কাঁদে মম, তব প্রতি অঙ্গ লাগি', কীর্তন গাইলেন দাদা গুহক।

হে ভারত ! এ কীর্তন নয়, যা শ্রবণে তোমার অনুভূত হবে সাময়িক ভগবৎপ্রেমের উত্তেজনা, যা'র পরিসমাপ্তিতে পঙ্কিলতায় পুনরাগমন। এ ইতিহাস দাবী করবে তোমার আত্মবিশ্লেষণ।

তাই তো কাত্যায়ন ! কেমন যেন লুজ্ ফেডারেশন্ হয়ে গেল, বললেন গুহকদা।

দিল্লীশ্বরবা জগদীশ্বরবা হয়েছেন দুশ্চিন্তান্বিত, বললেন কুশল।
নয়াদিল্লী, ২৭শে জানুয়ারী—দেশের কয়লা উৎপাদনের কর্মসূচীতে স্থান করিয়া লইবার জন্য কয়লা উৎপাদনকারী রাজ্যগুলিকে একতাবদ্ধ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের প্রচেষ্টাকে নয়াদিল্লী কর্তৃপক্ষ খুব ভাল চোখে দেখেন না।

এখানে মনে করা হয় যে, ইহার ফলে ডাঃ রায় হয়ত এমন একটি প্রবাহ সৃষ্টি করিবেন যাহা সম্ভবত জাতীয় একতার বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেবে, জাতীয় সংহতিসাধন অসম্ভব করিয়া তুলিবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার জাতীয় কয়লা উন্নয়ন সংস্থাকে রাজ্যে কয়েকটি কয়লা খনিতে কাজ করিতে দিতে অসম্মত হইয়াছেন এবং এই ব্যাপারে আইনের আশ্রয় লইয়াছেন। নয়াদিল্লী মনে করেন ইহাই যথেষ্ট খারাপ, তদুপরি ডাঃ রায়ের সর্বশেষ প্রচেষ্টা আরও মারাত্মক।

কলিকাতার কয়লা সম্মেলন সম্পর্কে এখানকার অভিমত এই যে, ডাঃ রায় অন্যান্য কয়লা উৎপাদনকারী রাজ্যগুলিকেও তাঁহার দলভুক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন, অথচ তাহারা পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির কোন ত্রুটি দেখেন নাই।

তাহা ছাড়া বিষয়টি এখনও সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধীন আছে। কাজেই ডাঃ রায়ের এই প্রচেষ্টা এই ইঙ্গিতই দেয় যে, তিনি সংবিধানে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিরোধ মিটাইবার যে ব্যবস্থা আছে তাহাতে সন্তুষ্ট নহেন।

প্রকাশ প্রাপ্যের হার না বাড়াইলে আসাম সরকার তৈল অনুসন্ধানের কাজের জন্য লাইসেন্স দিতে নারাজ

হইয়াছেন। ইহাও ডাঃ রায়ের পূর্বের কার্যের পরিণতি কি না সেই সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিয়াছে। তবে বর্তমান কলিকাতা সম্মেলনকে সকলের প্রতি এই মনোভাব গ্রহণের আহ্বান বলিয়াই মনে করা হইতেছে।

আনন্দ বাজার পত্রিকা,
জানুয়ারী ২৮, ১৯৬২

দেখেছ কাত্যায়ন! যোসেফাইনের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে অশ্রু বিসর্জন করছেন বীর নেপোলিয়ন। জানি না বিধির কি লিখন! হয়তো আমাদের ও যোসেফাইনের সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে একদিন অশ্রু বিসর্জন করতে হবে, সজল নয়নে, ব্যথাতুর কণ্ঠে বললেন দাদা গুহক।

কিন্তু তিনি তো পরিত্যক্তা স্ত্রী?

পরিত্যক্তা! সম্রাট যত বড় বীর তত বড় বোকা।

বোকা নন্? স্বর্গীয় আশীষে মানব জীবন। স্বর্গ থেকে উজারিয়া আনি দেয় কার্ত্তিকেয় তাঁকে সকল অমৃত লুটি। কিন্তু পান করি অমৃত নর যদি হন পুরুরবার মত উলঙ্গ, তবে উর্বশী দেবাশীষ, তাঁকে যান ছেড়ে। তখন কায়ার নভঃস্থলে যায় বাধি রবি, আসে না বুধ উদ্ধারিতে, লভিল তাই সম্রাট নরক। উর্বশী হারায়ে 'মেলি আর্ত চোখ,' যোসেফাইন 'বলি ফুকারিয়া মিলালো' নেপোলিয়ন 'অনন্ত তিমিরতলে।'

কিন্তু যোসেফাইনের উচ্ছৃঙ্খলতা?

উর্বশী! ঈশ্বরী!

কিন্তু সম্রাট চেয়েছিলেন নর্তকী। তাই লক্ষ্মীরূপী যোসেপাইন মেলাল অন্তরালে। দম্ভভরে মেদিনী কাঁপায়ে চলেন সম্রাট। গর্বিত পুরুষকার কহে শক্তি তাঁর চিরস্থায়ী। তাই মহাবীর তাঁর উর্বশী লক্ষ্মীরূপে করেননি বরণ, না করেছেন গ্রহণ।

মেঘাচ্ছন্ন হলেন রবি। ত্বরায় শুভবুদ্ধি গেল ত্যাজি। সীতা-হারা হয়ে সম্ভোগের লাগি ভাসালেন তরী বরাঙ্গনার আবর্তে।

অতঃ পরম্ ?

দেহ ব্যাধি মন্দিরম্।

কি ব্যাধি ?

'সকলি গরল ভেল।' রোগ হ'লো না নির্ণয়, রাজবৈদ্য হলেন নিরাশ, দৈবজ্ঞের হলেন শরণাপন্ন।

দৈবজ্ঞ ?

নির্নীত হ'লো রোগ।

কি রোগ ?

জরা মনমন্দিরে।

আধুনিক চিকিৎসকের ভাষায় 'ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স্।' তাবিজ ধারণ হ'লো দৈবজ্ঞের বিধান।

তাবিজ !

তোদের অষ্টগ্রহ বা নবগ্রহ তাবিজ নয়। জঙ্গী সম্রাটের ব্যাধি, তাই তাবিজও হ'লো জঙ্গী। যাতে পিছু হট্‌তে না হয়। নাম তার 'ফর্‌ওয়ার্ড'।

ফরওয়ার্ড !

কি রকম ফরওয়ার্ড জানিস্ ?

বলুন।

তবে শোন্। চেখস্‌ফোর্ড ক্লাবে খানা খাচ্চি এক রাতে আমার এক বন্ধুর অতিথি হয়ে। ডিনার হলে উঠলো হঠাৎ মৃদু গুঞ্জন, আর সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'লো উদ্যানের দিকে। দেখি সোমরসে মত্ত আলুথালু বেশ এক নারীকে দু'জন নর ধরে নিয়ে আসছে হলের ভেতর। তিনজনেই আমার বন্ধুর পরিচিত। তিনি নরযুগলকে জিজ্ঞাসা করলেন,

এ কি অবস্থা করেছে তারা ঐ মহিলাটির? উত্তর শুনলেন, আমরা কি করবো? ফরওয়ার্ড 'হোনে দিজিয়ে'।

অতঃ কিম্?

অস্ত গেল দিনমণি। মহাবীর নেপোলিয়ন ফরওয়ার্ড মার্চের রুট আবিষ্কার করলেন—চেখস্ফোর্ড ক্লাবের 'বার' নয়—রাজরক্ত, কচি রাজরক্ত। রাজকন্যা পাণিগ্রহণ করে বংশধরের 'ধমনীতে রাজরক্ত প্রবাহিত করা। বোকা, মোহাচ্ছন্ন জেনারেল, তাই বুদ্ধিদাতা বৃহস্পতি নিয়েছিলেন 'ফ্রেঞ্চ-লিভ্', তা' না হ'লে তাঁর বোধগম্য হ'তো যে যেদিন তিনি ফরাসি দেশের রাজমুকুট শিরে ধারণ করেছেন, সেদিনই তাঁর রক্ত পরিণত হয়েছে রাজরক্তে। তিনি যে নারীকেই বিবাহ করবেন তিমিই হবেন সম্রাজ্ঞী—তিনি যোসেফাইনই হোন্ বা অন্য যে কোন নারীই হোন্—আর তাঁদের সন্তানই পরিচিত হবে ধরাধামে রাজসন্তানরূপে।

জেলের বামুন-যোগাড়ে বুদ্ধি, বললেন কুশল।

উর্বশীর বিদায়। নেপোলিয়নের 'ফরওয়ার্ড' তাবিজ ধারণ—রাজকন্যা বিবাহ।

তাবিজের আর কত তেজ হবে, দাদা?

দুর্দিনারম্ভ। দুর্যোগের সাথে তাল মেলাল রাজকন্যার ঘৃণা, লাঞ্ছনা। নাটকের চতুর্থ অঙ্কের শেষ দৃশ্য হ'লো—রাজকন্যার পতিত্যাগ ও পিতৃগৃহে যাত্রা।

হাঃ হতোস্মিন্!

চৈতন্য এলো ফিরে। কিন্তু উর্বশী তখন বৈতরণীর পরপারে দাঁড়িয়ে। এ পার থেকে কণ্ঠ[illegible] [illegible] ভাশে।

'যোসেফাইন [illegible] এই [illegible] আমার পাশে এসে দাঁড়াও।''